বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

(সংগ্রহ করতে হবে)

শরমিন নিশাত
সম্পাদক, হালখাতা
৩০.০৯.২০১৫

সম্পাদকীয়: দুই

(সংগ্রহ করতে হবে)

শওকত হোসেন
প্রধান সম্পাদক, হালখাতা
৩০.০৯.২০১৫

সূচি

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের যথার্থতা নির্ণয়
রফিক হোসেন ০৬

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব
ফয়েজুল আজিম ২৮
বাংলাদেশের চিত্রশিল্প
মইনুদ্দীন খালেদ ৪০
চিত্রশিল্প: বাংলাদেশের
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ৬১
বাংলাদেশের শিল্পকলা
সৈয়দ আলী আহসান ৬৯
আমাদের চিত্রশিল্প: বিকাশ ও পরম্পরা
ফরীদুল আলম ৭৯

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের চিত্রশিল্প: শিল্পী ও শিল্পরূপ
সন্তোষ গুপ্ত ৮৮
বাংলাদেশের চিত্রশিল্পচর্চা: একটি পর্যালোচনা
মতলুব আলী ৯৭

প্রবন্ধ
বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা
মলয় বালা ১১৫

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা: স্বাধীনতার আগে ও পরে
নজরুল ইসলাম ১২৩
বাংলাদেশে আধুনিক চারুকলাচর্চা
সৈয়দ আজিজুল হক ১৩০
বাংলাদেশের দৃশ্যকলা: সাত দশকের গতিপ্রকৃতি
আবুল মনসুর ১৩৯

প্র ব ন্ধ
চিত্রশিল্পে বাঙালিয়ানা এবং বাংলাদেশ-চরিত্র নির্মাণ
র শি দ আ মী ন ১৪৩

প্র ব ন্ধ
আমার শিল্পচর্চা ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মু র্ত জা ব শী র ১৫০

প্র ব ন্ধ
আমাদের নিসর্গ চিত্রকলা
জা হি দ মু স্তা ফা ১৫৮

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ
আ ব্দু স সা ত্তা র ১৬৪
বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে নারীর অবদান
র বি উ ল হু সা ই ন ১৭৪

প্র ব ন্ধ
জয়নুল মানসে পরিকল্পনাবোধ
বু ল ব ন ও স মা ন ১৭৯
মোহাম্মদ কিবরিয়ার ছবি
সৈ য় দ ম ঞ্জু রু ল ই স লা ম ১৮৪
এস. এম. সুলতান: বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা
শ ও ক ত হো সে ন ১৯৭

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের যথার্থতা নির্ণয়

র ফি ক হো সে ন

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনকে যদি বিশ্লেষকের চালুনি দিয়ে ছাঁকা যায় তাহলে শিল্পকর্মের সংখ্যা এত অপ্রতুল যে, সঠিক মূল্যায়ন করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। তবে দোষ-গুণ বিচার করে সাধারণভাবে বলা যায় যে, শিল্প আন্দোলনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে অস্থিরতা রয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অবশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে, সব শিল্পকর্মই পরীক্ষামূলক। শিল্পীরা কখনোই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বা সমাধানে পৌঁছাতে পারে না। যুদ্ধ চলাকালীন সময় সামরিক বাহিনী শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই গন্তব্যস্থান, গন্তব্যে পৌঁছানোর নিরাপদ রাস্তা, সময়, শত্রুপক্ষের শক্তি ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সতর্কতার সাথে পূর্বপরিকল্পনা মতো অগ্রসর হতে থাকে। একটি ভুলের জন্য অনিবার্য মৃত্যু অথবা পরাজয় উভয়ই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞানুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে হয়। কিন্তু চারুশিল্পের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন শিল্পী সর্বদা অনিশ্চয়তা ও শত সহস্রাধিক ভুলের মধ্যে দিয়ে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলাদেশের কিছু শিল্পকর্মের মধ্যে আপন সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধের চেতনা এবং স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা প্রতিফলিত হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো জাতীয় শিল্প দর্শন ও আঙ্গিক উদ্ভাবিত হয়নি, যার দ্বারা বাংলাদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্যান্য দেশ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্প-আন্দোলনকে সার্বিকভাবে সময়ের গজকাঠি দিয়ে মাপলে বলা যেতে পারে যে, শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর সময় হয়তো যথেষ্ট নয়। কিন্তু জাতীয় আঙ্গিক উদ্ভাবনের জন্য প্রায় অর্ধশতাব্দী সময় খুব কম সময়ও নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্প আন্দোলনের সাথে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে অন্যান্য দেশে জাতীয় শিল্প দর্শন ও আঙ্গিক দানা বাঁধতে শুরু করে অথবা বিশেষ একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করেছে, যা তাদের জাতীয় আঙ্গিকের সুষ্ঠুভাবে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেয় এবং অন্যদের থেকে পৃথক করে।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পদর্শন, মতবাদ, ধারা ইত্যাদির পরিবর্তন ও রূপান্তর হওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তাই বলে এতে জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যায় না। অথবা আপন সমাজ পরিবেশ ও সংস্কৃতির গুরুত্ব লোপ পায় না। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের কোনো জাতীয় আঙ্গিক বা স্বতন্ত্র মৌলিক ধারা বা মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার কোনো লক্ষণ এখনো

পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এমনকি জাতীয় আঙ্গিক উদ্ভাবনার পূর্বে গঠনকালীন সময়ের (Formative Period) চৌকাঠে এখনো পৌঁছায়নি।

ষাট দশকের শুরু থেকে পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলন ক্রমোন্নতভাবে প্রভাব বিস্তার করার ফলে এদেশের শিল্প-আন্দোলনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে শুরু করে। ষাট দশক থেকে শিল্প-আন্দোলন আপাতভাবে গতিশীল ও প্রগতিশীল মনে হলেও বস্তুত কলুর বলদের মতোই এর গতি। গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেছেন : 'বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতে আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা এক নির্দিষ্ট মেরুতে পথ পরিক্রমা করেছেন। এখান থেকে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা, তার থেকে বেশি দূরে যেতে পারেনি একালের নবীনরা।' (বাংলা প্রবন্ধ সংকলন, পৃ-১৬২, অনু-১)

কোনো দেশ বা জাতির শিল্পকর্ম মূল্যায়ন করতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মী বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ শিল্পীর যৌথ অসচেতনতা, অজ্ঞাত ও জীবনবোধে তার শিল্পকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আর এই যৌথ অসচেতনতা ও জীবনবোধ তার সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে সৃষ্টি হয়, যার তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পায়। মনোবিজ্ঞানী ইয়ং বলেন, 'একজন শিল্পী হচ্ছেন তার লক্ষ্যের অনুসারী। তার কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই। এমনকি তিনি অতিমানবও বটে। একজন শিল্পী তিনিই তার কাজ এবং তার কাজই তিনি। এমনকি তিনি কোনো মানুষ নন।'

এদেশের শিল্প-আন্দোলন সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ষাট দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ শিল্পীর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে জয়নুল আবেদিনের প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে জলরঙের মাধ্যমে। তৎসত্ত্বেও তিনি বা তার সমসাময়িক কামরুল হাসান বা সফিউদ্দিন আহমেদ কোনো জাতীয় ধারা বা মতবাদ ও আঙ্গিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর 'তার শিল্প ভুবন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার পরবর্তী প্রজন্ম, তারই ছাত্রগোষ্ঠী, জয়নুল-অনুরাগী হয়তো ছিলেন; কিন্তু জয়নুল-অনুগামী ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। শিক্ষকের ভূমিকায় তার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও অগ্রবর্তী শিল্পী হিসেবে তিনি তাদের আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হননি।' (সংবাদ, তারিখ- ২৭-১২-৯০) এজন্য নেতিবাচক ও ইতিবাচক দু'টি প্রধান কারণ দায়ী। নেতিবাচক কারণগুলো হল:

প্রথমত, তাদের কেউই তখনও পর্যন্ত বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন না;

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এদেশে চারুকলার কোনো অস্তিত্বই ছিল না;

তৃতীয়ত, তারা নিজেরাই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তারা তাদের শিল্প দর্শন বা আঙ্গিক সম্বন্ধে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন;

চতুর্থত, তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে চারুশিল্পের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি;

পঞ্চমত, তার উত্তরসূরিরা অগ্রগামীদের অনুসরণ না করে দিক পরিবর্তন করে ভিন্ন দিকে চলতে শুরু করেন, এবং সর্বশেষ, উত্তরসূরিদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল। ইতিবাচক কারণগুলো হল:

প্রথমত, সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা;

দ্বিতীয়ত, উত্তরসূরিদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্য রাতারাতি সুখ্যাতি অর্জনের লিপ্সা তাদের মধ্যে লক্ষ্যহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা সৃষ্টি করে;

তৃতীয়ত, গভীর জ্ঞানের অভাবের জন্য সার্বিকভাবে শিল্প এবং বিশেষভাবে কিছু পরিভাষার ভুল ব্যাখার ফলে উত্তরসূরিদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়;

চতুর্থত, প্রগতিশীলতার নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রীতি এবং ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে প্রতীচ্যের উপর নির্ভরশীলতা;

পঞ্চমত, আকস্মিকভাবে বিমূর্তবাদের প্রবর্তন ও প্রচলন, এবং

সর্বশেষ, সহজে খ্যাতি অর্জনের জন্য সহজ পন্থা হিসেবে বিমূর্তবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া।

এই প্রসঙ্গে আবুল মনসুর লিখেছেন। 'এই ছাত্ররাই যখন ইউরোপ ঘুরে এসে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের বিমূর্ত সরল রীতির চর্চা শুরু করলেন স্থান-কাল-পাত্রের কোনো প্রেক্ষিতকে প্রায় বিবেচনায় না এনে তখন জয়নুল বেদনার্তবোধ করলেন; কিন্তু ক্রমশ শক্তি সঞ্চারশীল নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্থান গ্রহণ করতে চাইলেন না'। (সংবাদ, তারিখ- ২৭-১২-৯০)

এ কথা সত্য যে, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার জন্য শিল্পীদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম। শিল্পীদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে বিভিন্ন মতবাদ, ধারা ও আঙ্গিকের উদ্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু ধারা, মতবাদ ও আঙ্গিক যাই হোক না কেন মতানৈক্যের জন্য কোনোটা গুরুত্বহীন হয়ে যায় না বা কোনোটিকে অবমূল্যায়নও করা যায় না।

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলন মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ষাট দশকের শুরু থেকে শিল্প-আন্দোলন দু'টি প্রধান প্রবাহে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সে দু'টি হচ্ছে : বাস্তববাদ ও বিমূর্তবাদ। ঐ দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দু'টি প্রধান মতবাদ পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিমূর্তবাদ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং এদেশের শিল্প-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ছায়াছন্ন করে ফেলে। এর কারণ হল, আমাদের দেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা মনে করেন যে, বিমূর্ত শিল্প মানেই সৃজনশীল ও প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড। আর বাস্তব শিল্প হল অপ্রগতিশীল প্রকৃতির অনুকরণমাত্র। তাদের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, সার্বিকভাবে শিল্প এবং বিশেষভাবে বাস্তববাদ সম্বন্ধে তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞানের কারণেই তারা এমন ধারণা পোষণ করেন। আসলে গভীর জ্ঞানের অভাবের জন্যই তারা অনুশীলন, ইলাস্ট্রেশনধর্মী, অ্যাকাডেমিসিজম ও বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। তাই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনুশীলনধর্মী কাজগুলোকে বাস্তববাদ বলে ভুল করেন।

অবশ্য বাস্তববাদ কথাটার কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমালোচক, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী কিছু নেতিবাচক উক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'ভাবকে নিজের করিয়া লইয়া সকলের করা তাহাই সাহিত্য তাহাই ললিতকলা। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে নিজের করিয়া লইয়া তাহাই সকলের মনে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহাই শিল্পরস।' তাঁর এই উক্তি যদিও বিশেষভাবে সাহিত্য এবং সার্বিকভাবে ললিতকলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে তবুও এটা বাস্তববাদের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আবার ফক্‌নার বলেছেন: "A work of art is a frozen image of perpetually moving relaity" ভি.আই. লেনিন বাস্তববাদ সম্বন্ধে খুবই স্পষ্টভাবে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "Art does not require that its works be taken for reality that the artist not only reflects life but transforms it, plays freely with time in dull, in fantasies, resorts to hyperbole and the grotesque has no qualms about altering the real proportion of the depicted objects... all in order to comprehend move fully and

profoundly the true meaning of history and man’s place in it. All these are principles of the aesthetics of realism.”

“At the same time at the given moment in the evolution of art, the distance between it and reality does not remain constant. The degree of artistic freedom fluctuates and the ways it is linked to life change and this changeableness of relations depends not only of the individual temper of the creator, but all the character of life itself which strives however obscurely to dictate its rules of the games to art.” (টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি আমেরিকান লিটারেচার, এন, এনানটা বিয়েভ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৮, অনু: ৪-৫)।

তারা যুক্তি উত্থাপন করেন যে, শিল্প হল অসচেতন মনের ক্রিয়া অতএব এটা নিয়মনিষ্ঠ হতে পারে না। কিন্তু শিল্পের বিচারে সকলকে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিমূর্ত শিল্প হলেই যে সেটা প্রগতিশীল হবে তা নয়। আর বাস্তবধর্মী হলেই যে সেটা শিল্পকর্ম বা ‘মাস্টারপিস’ হবে, তা-ও না। সুতরাং বাস্তব বা বিমূর্ত যাই হোক না কেন, তার সঠিক মূল্যায়ন ও যথার্থতা নির্ণয় করতে হলে উভয়ের দোষ-গুণ বিচার করতে হবে। তা না হলে কোনোটির প্রতি অবিচার ও অবমূল্যায়ন করা হবে।

আধুনিক যুগের শুরু থেকে অদ্যাবধি শিল্পের ক্ষেত্রে দু’টি দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটা হল, ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ এবং অন্যটি হল: ‘জীবনের জন্য শিল্প’। শিল্পের জন্য শিল্প এবং মতাদর্শের সমর্থকরা বলেন যে, শিল্পকর্ম হল সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত আনন্দের সৃষ্ট। অতএব, কে তার কাজ বুঝল আর বুঝল না, কে আনন্দ পেল আর পেল না, সেজন্য শিল্পীর কিছু এসে-যায় না। শিল্পী মনের আনন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলে। নতুন কিছু সৃষ্টি করা হল শিল্পের লক্ষ্য। জনসাধারণের জন্য শিল্পকর্ম নয়। কিন্তু তাদের এই মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ শিল্পকর্ম তাহলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়– কোনোদিন সর্বজনীন হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে– “একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্য লেখা সাহিত্য নহে– লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ– আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভব করিতে চায়– প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে এবং মনের অধিকার মনে ও কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা– সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা।” তিনি যদিও কথাগুলো বিশেষভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন তবুও এ কথাগুলো চিত্রকলা সম্বন্ধে বলা যায়। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য একই। বিশেষ করে শিল্পকর্ম যদি সকলের জন্য না হয়, তাহলে মানুষ সেই শিল্পকর্মের সমাদর করবে কেন?

অপরপক্ষ যারা বলেন যে, শিল্পকর্ম হল জীবনের জন্য তাদের মধ্যে বিশেষ করে মার্কসবাদীরা মনে করেন, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা যেসব শিল্পকর্মের প্রধান উপকরণ অর্থাৎ শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে সেটাই হল জীবনের জন্য শিল্প। কিন্তু এ ধারণাও সঠিক নয়। কারণ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা আদর্শ প্রচার করা শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, তা সে মতবাদ বা আদর্শ যতই মহৎ হোক না কেন।

বস্তুত, যে কোনো উপকরণ শিল্পের সামগ্রী বা বিষয়বস্তু হতে পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আদিকাল থেকে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য আমাদের মনে অকৃত্রিম আনন্দ দান করে আসছে।

সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য ও আনন্দ উপলব্ধির জন্য কোনো মতবাদ বিশ্বাস বা প্রচারের প্রয়োজন হয় না অথবা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ বা বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সূর্যোদয় শিল্পের উপাদান বা উপকরণ হতে পারে। অতএব জীবনের জন্য শিল্প বলতে যারা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা আদর্শ বা জ্ঞানের কথা বলেন তারাও ভুল করছেন।

শিল্প শিল্পের জন্যই হোক আর জীবনের জন্যই হোক আসল কথা হল, শিল্পের বিচার-বিশ্লেষকের শিল্প-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; দু'টি বিষয়ের ওপর সমগুরুত্বারোপ করতে হবে। একদিকে শিল্পীর যৌথ অসচেতনতা ও জীবনবোধ অর্থাৎ সমাজ, পরিবেশ ও সংস্কৃতি-সচেতনতা এবং অন্যদিকে শিল্পীরা কৌশলজ্ঞান ও দক্ষতা। বিজ্ঞানে যেমন স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা আছে এবং প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা বা সূত্র নিয়মনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে হয় তেমনি চারুশিল্পের ক্ষেত্রেও নিয়মনিষ্ঠভাবে নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। বিজ্ঞান বাদ দিলেও যদি ললিতকলার অন্য বিষয়গুলো যেমন– সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে অনুসরণ করতে হয়। কারণ ভাব প্রকাশের ও যোগাযোগের মাধ্যম হল ভাষা। সাহিত্যে যেমন তার দুর্বলতার জন্য ভাব প্রকাশ পায় না; মাত্রা, তাল ও লয় জ্ঞান ছাড়া সংগীত হয় না, এবং ছন্দ ও মুদ্রাজ্ঞানের অভাবে নৃত্য উপভোগ্য হয় না তেমন নিয়মনিষ্ঠ না হলে শিল্পকর্ম হয় না।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তার চারদিকের পরিবেশ, যৌথ অসচেতনতা ও অজ্ঞাত থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং, শিল্পকর্ম একদিকে যেমন নিয়মনিষ্ঠ হতে হবে অপরদিকে তেমন শিল্পীর সমাজ ও পরিবেশ-সচেতনতা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং কলা-কৌশলগত দক্ষতা থাকতে হবে। এই দু'য়ের যৌথ প্রকাশ হল সৃজনশীল চিত্রকলা বা মহৎ শিল্পকর্ম। মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিম্যানের মতে, "কল্পনা হল সৃজনশীল কাজের ভিত্তি, যা দূরদর্শী হতে হবে। কাজ শুরু করার আগেই পূর্ব-পরিকল্পিত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সৃজনশীল শিল্পকর্ম হতে পারে না ("Creative work is based on fantasy which demans foresight. No work of art can be created without visualizing the effect before it is undertaken.")। হার্টন এবং এম ব্যাসেট ফ্রিম্যানের সংজ্ঞা সংশোধন করে প্রধান চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন; (১) কল্পনা (ইমাজিনেশন), (২) আবেগপ্রবণ উদ্দেশ্য ও সম্পর্কিতবোধের বিচার (ইমোশনাল মটিভস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড জাজমেন্ট অব ভ্যালু), (৩) কৌশলজ্ঞান ও প্রায়োগিক কর্মকা- (টেকনিক্যাল নো-হাউ অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক), (৪) অব্যাহত প্রচেষ্টা ও অবিরাম প্রয়োগ (সাসটেন্ড এফর্ট অ্যান্ড পারসিটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন)।

পরিবেশ কথাটি একটি সম্পর্কিত শব্দ (রিলেটিভ টার্ম)। এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তবে সহজ করে বলা যায়, চারদিকের অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থাই হল পরিবেশ। আরো সহজ করে বলা যায়, চারদিকের প্রকৃতি, মানুষ, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি, শিক্ষা, ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রভৃতি একত্রে মিলিতভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং পরিবেশ থেকে শিল্পীর যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয় এবং অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয় তারই ফসল হল শিল্পকর্ম। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশা সম্বন্ধে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "তাদের কুঁড়েঘরের অমসৃণ কঠিন দেয়ালগুলো যে মেঝের উপর বসে তারা খায়, ঘুমায় এবং যেখানে উপাসনা করে এ সবকিছুই চিত্রায়নের মধ্যে দিয়ে পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা সামান্য ব্যবহার্যকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হতে দেখি, যা সাধারণ থেকে আশায় পরিণত হয়েছে ("The rough and shiver walls of their huts, the

floor on which they sat, and the place where they worshiped all blossom into pictures. Here we see the transformation of the mere functionals into works of art, the common becoming the cherished.") (হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া, পৃ: ১-২)

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পরিবেশের প্রভাব যেমন অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য তেমন ধর্মীয় প্রভাবও অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বশীর আল হেলাল লিখেছেন: "ধর্ম মানুষকে ডোবাতে পারে আবার ভাসাতে পারে। ধর্ম মানুষকে ডুবিয়েছিল, না ভাসিয়েছিল? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। ডুবিয়েছিল তো নিশ্চয়। কিন্তু ভাসালোও তো আবার যেটুকু ভাসাই ভেসে উঠুক না কেন এবং সে তো ধর্মকে অবলম্বন করে... অবশ্য ধর্মের কাছে সংস্কৃতি আত্মসমর্পণ করে, তেমন সংস্কৃতির কাছেও ধর্মও আত্মসমর্পণ করে—কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতির এক প্রবল ও মারাত্মক– উপাদান।" (আজকের কাগজ, তারিখ- ১৯-১১-৯১)। অগডেন ভগট তাঁর "আর্ট অ্যান্ড রিলিজিয়ান" গ্রন্থে লিখেছেন: "Art and religion belong together by identities of original subject matter and inner experience, the experience of faith and the experience of beauty, are in some measure identical."

বৈচিত্র্যময় এদেশের প্রকৃতি, বৈচিত্র্যময় এদেশের মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি। জোড়া-তালি দেয়া সমাজজীবন বৈষম্যের মাঝেও কিছুটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এদেশের মানুষের জীবন খানিকটা বাস্তব আর খানিকটা অবাস্তব। তাই এদেশের সংস্কৃতি ও ললিতকলার মধ্যে খানিকটা বাস্তবতা আর খানিকটা কল্পনা থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না।

মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। আদিকাল থেকে বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও কৃষিভিত্তিক দেশ। তাই সামাজিক কাঠামো এখনও গ্রামভিত্তিক এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। এমনকি আধুনিক নগরজীবন এখনও পর্যন্ত গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজকাঠামো এবং সংস্কৃতি এখনও গ্রাম্যপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। সুতরাং, এদেশের সংস্কৃতির মধ্যে আপন পরিবেশের প্রতিফলন থাকাটাই স্বাভাবিক ও কাম্য। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির ললিতকলার মধ্যে আপন পরিবেশের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সেটা হয় অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের একটা অনুন্নত দেশ। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কারিগরি, কলকারখানা প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে এত পশ্চাদবর্তী যে সমাজজীবনে এসবের কোনো প্রভাব নেই। এমনকি এসবের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। নগর ও শহরাঞ্চলে এখনো গ্রাম্য পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। সামাজিক কাঠামো এখনো আদিকালের গ্রাম্যকাঠামোর অংশবিশেষ। আর্থ-সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে শহরের সমাজকাঠামো। নগরজীবনের আধুনিকতার মধ্যে এখনো মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে এরূপ নির্ণয় করা যায়, প্রথমত, চিন্তা-চেতনার মূল্যবোধ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নগরভিত্তিক এবং এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আর এদেশ হল গ্রাম্য ও কৃষিভিত্তিক এবং এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক নয়। নগরসাহিত্য সৃষ্টির অভিলাষ থাকলেই তো চলবে না, তার জন্য জানা চাই নগরকে,

নগরসভ্যতাকে, নগরের মানুষ ও তার অসংখ্য ব্যথা- বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে”। (বাংলা প্রবন্ধ সংকলন, পৃ: ১৬২, অনু: ২)

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, এমন একটা অনুন্নত অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সমাজে বিমূর্ত শিল্প কতটা সঙ্গত ও যথোপযুক্ত সেটা বিবেচনার বিষয়। কারণ বিমূর্ত শিল্প হল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পাশ্চাত্য নগরজীবনের ফসল। বলা বাহুল্য, যতদিন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিক্ষার আলো না পৌঁছাবে ততদিন প্রগতিশীল শিল্প ও সংস্কৃতির চিন্তা কতিপয় শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। ইচ্ছা করে যেমন প্রগতিশীল হওয়া যায় না, তেমন জোর করে প্রগতিশীলতা অর্জন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েন বলেছেন: “সাহিত্য, সংস্কৃতি, ললিতকলা ও সংগীতের ক্ষেত্রে হঠাৎ কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমাদের দেশে এখন তো দূরের কথা, শতাব্দীকাল পরেও আশা করা যায় না। কেননা আমাদের সমাজের আজকের চেহারা পাল্টাচ্ছে না। আগামী পঞ্চাশ বছরেও পাল্টাবে কিনা বলা কঠিন। সমাজের চেহারা না বদলালে সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপের বদল হয় না।” (বাংলা প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ ১৫৮, অনুঃ ৯)।

বাংলাদেশে বিমূর্ত শিল্পের যথার্থতা নির্ণয় ও মূল্যায়ন করতে হলে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে দোষ-গুণ বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া, শিল্পীদের সামাজিক অবস্থা, বুদ্ধিমত্তা, মৌলিকতা, কৌশল-জ্ঞান, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে এদেশের বিমূর্ত শিল্পকে প্রতীচ্যের শিল্প আন্দোলনের পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে এর যথার্থতা নির্ণয় ও মূল্যায়ন করা সহজ হবে।

এদেশের বিমূর্ত শিল্প যেহেতু বিবর্তনের ফসল নয় বা কোনো শিল্পীর উদ্ভাবন নয় এবং এর মূল শিকড় পাশ্চাত্যের গভীরে প্রোথিত সেহেতু পাশ্চাত্য শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক ও যুক্তিসঙ্গত। তাহলে এদেশের বিমূর্ত শিল্পের কতটা বাস্তব অবদান আছে তা নির্ণয় করা যেমন সহজ হবে তেমন কতটা গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয় সে বিষয়েও একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার দু'শত বছর পরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউরোপ আধুনিক চিত্রকলার যুগ শুরু হয়। ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের ভেতর দিয়ে আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু এবং ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে চিত্রকলা রাজপ্রাসাদ ও গির্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। ঐ সময় থেকে অতীতের রূপবন্ধের (মটিফ) সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটে।

ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একদিকে অ্যাকাডেমিসিজমে পরিণত হল এবং অন্যদিকে রোমান্টিকবাদ উদ্ভব হল। যেহেতু রোমান্টিকবাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের ও প্রকৃতির প্রতি শিল্পীদের আগ্রহ ও ঔৎসুকও প্রকাশ পেল সেহেতু রোমান্টিকবাদ শীঘ্রই বাস্তববাদে রূপান্তরিত হল। প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু সৃষ্টি হয়। আর রোমান্টিকবাদের লক্ষ্য ছিল শিল্প দর্শনের মৌলিক আবেদনের দিকে। এই সময় থেকে ‘জীবনের জন্য শিল্প’– এই দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তববাদ শক্তি হয়ে যায়। যেহেতু রোমান্টিকবাদের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি প্রধান উপকরণ হিসেবে গণ্য হল সেহেতু ‘জীবনের জন্য শিল্প’ এই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পীরা জীবনধর্মী শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়ে উঠল। এই সময় আবার ইউরোপে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী আন্দোলন শুরু হয়ে

যায়। শিল্পীরা বাস্তবধর্মী সাহিত্য থেকে উপকরণ গ্রহণ করে তাই শিল্পের মধ্যে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালান। পরবর্তীতে বাস্তববাদ প্রতিচ্ছায়াবাদে রূপান্তরিত হল। বস্তুত প্রতিচ্ছায়াবাদ বাস্তববাদেরই সম্প্রসারণ।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন সমগ্র ইউরোপে শিল্প বিপ্লব (ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলিউশন) শুরু হয় তখন থেকে শিল্পীরা ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদকে পাশ কাটিয়ে চিত্রকলার মধ্যে যেসব বিষয় বিজ্ঞানের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত সেসব বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এই সময় থেকে প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীরা পদার্থবিজ্ঞান ও দৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার (ফিজিক্স অব কালার অ্যান্ড সায়েন্স অব অপটিকস)-এর ওপর ভিত্তি করে রঙের ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। ফলে চিত্রকলার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিচ্ছায়াবাদ দু'টি প্রধান প্রবাহে বিভক্ত হয়ে পড়ে; বাইয়োমরফিক চিত্রকলা এবং মেকানোমরফিক চিত্রকলা। পল সিজানের উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদ (পোস্ট-ইমপ্রেশনইজম)-এর ওপর ভিত্তি করে ১৯০০ সালের শুরু থেকেই পাবলো পিকাসো ও ব্রাক ঘনকবাদের প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীতে মেকানোমরফিক শিল্পের গোড়াপত্তন করে। ঐ সময় থেকে পাশ্চাত্যের চিত্রকলা দ্রুততর গতিতে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং সেইসাথে শিল্পীরাও সামাজিক সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত আত্ম-প্রত্যয়ী এবং স্বতন্ত্রবাদী হয়ে উঠতে লাগলেন। এরই ফলশ্রুতিতে চলতি শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শুরুতে পূর্বোক্ত দু'টি প্রধান প্রবাহ থেকে আরেকটি তৃতীয় প্রবাহ, বিমূর্ত প্রকাশবাদ-এর উদ্ভব হয়। এছাড়াও আরো একটি চতুর্থ উন্নতি দেখা যায়। সেটা হল, বিশ দশকে মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদ এবং ত্রিশ দশকে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিকতাবাদ।

যদি পাশ্চাত্য শিল্প-আন্দোলন পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি তাহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধর্ম, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি চিত্রকলাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে তেমনি এসবের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে চিত্রকলারও অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ও উন্নয়নের সাথে সমতা বজায় রেখে চিত্রকলার অগ্রগতি ও প্রসার হয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা যাই হোক না কেন পাশ্চাত্যের বিমূর্ত প্রকাশবাদ এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক মতবাদ অতীত ও ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছে, যা তাদের সমাজের দর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু মতানৈক্যের জন্য কোনো মতবাদ যা আঙ্গিক-এর গুরুত্ব লোপ পায়নি। এরিক নিউটন মন্তব্য করেন, "আধুনিক শিল্প কোনোক্রমেই আমাদের সাংস্কৃতিক মরুভূমির ইঙ্গিত দেয় না, বরঞ্চ বহুমুখী সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্তর হিসেবে প্রতিফলিত হয় (মডার্ন আর্ট ইন নো ওয়ে ইনডিকেট অ্যান্ড ডিমোনিউশন অব আওয়ার কালচার... বাট রিফ্লেক্ট এ ফেজ অব ডাইনামিক কালচারাল ডেভেলপমেন্ট)।"

পাশ্চাত্যের চিত্রকলা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এক মতবাদ থেকে অন্য মতবাদ, এক ধারা থেকে আরেক ধারা, এক যুগ থেকে অন্য যুগ এবং এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীর মধ্যে কোথাও শূন্যতা নেই। উপরন্তু, অতীতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ভবিষ্যতে অগ্রগতি ও সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছে।

পাশ্চাত্যের শিল্প-আন্দোলনের আলোকে সার্বিকভাবে এই উপমহাদেশ এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময় জাতির আবির্ভাবের সাথে সাথে

বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটা জাতির ধ্বংসের সাথে সাথে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিও লুপ্ত হয়ে গেছে। এমনিভাবে এই উপমহাদেশ বিভিন্ন সংস্কৃতির সমারোহে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। ফলে বিশেষ কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলে মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও পাহাড়পুর এই তিনটি সভ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব সভ্যতার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকেনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ থেকে ১৮৫ অব্দ পর্যন্ত মৌর্য শাসনামলে বাংলাদেশে মহাস্থানগড় সভ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। এই সভ্যতা লুপ্ত হওয়ার দীর্ঘকাল পরে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং সত্যিকার অর্থে বাঙালি জাতি ও বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। এই সময়কার ইতিহাসে চিত্রকলার উল্লেখ দেখা যায়। "এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে ধীমান, বীতপাল, বিমল দাস ও কর্ণভদ্রর নাম উল্লেখযোগ্য" (বাংলা ও পাক-ভারতের ইতিহাস কে, আলী, অধঃ, ১ম, পৃঃ ১৫৬, অনুঃ ১)। কিন্তু সে যুগের দু-একটা চিত্রকর্ম টিকে থাকলেও পরবর্তীকালের শিল্প আন্দোলনের উৎস হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিংবা চিত্রকলার বিবর্তন অথবা রূপান্তরে কোনো তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে না। পাল বংশের পতনের পরে সেন শাসনামলে চিত্রকলার চর্চার তেমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজি সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। এ সময় থেকে বাঙালি সংস্কৃতিতে দারুণ পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। তখন থেকে বাংলার সংস্কৃতি দু'টি প্রধান প্রবাহে বিভক্ত হয়ে যায়; প্রথমটি হল হিন্দু, দ্বিতীয়টি হল মুসলমান সংস্কৃতি।

যেহেতু ইসলাম ধর্মে প্রাণী জীবের চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু ইসলামিক সংস্কৃতি মোগল সাম্রাজ্য কায়েম না হওয়া পর্যন্ত কেবল স্থাপত্য, কারু ও হস্ত কারুশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি মোগল চিত্রকলার চরম উন্নতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত ও ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়াও, ইতিহাসে যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হল যে, প্রাচীন যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক নৈরাজ্য প্রভৃতি কারণে এদেশে চিত্র চর্চার ও প্রসার হতে পারেনি।

১৮৬০ সালে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে পশ্চিমা দেশগুলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে দ্রুততর উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। সুতরাং, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমা সমাজের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। শুধু তাই নয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের সমাজজীবনের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে যে, তারা এটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদিক থেকে চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক হতে বাধ্য হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন প্রাচ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত। এটা তাদের যৌথ অসচেতনতা ও জীবনবোধের ফসল। এটা কেউ ইচ্ছাকৃত বা জোরপূর্বক অর্জন করতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাধারণত প্রায় সকল মানুষের মধ্যে নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের প্রবণতা রয়েছে। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই প্রবণতার অভাব লক্ষ করা যায়। অবশ্য

অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা থাকলেও সুযোগ ও সুবিধার অভাবে তা অনেক সময় বিকশিত হতে পারে না।

ইউরোপের ইতিহাসের সাথে উপমহাদেশে সার্বিকভাবে এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাস তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে যখন আধুনিক চিত্রকলার সূচনা হয় তখন সমগ্র উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং আর্থ-সামাজিক অবনতির জন্য সর্বস্তরের অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। এ কারণেই ললিতকলার চর্চা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে চিত্রকলার চর্চা সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চিত্রকলার কোনো অস্তিত্বই ছিল না বললে ভুল হবে না।

তাছাড়াও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, পাশ্চাত্যে সবকিছুই চরম অবস্থায় পৌঁছায়। কিন্তু প্রাচ্যে কোনোকিছুই চরম অবস্থায় পৌঁছায় না, উপরন্তু সর্বক্ষণ সহনশীলতা ও সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। এদেশের মানুষ সময়, অবস্থা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তাল মিলিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন; "পাশ্চাত্য এমন কথা চিন্তা করে গর্ববোধ করে যে, তারা যেন প্রকৃতিকে বশীভূত করেছে। যেন আমরা বৈরীভাবাপন্ন পৃথিবীতে বাস করছি। যেখানে আমাদের সবকিছুই অনিচ্ছুক এবং সম্পূর্ণ বিরোধী ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে হয়। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। সে পৃথিবী ও মানুষকে এক মহান সত্য হিসেবে মিলিত করে। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে ভারত তার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে"। (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত)।

একইভাবে মনোবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস রাইটম্যান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য এরূপ দেখিয়েছেন, "The main western cultural tendencies that is an objective interest in life has remained the same. This common factor in western art seems the more important when it is contrasted with Eastern art... It appears that modern artists display an analytical interest in life."

পাশ্চাত্যের চিত্রকলা সাক্ষ্য দেয় যে, যুগে যুগে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি বিষয়গুলো শিল্পীদের কল্পনা ও চিন্তার উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাই পাশ্চাত্যের চিত্রকলা উক্ত বিষয়গুলোর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, আমাদের দেশের চিত্রকলা উক্ত বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ও পৃথক। বস্তুত এদেশের ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিত্রকলা পরস্পরকে সমর্থন করার পরিবর্তে পৃথক পৃথকভাবে আপন আপন স্থানে অবস্থান করছে। শুধু তাই নয়, উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে শিল্পীদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদেরও চিত্রকলা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, যার ফলে এদেশের শিল্প-আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বিমূর্ত শিল্পের মধ্যে এদেশের মানুষ ও মাটির কোনো প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না। শিল্পীদের যৌথ সচেতনতা ও জীবনবোধের যেমন কোনো

প্রকাশ নেই তেমন সংস্কৃতিরও কোনো প্রতিফলন নেই। এক কথায় বলা যায়, এদেশের বিমূর্ত শিল্প আপন সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে পরগাছার মতো জীবন্ত সমাজ বৃক্ষের শাখায় ঝুলছে।

অপ্রিয় হলেও সত্য, এদেশের শিল্পীরা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের সন্তান। সুতরাং তাদের মানসিকতা ও যৌথ সচেতনতা ও জীবনবোধ এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এই সমাজেরই ফল। তাদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ এই সমাজের রাজনীতি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। আর বিমূর্ত শিল্প সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ ও সংস্কৃতির ফসল। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিল্পীদের প্রায় দু'হাজার বছরের যৌথ অসচেতনতা ও জীবনবোধ এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফসল বিমূর্ত ও চিন্তা উদ্রেককারী অন্যান্য অত্যাধুনিক শিল্পকর্ম। অতএব, স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, প্রতীচ্যের শিল্পীরা যেটা প্রায় দু'হাজার বছর ক্রমাগত প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন করেছে এদেশের শিল্পীদের পক্ষে সেটাই মাত্র এক বা দু'দশকের মধ্যে অর্জন করা কেমন করে সম্ভব?

মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, এ কথা সত্য। কিন্তু সময়কে জয় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সময়ের ব্যবধান ও দূরত্ব কোনোদিন অতিক্রম বা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। সময় অনন্ত। সময় সম্বন্ধে ফকনারের অভিমত হল, অতীতের ধারাবাহিকতা হল বর্তমান। অতীত ও ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্তমানের কোনো অস্তিত্ব নেই। সোভিয়েত সাহিত্যসমালোচক জি. ফ্লোবিন ফকনারের সময় ও চলনশীলতা সম্বন্ধে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন– "To gather all layers of time at one moment in order to penetrate the most intimate mechanism of the human psyche."

একজন সোভিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদ বলেন, "The art of making a decision one of the hightest function of the human mind. At such moment, the brain deals with multi-faceted information accumulated during the whole life's experience of the individual. The brain has become an organ that each moment combines the past, present and future within itself."

কান্ট এই নীতি প্রচার করেন, "An action is moral if performed out of respect for moral loss rather then out of inclination." কান্টের এই উক্তির আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, এদেশের বিমূর্ত শিল্প কোনো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ নয়, এটা কেবল অভিজ্ঞ আবেগপ্রবণতার ঝোঁকেই করা হচ্ছে। এখানে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বক্তব্য খুবই সুন্দর। তিনি বলেছেন; "...এশীয় শিল্পে আধুনিকতা বিষয়টি কী? আমরা আধুনিকতা বলতে যে সমকালীনতা বুঝি এবং বর্তমান সময়ের সকল প্রকাশকে ধারণ করার যে ফর্মগত চমৎকারিত্বকে বুঝি, তা কি এশীয় শিল্পে আছে? কিন্তু এখানে একটি সমস্যা এই যে, আধুনিকতা বিষয়টি আমরা পশ্চিম থেকে ধার করে নিয়েছি– একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এছাড়া আমাদের বিকল্প হয়তো নেই যেহেতু আমরা আধুনিকতার পুরো ধারাটিকেই পশ্চিম থেকে নিয়েছি, নিতে হয়েছে বলে" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ, ৭-১১-৯১)। বস্তু ও পার্থিব পরিবর্তন দ্রুত ও আকস্মিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু মানসিক ও বুদ্ধিমত্তা বিলম্বিত হয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'নলেজ কামস উইজডম সিংগারস'। অনেকক্ষেত্রে একেবারেই অপরিবর্তিত থাকে। অতএব, যাদের যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে সেই বিষয়ে যদি জ্ঞানের ভান করে তাহলে সৃষ্টির চাইতে অনাসৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? এদিক থেকে বিচার করে এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা কেবল আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার ভান ও ভাঁড়ামি করছেন।

বিশেষ করে ষাট দশকের শেষ পর্যন্ত তৎকালীন সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোকে বলা যায় যে, তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনো সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে চারুকলার ক্ষেত্রে বিবর্তন বা কোনো নতুন প্রথা প্রবর্তনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বা তেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিমূর্ত শিল্প শুধু যে অসময়োপযোগী তা নয়, সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বা আকস্মিক ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে।

শিল্প আন্দোলনের আরম্ভ থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সার্বিকভাবে শিল্প-আন্দোলনের মধ্যে শূন্যতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কোনো প্রকারেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া একই দশকের প্রথমার্থ ও দ্বিতীয়ার্ধ এবং এক দশকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশকের মধ্যে সম্পর্কহীনতা ও অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ফলে শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একই শিল্পীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাজের মধ্যে সম্পর্কহীনতা লক্ষ করা যায়, যা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিভ্রান্তিকর বলা যায়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিল্পকর্মের মধ্যে বিরাট শূন্যতা ও সম্পর্কহীনতা লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাস্তববাদের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রচেষ্টা থেকে মনে হয় যে, শিল্প-আন্দোলন কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হঠাৎ যেন দু'দশক পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় শুরু থেকে আরম্ভ হতে চলেছে।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিমূর্ত কাজগুলো পূর্ববর্তী দশক থেকে অনেক উন্নত। বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমসাময়িক নবীন শিল্পীদের কাজের মধ্যে উৎকর্ষ ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ কোনো শিল্পীর উৎকর্ষ ও দক্ষতা প্রশংসনীয় হতে পারে। কিন্তু তাই বলে যে সেটা এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এগুলোর কোনো বাস্তব অবদান আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। শিল্পীরাও আপন সমাজ ও সংস্কৃতি-বহির্ভূত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব-গহ্বরে বাস করছেন।

কোনো কোনো শিল্পী ও শিল্পরসিক যুক্তি উত্থাপন করেন যে, এদেশের বিমূর্ত শিল্প পাশ্চাত্য বা এশিয়ান অন্য কোনো দেশ, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চিত্রকলা বলেও মনে হয় না। অতএব, এটা বাংলাদেশের। আপাতদৃষ্টিতে এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও আসলে অযৌক্তিক। কারণ যদি বলা হয় যে, এটা লাল নয় বা নীল নয় বা হলুদ নয়, তার অর্থ এই নয় যে, সেটা অবশ্যই সবুজ হবে। সুতরাং, বলা যায়, এসব বিমূর্ত শিল্প যেমন অন্য দেশের নয় তেমন বাংলাদেশেরও নয়। কারণ, প্রথমত, এর মধ্যে এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের কোনো প্রতিফলন নেই; দ্বিতীয়ত, এটা কোনো শিল্পীর উদ্ভাবনা নয়; তৃতীয়ত, এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; চতুর্থত, অতীত ও বর্তমানের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং সর্বশেষ, এটা এদেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফসল নয়।

যদি বিশ্বশিল্পের দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশের শিল্পকর্মের মধ্যে আপন সমাজ, পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন স্পষ্ট বিদ্যমান। প্রত্যেক দেশের শিল্পকর্ম আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সেজন্য সেগুলো নিজ দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। বাফুন

বলেছেন, 'Style is man'। একইভাবে ফকনার বলেছেন, "Art is preimminently provincial" কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পের মধ্যে এই অভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বাফুনের কথায় বলা যায়, "Style is regarded something superfluous and that undoubtedly explains why man is also absent in these works... not man as a character, but man as the ultimate and immutable purpose of art." বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে বাফুনের প্রশ্নগুলো এদেশের জন্যও প্রযোজ্য; "Is it not living way under the pressure exerted by stereo-type of mass-culture? Is it not loosing its authority in the consciousness of man and his world, and are we right when we see this distrust nothing more than the moral and senseless endeavours of aesthetic laudities." বিমূর্ত শিল্প এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কতটা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য সেটা যেমন বিতর্কিত তেমন পাশ্চাত্যেও অস্বীকৃত। এই মর্মে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য– "এ পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা এশিয়ার শিল্পের প্রাচীন নিদর্শনগুলোকে উল্লেখযোগ্য মনে করে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যে আধুনিক শিল্পের বিকাশ এশিয়ায় আমরা লক্ষ করি, সে সম্বন্ধে পশ্চিম প্রায় নীরব, সামান্যই তার উৎসাহ। কারণ পশ্চিমের নিজস্ব ভূমিতে এশিয়া যদি নির্মাণ করতে যায় তাহলে পশ্চিম তাকে গ্রহণ করে না, প্রত্যাখ্যান করে। এশিয়ার শিল্পী যখন বিমূর্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, পশ্চিমের বিবেচনায় তখন তিনি অনুকরণকারী মাত্র, কারণ তার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়, তা পশ্চিমের কাছে অস্বস্তিকর। পশ্চিমের অনেক শিল্প সমালোচনা 'প্রাচ্যকালকে' উচ্চ মূল্য দেয়, কারণ এটি এশিয়ার 'নিজস্ব' শিল্প এবং এই এলাকায় পশ্চিম এশিয়াকে ছাড় দিতে প্রস্তুত– 'রাজা রবি বর্মাকে পশ্চিম খুব প্রশংসা করেছে, কাজ ঐতিহ্যে সমর্পিত ছিল বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবাস্তববধর্মী কাজকে পশ্চিম অস্বস্তি নিয়ে দেখেছে, এবং এড়িয়ে গেছে'। (এশীয় চারুকলা, আজকের কাগজ, তারিখ, ৭-১১-৯১)। ফলে এদেশের বিমূর্ত শিল্প একুল ওকুল হারিয়ে মাঝ নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি/ উপায় কী গো উপায় কী/ প্রেম করে হায় পরাণ রাখা দায়'। পাশ্চাত্যপ্রীতির জন্য এদেশের শিল্পীদেরও ঠিক সেই অবস্থা।

ষাট থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিমূর্ত শিল্প-আন্দোলন পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বিশ, ত্রিশ দশকে পাশ্চাত্যে যা হয়ে গেছে ষাট দশকে এদেশের শিল্পীরা কেবল তার অনুকরণ করছেন। অনুরূপভাবে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পাশ্চাত্যে যা শেষ হয়ে গেছে যথাক্রমে সত্তর ও চলতি দশক পর্যন্ত এদেশে তার অনুকরণ হচ্ছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ঢেউ এদেশে পৌঁছাতে বিশ থেকে ত্রিশ বছর সময় লাগছে। অতএব, বলা যায়, এদেশের বিমূর্তবাদী শিল্পীরা আপন সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাদের সময় থেকে অগ্রবর্তী এবং পাশ্চাত্য থেকে বহু পশ্চাদবর্তী হয়ে আছেন।

অবশ্য বিমূর্ত চিত্রকলার মধ্যে যদিও প্রতীচ্যের প্রভাব ও অনুকরণ-প্রবণতা আছে তবুও এটা একেবারে বর্জন করা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ বিমূর্ত শিল্প-আন্দোলন দু'টি স্তরে বিভক্ত– প্রথম স্তরের মধ্যে আপন সমাজ ও সংস্কৃতি-সচেতনতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর দ্বিতীয় স্তরে আপন সমাজ ও পরিবেশের অনুপস্থিতি অনুভূত হয়। সেভাবে শিল্পীদেরও দু'গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, হামিদুর রহমান ও ফরিদা জামান প্রমুখ প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত। আর আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আব্দুল বাসেত, আব্দুর রাজ্জাক, দেবদাস চক্রবর্তী, কাইয়ুম চৌধুরী ও আব্দুস সাত্তারকে দ্বিতীয়

গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। অবশ্য ষাট দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় সকলেই (আব্দুস সাত্তার ও ফরিদা জামান বাদে) প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত বলা যায়।

বলতে গেলে রশীদ চৌধুরী এদেশে একমাত্র পরাবাস্তববাদী ছিলেন। এদেশে তিনি সর্বপ্রথম পরাবাস্তববাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রথম দিকের কাজ হিসেবে প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত এবং পরবর্তী কাজ হিসেবে দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত করা হল।

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিশেষভাবে বিমূর্তবাদী এবং সার্বিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, একদিকে তারা সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে শিল্প-আন্দোলনের স্বাভাবিক গতিতে না কোনো দিক পরিবর্তিত হচ্ছে, না অগ্রগতি হচ্ছে। সেজন্যই এদেশের শিল্প-আন্দোলন সার্বিকভাবে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র কোনো রূপরেখা বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারছে না। এসব শিল্পী এবং তাদের অনুরাগীরা স্বপক্ষে যে যুক্তিই উত্থাপন করুন না কেন এবং সৃজনশীলতা ও প্রগতিশীলতার যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, এটা সত্য যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ নীতি তাদের সমস্ত চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এদেশের শিল্প-আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর এই প্রবণতা এত গভীর ও ব্যাপক যে, 'জাতি' ও 'সংস্কৃতি' এই দু'টি শব্দ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং দৃষ্টান্তের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের সাথে পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, প্রতীচ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও সংযোজন দেখা যায়। কিন্তু পার্থক্য হল, পাশ্চাত্যের দেশগুলো আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র ও মৌলিকতা বজায় রেখে সংমিশ্রণ ও সংযোজন ঘটিয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা বৈদেশিক শিল্প থেকে মূল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে অতি সতর্ক ও দক্ষতার সাথে আপন ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বজায় রেখে এমনভাবে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন যে, তাদের শিল্পকর্ম আরো উন্নতি লাভ করেছে। এরিক নিউটন স্পষ্টভাবে বলেছেন, "পাশ্চাত্যের শিল্পীরা সবসময় তাদের সমসাময়িক যুগের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রকাশ করেছেন।" ম্যামকইভার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য এরূপ দেখিয়েছেন– "Whilest the character of civilization is standardization and the active function of the latter lies in operating by its individualistic impact on the former."

কোনো কোনো শিল্পী এবং শিল্পরসিক বাংলাদেশের এবং সার্বিকভাবে উপমহাদেশের পুরনো সভ্যতার সাথে সেতু সৃষ্টি করার ব্যর্থ প্রয়াস পান। কেউবা শান্তিনিকেতন, কেউ বা মোগল আবার কেউবা আরো এক ধাপ এগিয়ে মাহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, অজন্তা, ময়নামতি প্রভৃতি বিলুপ্ত সভ্যতার সাথে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের বিমূর্ত প্রকাশবাদ এবং অন্যান্য ধারা ও আঙ্গিকের সাথে শিকলাবদ্ধ করেন। বস্তুত এইসব শিল্পী ও শিল্পরসিক ইতিহাস এবং শিল্পকর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেয়ার চেয়ে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের দারিদ্র্যই প্রকটভাবে প্রকাশ করে থাকেন।

সৈয়দ আলী আহসান, সাঈদ আহম্মদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ শিল্প সমালোচকগণ শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতির জন্য আরম্ভ থেকেই বিমূর্ত শিল্পের গুণগান করে আসছেন। আসলে তারা বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে যা বলেন তা পাশ্চাত্যের বাসি তথ্য ছাড়া আর কিছু না। পাশ্চাত্যের সমালোচকদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় যা পড়েন সেগুলো কেবল নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। অবশ্য জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রচুর পড়াশোনার প্রয়োজন। সে কথা

কেউ অস্বীকার করবে না। বিশেষ করে তারা যা বলেন সেটা ব্যাপক অর্থে শিল্প সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ (অবজেকটিভ) ব্যাখ্যা বলা যায়, যার ভেতর শিল্প সম্বন্ধে তাদের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ প্রায়। কিন্তু কেবল পুঁথিগত বিদ্যা এবং কিছু পরিশব্দের জ্ঞান নিয়ে শিল্পের বিচার করা যায় না। অথবা শিল্পের যথার্থতা মূল্যায়ন করা যায় না। শিল্পের বিচারে তত্ত্বজ্ঞানের সাথে সাথে একদিকে যেমন চারুকলার ব্যাকরণজ্ঞান অর্থাৎ প্রয়োগ, কলাকৌশল জ্ঞান ও দক্ষতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে, অন্যদিকে তেমনি ঐতিহাসিক পটভূমিতে সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতির সাথে শিল্পকর্মের সম্পর্ক ও সঙ্গতি আছে কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়াও বর্তমান ও অতীতের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা সে বিষয়টিও লক্ষ রাখতে হবে।

তারা যা বলেন ও ব্যাখ্যা দেন সাধারণভাবে তা বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা প্রযোজ্যও নয়, সঙ্গতও নয়। তাদের বক্তব্য পাশ্চাত্যের শিল্প সম্বন্ধে সঙ্গত হতে পাবে। এদেশের বিমূর্তবাদী শিল্পীরা কে কী করছেন? সামগ্রিকভাবে শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? এসব বিষয়ের সাথে তাদের বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবিকতার চেয়ে কল্পনা এবং প্রকৃতির চেয়ে অপ্রকৃত বেশি। এর কারণ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কথায় বলা যায়, 'শিল্প ইতিহাসের যে প্রধান ধারাটি এখন পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসবোধকে প্রভাবিত করে যাচ্ছে, তা ঐ পশ্চিমের তৈরি; কাজেই পশ্চিম যে শিল্পকে প্রশংসা করেছে, যে শিল্পধারা বা আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছে, আমরা তাদের অনুকরণেই তাই করে আসছি" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ ৭-১১-৯১)। এদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায়, আমাদের দেশের শিল্প সমালোচকদেরও মৌলিকতার অভাব রয়েছে।

বাস্তবধর্মী শিল্প সম্বন্ধে তাদের মৌনতা ও উদাসীনতা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। অবশ্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমেদ ও এস.এম. সুলতান সম্পর্কে তারা উচ্ছ্বসিতভাবে গুণবাচক বিশ্লেষণ বা সার্বিকভাবে বাস্তব শিল্প সম্বন্ধে নেতিবাচক বিশ্লেষণই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের বক্তব্যের সাথে শিল্পকর্মের কোনো সম্পর্ক থাকে না। মোট কথা হল, শিল্পের বিচারে তাদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতি সাম্প্রতিককালের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮৭ সালে জার্মান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত এস.এম. সুলতানের চিত্রকর্মগুলো বিশেষ করে হাল আমলের চিত্রকর্মগুলো, যারা দেখেছেন এবং এদেশের বিদ্বান, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনেছেন বা পড়েছেন, তা থেকে শুধু একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দেশের বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও চিত্রকলা সম্বন্ধে কত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। আসলে তারা নিজেদের আধুনিক উন্মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং প্রগতিশীল প্রচার করার অভিপ্রায়ে এমন উক্তি ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফলে, তাদের কাল্পনিক ও প্রচারণামূলক বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে বিশেষভাবে বিমূর্ত এবং সার্বিকভাবে শিল্প-আন্দোলনের যথার্থতা মূল্যায়ন করা যায় না। বিশেষ করে বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে তারা যে ব্যাখ্যা দেন তা ঐ পাশ্চাত্যের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ আপন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিমূর্ত শিল্পের যে মূল্যায়ন করেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে (বাংলাদেশী) তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অতএব, তাদের বক্তব্য যদি গণনার মধ্যে ধরা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এদেশের বিমূর্ত শিল্প এদেশের মানুষ ও মাটির সাথে সম্পর্কহীন, অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

তাদের উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে। সে বিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই। কিন্তু তাদের প্রচারণামূলক বক্তব্য এবং ভুল ব্যাখ্যার ফলে, বিশেষ করে নবীন শিল্পী ও জনগণের মধ্যে আপন শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে জাতীয় স্বার্থে যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, শিল্পের গতি ও প্রগতিশীলতায় সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কেবল সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এদেশে বিমূর্ত শিল্প আন্দেলন একবারে হয়তো অযৌক্তিক বলা যায় না। কারণ পুরো পাশ্চাত্যজগৎ এবং কম বেশি সারা বিশ্বে যখন বিমূর্তবাদের ঝড় চলছিল ঠিক সেই মুহূর্ত এদেশে শিল্প আন্দোলনের সূচনা হয়। সুতরাং সেই ঝড়ের ঝাপটা যে এখানেও লাগবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে– "সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া যদি শুধু মুখেই রক্তের সঞ্চার হয়, তাহাকে স্বাস্থ্য বলে না, তাহা মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ।" এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে যদি কেবল সময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, তাহলে এদেশে বিমূর্ত শিল্পের যথার্থতা মূল্যায়নে অবশ্যই ভুল হবে।

এ কথা সত্য যে, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গতি ও প্রগতিশীলতায় বৈদেশিক প্রভাব, সংমিশ্রণ ও সংযোজন স্বাভবিক নিয়ম। বিশেষ করে উন্নত শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু কথা হল, প্রভাব, সংমিশ্রণ আর অনুকরণের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষ করে বৈদেশিক প্রভাব যদি স্বদেশিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা খর্ব করে তাহলে তা যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিপন্থী তেমনি তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিজস্ব অস্তিত্ব বিলীন বা অস্বীকার করে বৈদেশিক সংস্কৃতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা কতটা কাম্য ও বাঞ্ছনীয় তা দেশবাসীই বিচার করবেন।

বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য আমরা ঘরের সব জানালা খুলে রাখি। কিন্তু সেই বাতাস যদি ঘরের ভেতরের সব কিছু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তছনছ করে তাহলে আমরা জানালা বদ্ধ করতে বাধ্য হই। ঠিক একইভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও সংমিশ্রণ কাম্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রভাব ও অনুকরণ প্রবণতা যদি আপন শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, স্বদেশি শিল্প-আন্দোলন গড়ে ওঠার পথ অবরুদ্ধ করে এবং সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে আমরা পশ্চিমের জানালা বন্ধ করতে বাধ্য হব।

পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় অনেক কিছু আছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, অপরের কাছ থেকে কী শিখব? কী গ্রহণ করব? কতটুকু গ্রহণ করব? গ্রহণীয় বিষয় আপন সংস্কৃতির সাথে কেমনভাবে এবং কতটুকু সংমিশ্রণ করতে হবে? আপন মৌলিকতা ও আঞ্চলিকতা অক্ষুণ্ন রেখে গ্রহণীয় বিষয় সংস্কৃতির সাথে কেমনভাবে সংমিশ্রণ করতে হবে? এসব প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ ও বাস্তবতা বুঝতে হলে একদিকে যেমন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অপরদিকে প্রায়োগিক দক্ষতা ও কলাকৌশল জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। এই দু'য়ের যৌথ প্রক্রিয়া ব্যতীত সাংস্কৃতিক সংযোজন যেমন সম্ভব নয় তেমন প্রগতিশীল শিল্পকর্ম সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যেমন অল্প সময়ে অর্জন করা যায় না তেমনি জোরপূর্বক অর্জন করাও সম্ভব নয়। এগুলো অর্জন করতে হলে দীর্ঘ অধ্যবসায়, অবিরাম প্রচেষ্টা ও একাগ্রচিত্ততার প্রয়োজন।

সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী দেশব্যাপী ব্যাপক ভ্রাম্যমাণ চিত্র প্রদর্শনীর এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বলতে গেলে সফলতাও অর্জন করেছে। এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

হল, সমগ্র দেশের চারুশিল্পের প্রচার ও প্রসার এবং জনগণের মধ্যে শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা সৃষ্টি করা। কিন্তু যেসব শিল্পকর্ম প্রদর্শিত করা হয় তার ভেতর বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রচার হচ্ছে বেশি। ফলে জনগণের মধ্যে আপন শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আপন শিল্প ও সংস্কৃতির চেতনা, মূল্যবোধ ও প্রীতি হ্রাস পাচ্ছে এবং তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্যপ্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কবি রবার্ট গ্রেভস বিমূর্তবাদী করি, শিল্পী ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য, সম্পর্কহীনতার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, "কবি-শিল্পীরা যে সামাজিক রীতি-নীতিতে বাস করেন তা থেকে কিছুটা সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন এবং বিজন প্রদেশে স্বনির্বাসিত হয়ে থাকেন। ফলে তারা তাদের কাজের মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রকাশ করেন না। বরঞ্চ, এমন সব আকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যা বিষয়বস্তুহীন।"

অনুরূপভাবে ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

দ্বি-বার্ষিক এশীয় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং আশানুরূপ সফলতাও অর্জন করেছে সেজন্য শিল্পকলা একাডেমী অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখে। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, মিশর বা আফ্রিকার অন্য কোনো দেশ কি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত? যেখানে স্পষ্টভাবে এশিয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এশিয়া-বহির্ভূত কোনো দেশের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে বা বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। এই প্রশ্ন বা বিতর্ক এড়াতে হলে দু'টি উপায় আছে। একটা হল, এশিয়া শব্দের ব্যবহার ত্যাগ করা অথবা এশিয়া-বহির্ভূত দেশের অংশগ্রহণ স্থগিত রাখা। যা হোক, এখানে এ প্রসঙ্গ মূলতবি রেখে মূল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যাক।

এই প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক মূল উদ্দেশ্য হলঃ

১. অংশগ্রহণকারী আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলা।
২. অংশগ্রহণকারী আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ ও সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ও প্রসারিত করা।
৩. অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের শিল্প ও শিল্পীদের সাথে পরিচিত করা এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির সাথে এদেশের শিল্পীদের জ্ঞাত করা।
৪. অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর শিল্পীদের চিন্তা, জীবনবোধ, তাদের শিল্প ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশেষভাবে পরস্পর পরস্পরের কাছে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং সার্বিকভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।
৫. অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং শিল্পের প্রসারের পথ আরো বর্ধিত ও প্রশস্ত এবং পৃষ্ঠপোষকতা করা।
৬. শিল্পীদের মধ্যে আঞ্চলিক এবং সার্বিকভাবে এশীয় আন্তর্জাতিকতা চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
৭. আঞ্চলিক শিল্পের অগ্রগতি ও প্রগতিশীলতায় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক শিল্পকে পাশ্চাত্যের সমস্থানে উন্নীত করা।

পাশ্চাত্য শিল্প যেমন সাংগঠনিকভাবে সুপরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে এবং বিশ্ব শিল্প-আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করছে তেমনি এশীয় আঞ্চলিক শিল্পকে সারা বিশ্বে, বিশেষভাবে এশিয়া মহাদেশে, পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলাই হলো এই প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এদিক থেকে শিল্পকলা একাডেমী উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বিশেষ করে,

সারা বিশ্বে না হলেও, অন্তত অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই মহান হোক আর সফলতা যতই প্রশংসনীয় হোক, তবুও প্রদীপের তলার অন্ধকার এখনো দূরীভূত হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং সার্বিকভাবে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে প্রায় একশত ভাগ কাজের মধ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রবণতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কেবল কয়েকটি দেশ এবং কতিপয় শিল্পীর কাজ ব্যতীত অন্য কোনো দেশ, বিশেষভাবে বাংলাদেশের শিল্পকর্মের মধ্যে আপন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আঞ্চলিকতার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এদেশের কতিপয় শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ হলেও জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এশীয় শিল্পের আঞ্চলিকতা, বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধ সম্বন্ধে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "এশীয় শিল্প বলতে আমরা কী বুঝি? এশীয় দেশগুলো ভৌগোলিক নানা বাধা ছাড়াও ইতিহাস, কৃষ্টি, ভাষা ও ধর্মে এমনভাবে বিবক্ত, এবং প্রায়ই পরস্পরবিরোধী এমন অবস্থানে যে, এই প্রবল ভিন্নতা ও বৈপরীত্বের মধ্যে কোনো এক ভিত্তি বা অভিন্ন মাত্রা খুঁজতে যাওয়া বৃথা– কিন্তু একই সাথে বলা যায়, এশীয় ভূখণ্ডের কিছু কিছু ইতিহাস আছে, যার উপাদানগুলো বিভিন্ন দেশ বা জনগোষ্ঠী সমানভাবে ভাগ করে নেয়। উপনিবেশিক শাসন, দারিদ্র্য, সংগ্রাম এবং পরজাগতিকতার আকর্ষণ বহু শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করেছে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং এমনকি কর্ম বা প্রকরণের ক্ষেত্রেও এসবের উপস্থিতি রয়েছে। তাছাড়া এশিয়ার শিল্পকলার অন্যতম উপাদান, মানবিকতা, তা একটি সমতলে সকল চিত্রকর্মকে স্থাপন করে" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ: ৭-১১-৯১)।

এই প্রদর্শনীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আলোকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, এর মূল উদ্দেশ্য শুধু যে ব্যর্থ হচ্ছে তা নয়, বরঞ্চ উল্টো ফল ফলেছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এশীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং প্রাচ্যের চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রজ্বলিত করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতির জয়গান ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় এশীয় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী এশীয় কপটতার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাত্র।

এদেশের বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে কোনো কোনো শিল্পী, পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক বলে জনগণের সামনে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেন এবং সমাজতান্ত্রিক বুলি আওড়ান। কিন্তু প্রকতৃপক্ষে, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির শুধু যে অনুকরণ করেন তা নয়, উপরন্তু এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এদিকে থেকে বিচার করলে এদেশের শিল্পকে বুদ্ধিজীবী-প্রবঞ্চনা ও কপটতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করলে ভুল হবে না। অপ্রিয় হলেও সত্য, বাংলাদেশ শুধু যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল তা নয়, বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও বটে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করলে হয়তো অপ্রসঙ্গিক হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় আণবিক বোমার বিস্ফোরণে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল জাপানিরা অনেক আগেই সে কথা ভুলে গেছে। তারা এটাকে 'একদা' কাহিনীর মতো ইতিহাসের সেই অধ্যয়টি উল্টে রেখে নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দ্রুততর অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশর কিছু কিছু শিল্পীর মনে এখনো সেই ব্যথা বাজে। তাই নিয়ে এখনো পর্যন্ত তারা

মাটিতে মাথা ঠুকছে। অবশ্য মাটিতে মাথা ঠুকার কারণ হল, বাংলাদেশে পাহাড় নেই। তাই বাধ্য হয়ে মাটিতে মাথা ঠুকতে হচ্ছে। একটা প্রবাদ সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে, মায়ের পোড়ে না পোড়ে মাসির। অথচ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ওপর দিয়ে যে দুর্যোগময় সময় গেছে সে বিষয়ে ঐ শিল্পীর উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। তারা মুখে যতই দেশপ্রেমের কথা বলুন না কেন, তাদের কাজের মধ্যে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাদের কাজের সাথে কথার কোনো সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য নেই। এটা বুদ্ধিজীবী-ভাঁড়ামি ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী হতে পারে? সুতরাং বলা যায়, এদেশের শিল্পীরা এগারো কোটি জনগণকে বোকা বানাচ্ছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদিকাল থেকে আমাদের দেশ একটি সামন্ততান্ত্রিক দেশ। সামন্ত প্রথানুযায়ী দু'টি সমাজকাঠামো গড়ে উঠেছে: একটা হল বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামো, আর অন্যটা হলো, কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো। তাই এদেশের শিল্পীরা মুখে যাই বলুন না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। সুতরাং শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া মূল্যবোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতি যাই হোক না কেন, অতীত ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। তা কাম্যও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আবার তাই বলে যে প্রতীচ্যের ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুকরণ করা কাম্য ও গ্রহণযোগ্য তাও না। ফকনার বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষ কোনো একটা কিছুর ধারাবিহক, প্রত্যেকে ব্যক্তিগত এবং বাইরের সম্ভাব্য সকল অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে। প্রত্যক মানুষের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।"

অবশ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতার জন্য কেবল বিমূর্তবাদী শিল্পীদের এককভাবে নিন্দা বা সমালোচনা করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং অন্যদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, বাস্তববাদী অনেক শিল্পীর মধ্যে কম-বেশি পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতা রয়েছে। বাস্তববাদী শিল্পীদের কাজ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগীয় ইউরোপ অর্থাৎ রেনেসাঁ যুগের খ্রিস্টীয় ভাবধারা থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক মতবাদ, ধারা, আঙ্গিক প্রভৃতিতে অনুকরণ-প্রবণতা রয়েছে।

সত্তর দশক থেকে নবীন শিল্পীদের মধ্যে দু'টি প্রবণতা লক্ষ করা যায়, একটা হল পাশ্চাত্যের প্রবল অনুকরণপ্রিয়তা, দ্বিতীয়টি হল, কেবল পুরস্কারপ্রাপ্তি ও অল্প সময়ে সুখ্যাতি অর্জনের জন্যই বিমূর্ত শিল্পের দিকে দারুণ ঝোঁক। অবশ্য সেজন্য শিল্পকলা একাডেমী আংশিকভাবে দায়ী। পঞ্চাশ দশক থেকে অর্থাৎ পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি দেখা যায়, সবসময় বিমূর্ত পুরস্কৃত হচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা হচ্ছে। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনকৃত বাস্তবধর্মী চিত্রকলাকে মনোনীত করা হয় না (অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে)। শিল্পকলা একাডেমীর কার্যকলাপ থেকে মনে হয় যে, কোনো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাস্তবধর্মী শিল্পকর্ম প্রদর্শন করলে এবং বাস্তবধর্মী শিল্পীকে বৈদেশিক প্রতিনিধিদের সাথে পরিচিত করলে বা প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে পাঠালে যেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। এমনিভাবে বাস্তবধর্মী শিল্পীদের কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে, যা বর্তমান বছরগুলোতে আরো বেড়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, শিল্পীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এই ভিন্নতার কারণেই নতুন নতুন ধারা ও আঙ্গিকের উদ্ভব হয়। কিন্তু মতানৈক্যের জন্য কোনো মতবাদ বা ধারাকে অবমূল্যায়ন বা গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর আঙ্গিক হল উপায়। যে যেমনভাবে মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে সেভাবে মনের ভাব প্রকাশ

করে। বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজ, পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং শিল্পীর জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়। অতএব, বলা যায়, বাস্তবধর্মী শিল্পীকে অবজ্ঞা ও কোণঠাসা করার ফলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ খর্ব করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাংলাদেশ অনুপস্থিত।

এজন্য বিচারকমণ্ডলীও আংশিকভাবে দায়ী। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয়, সার্বিকভাবে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানেই যথেষ্ট অভাব আছে। ফলে বাস্তব ও বিমূর্ত কোনো শিল্পকর্মেরই দোষ-গুণ বিচার করে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে না। তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, বিমূর্ত হলেই সেটা সৃজনশীল শিল্পকর্ম হবে। বিশেষ করে যে ছবিটা দুর্বোধ্য সেটাই উন্নতমানের কিছু হবে। বস্তত বাংলাদেশের সব শিল্পী ও শিল্পরসিক এরূপ অভিমত পোষণ করেন। আর এই ভুল ধারণার জন্য তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রায়ই দেখা যায়, বিমূর্ত চিত্রকলার মধ্যে ঠিক যে শিল্পকর্মটি পুরস্কৃত হওয়া উচিত সেটা উপেক্ষিত হয়ে ভুলটি পুরস্কৃত হয়েছে।

স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক কামনা। বিশেষ করে নবীন শিল্পীদের মধ্যে এই প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা থাকা অবাঞ্ছনীয় নয় বা নিন্দনীয়ও নয়। পুরস্কারের উদ্দেশ্য হল, শিল্পীদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও সম্মানিত করা। এক কথায় বলা যায়, পুরস্কারের মধ্য দিয়ে শিল্পীকে স্বীকৃতি দেয়, যা বিশেষ করে একজন নবীন শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেকাংশে সহায়তা করে। অতএব, যদি বাস্তব শিল্পকে উপেক্ষা বা অবমূল্যায়ন করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে নবীন শিল্পীরা সহজেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং বিমূর্ত ধারার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হন। আবার প্রবীণ শিল্পীদের কাজের মধ্যে উদাসীনতা ও অবহেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেজন্য নবীন শিল্পীরা প্রবীণদের কাজ থেকে কোনো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না। ফলে একদিকে যেমন শিল্পীরা দক্ষতা ও উৎকর্ষ অর্জন করতে পারছেন না অন্যদিকে তেমন শিল্প-আন্দোলনের লক্ষ্য অস্পষ্ট ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। আর এ বিষয়টা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন আমাদের দেশের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সচেতন হওয়া দরকার। তা না হলে আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যেই থেকে যাবে। এ প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য– "দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ কামনায় পণ্ডিত ও চিন্তাবিদেরা যদি মুক্তবুদ্ধির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন– যদি গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, একদেশদর্শিতা, জাতিগত বৈষম্য বর্জন করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রশস্ত পথ তৈরি করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন চর্চায় তারা জীবন উৎসর্গ করেন, তাহলে আশা করা হয়তো অন্যায় হবে না যে, আগামী একশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রেনেসাঁস আসবে এবং তখনই সে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশে সমর্থ হবে" (বাংলা প্রবন্ধ সংকলন, পৃ: ১৬০, অনু: ৩)।

বিশেষ কোনো শিল্পীকে না দেখে যদি শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এদেশের শিল্প-আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যায়, ষাট দশকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত এদেশের শিল্প-আন্দোলনের উপর ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান। ষাট দশকের শেষভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশের শিল্প আন্দোলনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং নিয়ন্ত্রিত রাখতে থাকে।

ষাট দশকের শেষভাগ থেকে বাঙালি জাতীয়বাদ ও দেশাত্মবোধের যে চেতনা দেখা দিয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তরকালে অর্ধ যুগেরও কম সময়ের মধ্যেই তা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং আশির

দশকের প্রথমার্ধে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। অবশ্য মাঝে-মধ্যে, বিশেষ করে নবীন শিল্পীদেও মধ্যে, জোনাকির আলোর মতো দেশাত্মবোধের চেতনা লক্ষ করা যায়।

পূর্ববর্তী দু'দশকের দু'টি প্রধান প্রবাহ ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তরকালে আরেকটি তৃতীয় প্রবাহ হচ্ছে বিমূর্ত প্রকাশবাদের প্রবর্তন ও প্রচলন, যা ব্যাপক আকারে প্রাধান্য বিস্তার করে। বিমূর্ত প্রকাশবাদ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো কয়েকটি ধারা, যেমন– পপ আর্ট ও কোলাজের প্রবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে সক্ষম হয় না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আরো দু'টি উন্নতি দেখা যায় একটি হল ছাপচিত্রের অগ্রগতি ও প্রসার এবং অন্যটি হল, ভাস্কর্য ও মোজাইক ধারায় তুলনামূলক অগ্রগতি ও প্রসার। তবে এ দু'য়ের মধ্যে প্রথমটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের ছাপচিত্র শিল্পীদেও দক্ষতা ও উৎকর্ষ প্রমাণিত। অনেক ছাপচিত্র আন্তর্জাতিকমানের গুণসম্পন্ন। কিন্তু তেল মাধ্যমে এদেশের শিল্পীদের (কয়েকজন ব্যতীত) দক্ষতা ও কৌশলজ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলা যায়, কোনো মতবাদ ও আঙ্গিক প্রবর্তনকারী অগ্রনায়ক গুরুত্বপূর্ণ চর্চাকারী শিল্পী ব্যতীত অন্যরা অতি সাধারণ চর্চাকারী বিমূর্তবাদী যাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান নেই।

তাই এত স্বল্পসংখ্যক শিল্পকর্মের ওপর ভিত্তি করে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। শুধু এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলন এখন পর্যন্ত অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এ কথা সত্য যে, শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, এদেশের সমাজ ও জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে শিল্পচেতনা ও শিল্পবোধ আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়, যা শিল্প-আন্দোলনে সামাজিক অমৃতের কাজ করে। কিন্তু শিল্পীদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজ ও জনগণকে বাদ দিয়ে এবং আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে শিল্পচর্চা করা সম্ভব হলেও সৃজনশীল বা প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড হয় না। কারণ সমাজ ও জনগণের উৎসাহ, সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কেবল সরকারি অনুদান, আমলাতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা, বৈদেশিক পর্যটন ও প্রচারণার উপর নির্ভর করে সার্বিকভাবে শিল্পের অগ্রগতি ও প্রসার সম্ভব নয়। পল ক্লি আফসোস করে বলেছেন– "আমরা এখনো সর্বোচ্চ শক্তি অর্জন করিনি। কারণ জনগণ আমাদের সাথে নেই।" দৈনিক বাংলার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "চিত্রশিল্পীরা তাদের ব্যক্তিবর্গ কর্মপ্রচেষ্টায়ও জীবনধর্মী, মানবিক মূল্যবোধ স্বজাত শিল্পকর্মের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নীতি একালে প্রায় পরিত্যক্ত। শিল্প জীবনের জন্য এবং জনগণের জন্য" (তারিখ, ৩ নভেম্বর, ১৯৯১)। পল ক্লি'র উক্তির কারণ সমালোচক রেমন্ড মার্টিমর-এর কথায় বলা যায়, "জনগণ ও শিল্পীর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। শিল্পীর স্বেচ্ছা নির্বাসনের কারণে আজকের শিল্পে কোনো সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেনি। আর এরই অভাবে শিল্প তার আকর্ষণ হারিয়েছে।" অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিল্পকর্ম সমাজ ও জনগণের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে বা একাত্মতা সৃষ্টি করতে পারেনি, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের মতো সমাজে যদি বিমূর্ত শিল্প সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় তবে এদেশের মতো সমাজে তা কেমন করে সার্থক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

ইদানীং এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যে শিল্পের আন্তর্জাতিকতাবাদের গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বক্তব্য ও শিল্পকর্ম থেকে মনে হয় যে, আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে। তারা মনে করেন যে, শিল্পকর্মের মধ্যে যদি আপন সমাজ, পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন না থাকে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যর প্রভাব বা অনুকরণ হয় তাহলেই সেটা আন্তর্জাতিক শিল্পকর্ম হবে। কিন্তু প্রতীচ্যের অনুকরণ বা বিমূর্ত হলেই সেটা আন্তর্জাতিক হয় না। বরঞ্চ যে শিল্পকর্ম আপন সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণ অর্থাৎ যার মধ্যে আপন জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বজায় থাকে, যার মধ্যে একটা জাতির চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় সেটাই আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। এই কথারই সমর্থন দৈনিক বাংলার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে, "এই শিল্পে তুলির আঁচড়ে এবং রঙ ও রেখায় শিল্পীর কল্পনা-প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, আবেগ-অনুভূতি, ভাবনা-চিন্তা নানা আঙ্গিকে বিধৃত হয়। কোনো কোনো সমাজসীমার বাসিন্দা বলেই শিল্পীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবানুভূতির পাশাপাশি দেশ ও সমাজের আলেখ্য চিত্রশিল্পে রূপ পায়। বৃহত্তর জনগণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামসাধনাও শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে বাঙময়। স্বদেশের ভূপ্রকৃতি, নিসর্গ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য যেমন চিত্রশিল্পে রূপায়িত হয় তেমনি আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন ভাবানুভূতি এবং মানবিক সমস্যা-সংকটও চিত্রশিল্পে বিধৃত হয়ে থাকে। শিল্পী যে দেশের ও সমাজেরই হোক না কেন, চিত্রশিল্পের রঙ ও রেখায় নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাষাই এই শিল্পকর্মকে দৃষ্টিনন্দন এবং বিশ্বজনীন আবেদনের অধিকারী করে তোলে" (তারিখ: ৩ নভেম্বর ১৯৯১)। পাশ্চাত্যের শিল্পই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রসঙ্গক্রমে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, অনুকরণ করা যদি আন্তর্জাতিকতাবাদের মাপকাঠি হয়, তাহলে কেবল পাশ্চাত্য ছাড়াও পৃথিবীতে অন্য অনেক দেশ আছে। সেসব দেশের অনুকরণ করলে বা প্রভাব থাকলে সেটা আন্তর্জাতিক হবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কথায় বলা যায়, "শিল্প আলোচনায় বিশ্ব বলতে আমরা প্রধানত বুঝি পশ্চিমকে অর্থাৎ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাকে। তার বাইরে যে বিশাল জগৎ, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটেও পরিষ্কার নয়। তৃতীয় বিশ্বের শিল্প ঐতিহ্য পশ্চিমের শিল্প ইতিহাস বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই বিচার করি। এ জন্য এশিয়াতেই এশীয় শিল্প উপেক্ষিত" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ: ৭-১১-৯১)।

যাহোক, মোট কথা হল, বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলন যতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বলয় থেকে মুক্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত কোনো জাতীয় আঙ্গিক ও স্বদেশি ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে না। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বক্তব্যের মধ্যেও এই একই কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়– "পশ্চিমা শিল্প ইতিহাসের প্রধান পরিচয় এর সরল রৈখিকতা–এশীয় শিল্প বিবেচনায় আমাদের এই সরল রৈখিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিল্প শেষ বিচারে সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এর উপর প্রভাব ফেলে।

কাজেই সমকালের বহুমুখী নানা কর্মকাণ্ড নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একটা সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রহণ করতে হবে" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ: ৭-১১-৯১)। এ প্রসঙ্গে তিনি মোটামুটিভাবে একটা দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন, "প্রাচ্যবাদকে যদি আমরা পশ্চিমের দৃষ্টি দিয়ে নির্মোহ এবং নিরাবেগ ভাবে দেখি, তাহলে পশ্চিমের কিছু অতিসরলীকৃত ধারণা থেকে আমরা মুক্তি পাব–আমরা সাদা চোখে দেখছি দারিদ্র্য– বৈষম্য,

বঞ্চনা, সংগ্রাম এবং হতাশার বহু চিত্র দেখব এই বিস্তৃত প্রাচ্যে। পশ্চিম যেখানে ফ্যান্টাসিকে প্রাধান্য দেয় আমরা সেখানে নিশ্চয় দেব বাস্তবতাকে" (এশীয় চারুকলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আজকের কাগজ, তারিখ: ৭-১১-৯১)।

অনেকে মনে করেন যে, কেউ ইচ্ছা করে শিল্প-সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন করতে পারে না। এ কথা আংশিকখভাবে সত্য হতে পারে। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর তুলিতেই সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশবাসীও সেই আশা নিয়ে ভবিষ্যতের আলোকাজ্জ্বল পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা রইল।

[লেখক: মৃত্যু ২০০২। জন্ম ১৯৪০, যশোর। স্নাতক, চারুকলা বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান আর্ট এ্যান্ড ক্রাফ্‌ট কলেজ, ঢাকা। অধ্যাপনা, চারুকলা, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব

ফ য়ে জু ল আ জি ম

আমরা জানি ঔপনিবেশিক সূত্রে প্রাপ্ত কলকাতা আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল শিল্পচর্চার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। বিশ্বের সর্বাধুনিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রতিক শিল্পের গতিধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকায় শিল্পীদের মধ্যে শিল্পের মুক্ত চর্চার বোধটি জাগ্রত হয়নি। ফলে ভিক্টোরীয় শিল্পের স্বভাবধর্মিতা এবং এর রকমফেরই হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের শিল্পীদের শিল্পচর্চার মূল প্রবণতা। অন্যদিকে ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এবং সংখ্যাগুরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকলার বিষয়বস্তুর স্বভাবধর্মী রূপায়ণে শিল্পীরা মানসিক চাপের সম্মুখীন ছিলেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণ শিল্পীরা এ চাপ অনুভব করেছিলেন বেশি। কারণ বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা তখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীদের ভবিষ্যৎ তখনো অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় জাতীয় সঙ্কটের

প্রশ্নে শিল্পীরা যেমন একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছিলেন, তেমনি নিজস্ব শিল্পাংগিক নির্মাণের প্রশ্নে তাঁদের একটি নিরাপদ ও নিরপেক্ষ কিন্তু অভিনব ও ব্যতিক্রমী শিল্পভঙ্গিমাই প্রয়োজনীয় ছিল।

বাংলাদেশের শিল্পকলায় এই যুগসন্ধিক্ষণে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে পাশ্চত্যের আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের সরাসরি সংস্পর্শে আসেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। এই সময়ে ঢাকা আর্ট কলেজের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পী সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যান। কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাশ্চাত্যের শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। আমিনুল ইসলাম ১৯৫৩-৫৬ সাল পর্যন্ত ইতালির ফ্লোরেন্স চারুকলা একাডেমিতে বিশেষভাবে মোজাইকের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রশিদ চৌধুরী ১৯৫৬ সালে স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যয়ন করেন, পরে ১৯৬০ প্যারিসের 'একোল দ্য বোজার্ট' এ মুর্যাল ও ভাস্কর্যে কাজ করেন। আবদুর রাজ্জাক ১৯৫৫-৫৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া স্টেট ইউনির্ভাসিটি থেকে চারুকলায় এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। সেখানে মৌরিসিও ল্যাসানস্কি'র কাছে তিনি আধুনিক ছাপচিত্রের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। মুর্তজা বশির ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের 'একাডেমী দেল্লাটি'তে চিত্রকলা এবং ১৯৫৭-৫৮ সাল দেয়ালচিত্রের কলাকৌশল শেখেন। পরে তিনি প্যারিস হয়ে লন্ডন ভ্রমন করেন। হামিদুর রহমান ১৯৫০-৫৬ সাল পর্যন্ত প্যারিস, ফ্লোরেন্স এবং লন্ডনে কাটান। অনরডনে সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্ট এবং রয়েল কলেজ অব ফাইন আর্ট এ তিনি অধ্যয়ন করেন। পুনরায় ১৯৫৮-৫৯ সালে হামিদুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে মুর‍্যাল চিত্রকলার কাজ করেন। মো. কিবরিয়া ১৯৫৯-৬২ পর্যন্ত জাপানে টোকিও ললিতাকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক্স ও চিত্রকলা অধ্যয়ন করেন।

বাংলাদেশের শিল্পীদের কাছে বিশ্ব শিল্পের যে বাতাবরণ এতোদিন প্রায় রুদ্ধ ছিলো তার সংস্পর্শে আসার পর স্বাভাবিকভাবে তরুণ শিল্পীদের শিল্পকলায় সেই শিল্পের প্রভাব অতি দ্রুত সঞ্চারিত হয়েছিলো। মূলত ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা, সমাজ ও শিল্পচেতনায় নির্বিশেষে পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুকে উৎকৃষ্ট ও সর্বাধুনিক বিবেচনা করার দুর্বল মানিসকতাই যে এতে সক্রিয় ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তখন বিমূর্ত শিল্পের চেতন ও অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপের ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পান্দোলনের মাধ্যমে, শিল্পকলায় বিষয়বস্তুর আপাত স্বভাবধর্মী রূপায়ণের প্রক্রিয়ার অবসানের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে এ শিল্পরীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পর্যায়ক্রমে ফভিজম, কিউবিজম, স্যুররিয়ালিজম, কন্‌স্ট্রাকটিভিজম, তাশিজম বা একশান পেইন্টিং ইত্যাদি নানা আঙ্গিকপ্রধান শিল্পন্দোলনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটি বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এ ধরনের শিল্প নিজস্ব চরিত্রের জন্যে দেশকাল- নিরপেক্ষ একটি আন্তর্জাতিক প্রবণতা প্রকাশ করেছিলো।

ভিক্টোরীয় স্বভাবধর্মী শিল্প-ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশের শিল্পীরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাদপদ সমাজ এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় আদর্শের আলোকে বিমূর্ত শিল্পের ফলে স্বভাবধর্মী রূপায়ণে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা যেমন পরিহার করা সম্ভব হয়েছিলো, তেমনি এ শিল্পের আন্তর্জাতিক চরিত্রের করণে শিল্পীদের মাসনে সৃজনশীলতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিলো।

বিদেশফেরত বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুন শিল্পীদের শিল্পকলায় বিষয়বস্তু বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া এরপর শুরু হয় এবং তা দ্রুত তাঁদের শিল্পকলায় প্রকাশ পেয়েছিলো। এই শিল্পীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পকলায় পাশ্চাত্যের আঙ্গিকপ্রধান বিমূর্ত শিল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। বিমূর্ত শিল্পের এই ধারা কলকাতা-ফেরত বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের অগ্রজ শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল। মূলত আঙ্গিকসর্বস্ব বিমূর্ত শিল্পের এই প্রবণতাটি নানা পরিবর্তনের ভেতর কিছুটা পরিমার্জিতরূপে পাকিস্তান-পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পকলায় প্রচ্ছন্ন ছায়া বিস্তার করে আছে।

বাংলাদেশের শিল্পকলায় আমূল দিক পরিবর্তনের এই ব্যাপারটি শিল্পকলায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শৈল্পিক সঙ্কট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশে শাসনের সামরিক আইনে বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী অপতৎপরতার ফলে শিল্পকলায় পরোক্ষ ও প্রতীকী রূপায়ণের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর মাঝে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় শক্তিধর নব্য-ধনিকদের রিকল্পনায় পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে শিল্পাঙ্গনে এক ধরনের কৃত্রিম প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছিলো। ফলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে নিজস্ব অস্তিত্বের প্রশ্নে শিল্পীদের স্বতন্ত্র শিল্পাঙ্গিক নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিমূর্তাশ্রয়ী শিল্পকলার মাঝে বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীরা সার্বিক বিবেচনায় একটি সর্বগ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ সমাধানই খুঁজে পেয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরীয়া একাডেমিক শিল্পের নিগড়ে আবদ্ধ শিল্পীদের সৃজনশীল চেতনা বিশ্বশিল্পের উন্মুক্ত দিগন্তে এসে এক ভিন্ন জগতের স্বাদ পেয়েছিলো।

শুধু দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণ শিল্পীরাই নয়, তাদের শিক্ষাগুরু এবং কলকাতায় ভিক্টোরীয়া শিল্প ঐতিহ্যে লালিত বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের মাঝেও এই প্রবণতা সঞ্চারিত হয়েছিলো। অবশ্য পাশ্চাত্য শিল্পের সরাসরি সংস্পর্শে আসার পরই তাদের চিত্রকলায় পরিবর্তনের আভাস ফুটে উঠেছিলো।

১৯৫১ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৫২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সরকারি বৃত্তি নিয়ে জয়নুল আবেদিন ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি লন্ডনে 'স্লেইড স্কুল অব আর্ট'-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইম্পেরিয়াল ইন্সটিটিউট এবং জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহতে বার্কলে গ্যালারিতে তাঁর চিত্র ও ড্রইং- এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইউনেস্কো আয়োজিত ভিয়েনা আর্ট কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন। দেশে ফেরার পথে বেলজিয়াম, প্যাপিস, আঙ্কারা এবং ইস্তাম্বুলে তাঁর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরে পুনরায় ১৯৫৪ সালে রকফেলার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জয়নুল আবেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, জাপান এবং ইউরোপ ভ্রমণ করেন। এ সময়ে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটে তাঁর সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়।

ইউরোপ থেকে ফেরার পর জয়নুল আবেদিনের মাঝে স্বদেশ, ঐতিহ্য ও নিজস্ব শিল্পভাবনা সম্পর্কে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিলো, তা সেই সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর শিল্পী কামরুল হাসানের স্মৃতিকথায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো।

"তিনি যেন নতুন আলোকে আলোক প্রাপ্ত হয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রভাবে ও পদ্ধতি থেকে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রভাবে ও পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অন্য মানুষ তিনি। ১৯৩৯ সালে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুরুসদয় দত্তের কাছে বাংলার শিল্পঐতিহ্য সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলাম, শিল্পাচার্যের মুখে শুনলাম একই কথা।"[১]

জয়নুল আবেদিন তাঁর কলকাতা-জীবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় শিল্পরীতি এবং যামিনী রায়-এর বাংলার লোকশিল্প ধারার চিত্ররীতি থেকে স্বযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ভিক্টোরীয় স্বভাবধর্মী চিত্ররীতির একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ১৯৪১ সালে ঔপনিবেশিক ভারতে আঁকা 'গুনটানা' থেকে শুরু করে পাকিস্তান পর্বে ১৯৫১ সালে আঁকা 'বিদ্রোহী' পর্যন্ত সেই একই ধারা অক্ষুণ্ন ছিলো। কিন্তু বিদেশ ঘুরে আসার পর অঙ্কিত 'দুই রমণী' চিত্রে আঙ্গিকের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জয়নুল আবেদিনের এই চিত্রে বাংলার লোকশিল্পের প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো।

"পাশ্চাত্যভ্রমণ জয়নুল আবেদিনের চিন্তার দিগন্তকে যেমন প্রসারিত করেছিলো, তেমনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলার লোকশিল্পের ব্যাপক সংগ্রহ দেখে আবহমান বাংলার নিজস্ব শিল্পের সহজ সরল বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।"[২]

প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে শফিউদ্দিন আহমদও পরিবর্তিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্ট থেকে ছাপচিত্রের ওপর ডিপ্লোমা নেন। প্রধানত ছাপচিত্রের শিল্পী শফিউদ্দিন আহমদ-এর চিত্রে বেউইক প্রবর্তিত স্বভাবধর্মী চিত্ররীতির সুস্পষ্ট প্রভাবই লক্ষ করা গিয়েছিলো। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁর শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। দেখা যায় তাঁর ঘনত্ব ও দূরত্ব জ্ঞাপন স্বভাবধর্মী শিল্পে এখন বিষয়বস্তুর অবলুপ্তি ঘটেছে। রেখা, আকার ও রঙের সুসম বিন্যাসে তা এখন সম্পূর্ণ দ্বি-মাত্রিক ভাবপ্রকাশক বিমূর্ত শিল্পে প্রবর্তিত হয়েছে। শফিউদ্দিন আহমদ- এর 'প্লাবন' শীর্ষক ছবিগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সদস্য থাকাকালে কামরুল হাসান বাংলার লোকায়ত চিত্রকলার যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, পাকিস্তান-পর্বে পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর সেই চেতনার পুনঃজন্ম ঘটেছিলো। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কামরুল হাসানের চিত্রে বাংলার আবহমান কালের পটচিত্রের আঙ্গিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এই আঙ্গিকের সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার কিছু বৈশিষ্ট্যকেও সংমিশ্রিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাজে মাতিসের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের শিল্পকরার এই পরিবর্তনের স্রোতোধারায় প্রথম প্রজন্মের অন্যান্য শিল্পীরাও সামিল হয়েছিলো। যেমন শিল্পী আনোয়ারুল হক। পাশ্চাত্য পদ্ধতির স্বচ্ছ জলরং-এ দক্ষ এ শিল্পী কখনো বিদেশভ্রমণ করেননি। সমসাময়িক পাকিস্তানের শিল্পান্দোলনে বিমূর্ত শিল্পের তাৎক্ষণিক জয়প্রিয়তা তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল। ষাটের দশকের প্রাথমিক পর্যায় থেকে যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে এই প্রবণতাই ফুটে উঠেছিলো।

ভিক্টোরীয় শিল্পধারার স্বভাবধর্মী শিল্পায়নের বিপরীতে পাশ্চাত্য অনুপ্রেরণায় বিমূর্ত শিল্পের এই চর্চা মূলত বাংলাদেশের শিল্পকলাকে তার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিলো। ঔপনিবেশিক ভারতে মূলত কারিগর তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আর্ট স্কুলে সৃজন-বিমুখ অনুকারক শিল্পচর্চার গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো, পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার নানামুখী শিল্পাঙ্গিকের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের শিল্পীদের সৃজনশীল শিল্পচেতনা শাখা-প্রশাখা বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিলো। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে উন্মুক্ত শিল্পচর্চার পরিবেশ গড়ে ওঠার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিলো।

পাশ্চাত্য শিল্পান্দোলনের শুরুর পর্যায়ে এর ভ্রান্তির দিকটি হয়তো এই যে, এই সময়ে শিল্পীরা শিল্পকলায় আঙ্গিককে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিল্পাঙ্গিককে সর্বস্ব ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। নির্মিতিকে মুখ্য বিবেচনা করে একটি শিল্পকলার জন্মের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও এর দার্শনিক দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিলো। ফলে খোলসর্বস্ব অভিনব আঙ্গিকচর্চাই হয়ে উঠেছিলো এই শিল্পান্দোলনের মূল প্রবণতা।

পাশ্চাত্য শিল্পকলার ঐতিহ্যগত স্বভাবধর্মী ধারায় বিমূর্ত শিল্পের চর্চা শুরু হয়েছিলো তার নিজস্ব সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের পরিণামে রাজতন্ত্রের উৎখাত এবং ঊনবিংশ শতকের শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সামাজিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম পাশ্চাত্যের শিল্প-সাহিত্যে রোমান্টিক মনোবৃত্তির উদ্ভব ঘটিয়েছিলো। রাজতন্ত্রের অবসানে রাজপ্রাসাদ ও গির্জার সহায়তাপ্রাপ্ত আগের যুগের শিল্পকলা পৃষ্ঠপোষকতা হারাল। ফলে স্বাভাবিকভাবে রাজা বা পুরেহিতের নির্দেশে বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্প তৈরির প্রয়োজন ফুরিয়েছিলো। এখন প্রদাস পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভূত হল ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও মানসিকতার এক বিপুলসংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই নতুন পরিস্থিতিতে জনতার চাহিদা এবং মনোভাব দেখে শিল্প তৈরিতে মন দিলেন শিল্পীরা। পরিণামে বিষয়বস্তু হিসেবে শিল্পীদের সামনে উন্মুক্ত হল মানুষের জীবন ও প্রকৃতির অবারিত দিগন্ত।

এদিকে যন্ত্রসভ্যতার উদ্বোধনের মাধ্যমে মানবসমাজ অতীতের সাথে শেষ যোগসূত্র ছিন্ন করে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। কৃষিনির্ভর জগৎ রূপান্তরিত হল যন্ত্রনির্ভর জগতে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক শ্রম কমিয়ে চিন্তাশক্তি অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এখন আধুনিক সমাজের চরিত্র নির্ধারণ করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য পৃথিবীতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় চরম অস্থিরতা এক প্রতিবাদী মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের এতদিনের দৃঢ়মূল সম্প্রদায়গুলো ভেঙে পড়তে লাগল মানসিক বিবর্তনের চাপে। ভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন জীবিকার মানুষ, মনোজগতে বিচ্ছিন্ন তারা। প্রকৃতি, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল স্বাভাবিকভাবে। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি নানা মতবাদ সারা পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো।

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই ব্যাপক পটভূমিকায় শিল্পকলা নানা ঘাত-প্রতিঘাত বহুমুখী সব আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের এইসব শিল্পান্দোলন স্বাভাবিকভাবে এদের আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছিলো। ঠিক যেমনভাবে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রাজনীতি সরা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাশ্চাত্যে যুগে যুগে চারুশিল্পের যে ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে তাতে বিষয়বস্তুর স্বভাবধর্মী রূপায়ণই দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পী হুবহু রূপের প্রতিফলনের প্রত্যাশী নন। তাই আধুনিক শিল্প বাস্তবের অনুকরণ মাত্র নয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় এতো ব্যাপক জটিলতার সমাবেশ ঘটেছে যে, সহজ সরল ভাষায় এখন সবকিছু আর বলা সম্ভব নয়। কারণ শিল্পীর মনের ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে, সংক্ষেপে বহু কথা ইঙ্গিতে বলতে হচ্ছে, সামান্য কথায় হয়তো পুরো জগতের রেশ পাওয়া যাচ্ছে। যান্ত্রিক সভ্যতায় প্রকৃত রূপ, নগর বা আকারের প্রভেদ রাখাও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। বিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে মানুষের বাইরের চেহারাটা একটা খোলস

মাত্র। ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপ ছলনা বিশেষ অর্থাৎ চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা-ই যে তার আসল চেহারা হবে এমন কোনো কথা নেই। বস্তুর বাইরের রূপ আর ভঙ্গি শিল্পীর মনে যে ভাবের ইঙ্গিত করে, বস্তুত সেটিই তার প্রকৃত চেহারা। বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যবিহীনতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে এর মূল কথা।

ফলে পাশ্চাত্য সমাজের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার আলোক শিল্পচেতনার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, পাশ্চাত্য শিল্পের সনাতনি স্বভাবধর্মী চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে বিমূর্তাশ্রয়ী আঙ্গিকপ্রধান নানা আন্দোলনে তা পর্যবসিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের পশ্চাদপদ, অতীতমুখী, গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিস্থিতি অনুপস্থিত ছিলো, যা পাশ্চাত্যে বিমূর্তাশ্রয়ী শিল্পান্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ফলে এ শতকের পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশের আধুনিক বিমূর্ত শিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিক অর্থাৎ বাইরের আবরণটুকু গ্রহণ করে, শিল্পচর্চায় আঙ্গিক-সর্বস্বতাকে মুখ্য করে তুলেছিল। শিল্পে আঙ্গিক তথা নির্মিতির ব্যাপারটি যদিও কোনো গৌণ বিষয় নয়, কিন্তু দেশ-কাল-ঐতিহ্য এবং শিল্প নির্মাণের দার্শনিক দিকই যে একটি শিল্পের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি বা আঙ্গিক গড়ে তুলতে পারে– তা বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চায় এই সন্ধিক্ষণে উপেক্ষিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের শিল্পকলায় শিল্পচেতনার এই অভাব প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারেরই আরেকটি দিক। ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুবাদে বিজিত জাতীয় হীনমন্যতায় পাশ্চাত্যের সবকিছুকে নির্বিশেষে সর্বোত্তম বিবেচনা করার ঔপনিবেশিক মানসিকতাই এতে সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে শিল্পকলা প্রসঙ্গে এই মনোভাব ছিল আরো মর্মান্তিক। মূলত ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে এদেশের ঐতিহ্যগত শিল্পকলা সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যের স্বভাবধর্মী শিল্পের পাশে ভারতের আলঙ্কারিক শিল্পকলাকে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় একটি নিকৃষ্ট শিল্প হিসেবে বিবেচনা করেছে।

“উনিশ শ দুইয়ে ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ বইতে বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয়রা ইয়োরোপের তুলনায় চিরকালই অপটু। আঠারো শ তিরানব্বইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘রবিবর্মা’ প্রবন্ধে বলেছিলেন, ইয়োরোপের তুলনায় এ দেশের ছবি বর্বর অবস্থা থেকে কমই এগিয়েছে।[৩]

মূলত ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং ঔপনিবেশিক শিল্প শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এদেশের ঐতিহ্যগত শিল্পসমূহ সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলো এবং এ শিল্প সম্পর্কে সাধারণ্যে এক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছিল।

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ১৮৬৪ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে হেনরি হোভার লক্ যোগদানের পর থেকে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যগত স্বভাবধর্মী একাডেমিক পদ্ধতির পরিচয় স্থানীয় ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। কিন্তু ১৮৯৬ সালে আর্নেস্ট হ্যাভেল এ স্কুলে যোগদানের পর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেনরি লক্ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য একাডেমিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছিলেন। হ্যাভেল আর্ট কলেজে গ্রিক-রোমান মূর্তি দেখে অঙ্কন অনুশীলনের পরিবর্তে, ভারতের পুরামূর্তি দেখে অঙ্কনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আমলে ভারতের নিজস্ব শিল্পঐতিহ্যকে আদর্শ জ্ঞান করে চিত্রাঙ্কন করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়েছিলো।

কলকাতা আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্যের একাডেমিক আর্ট হটিয়ে ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিকগুলোকে শিক্ষার বিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর দেখা গেলো, স্কুলের ভারতীয় ছাত্ররা হ্যাভেলের বিরুদ্ধে

প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেছিলো। এ প্রসঙ্গে আর্নেস্ট হ্যাভেল ১৯০৮ সালের জুলাইতে লন্ডনের 'স্টুডিও' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন,

"আমি অ্যান্টিক ক্লাস তুলে দিয়ে ভারতীয় শিল্পকে শিক্ষার ভিত করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করেছিলাম। এই পরিবর্তনের ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। বাঙালিরা চরিত্রগতভাবে রক্ষণশীল... দলে দলে ছাত্ররা স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। ময়দানে জনসভা করে ও সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র দেয়। এইসঙ্গে 'প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলো আমার বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদগার করতে থাকে।[৪]

বাঙালি পরিচালিত *বসুমতী, সাহিত্য, বেঙ্গলি, মিরর* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় একজোট হয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে আর্নেস্ট হ্যাভেলের শিক্ষানীতির বিরোধিতা লক্ষ করার বিষয়। *বসুমতীতে* লেখা হল...

"আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, মি. হ্যাভেল এ দেশের উচ্চশিল্পের মুণ্ডপাত করিবার জন্য যথাসাধ্য করিতেছেন। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে কিনা, তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। তবে তিনি নিজের চেষ্টাতেই যতখানি কাজ গুছাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অন্যের সহিত এ জন্য ষড়যন্ত্র করিবার আবশ্যক হইবে না। আমাদের দেশের লোকের মঙ্গল করিতেছেন, দেশের বন্ধু হইয়াছেন, এরূপ পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হইয়া মি. হ্যাভেল দেশের উচ্চশিক্ষার যে মহাঅনিষ্ট ঘটাইতেছেন, কর্তৃপক্ষের তাহা দেখিবার ও বুঝিবার সময় আসিয়াছে।[৫]

বসুমতী এখানে উচ্চশিক্ষা বলতে পাশ্চাত্যের স্বভাবধর্মী একাডেমিক আর্টকে বুঝিয়েছে এবং এই শিল্পের রক্ষার্থে সেই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে যারা এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে কোনোভাবে এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়। –বস্তুত একাডেমিক আর্টের মাধ্যেমে এদেশের শিক্ষিত ছাত্রদের সামনে সরকারি- বেসরকারি চাকরির যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কায়েমি স্বার্থে সরাসরি আঘাত লেগেছিলো বলে শিক্ষিত সমাজ হ্যাভেলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

শুধু তাই নয়, চাকরিজীবী বঙ্গসন্তানরা আর্নেস্ট হ্যাভেলের নীতির প্রতিক্রিয়া থেকে ঔপনিবেশিক স্থিতাবস্থার স্বার্থে নিজেদের উদ্যোগে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য একাডেমিক পদ্ধতিতে আর্ট স্কুল তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

"রনাদ প্রসাদ দাশগুপ্ত আর্নেস্টের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত না করেই সম-মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের জন্য আঠারো শ সাতানব্বইতে 'জুবিলি আর্ট একাডেমি' স্থাপন করেন।[৬]

–লক্ষ্যণীয় রনদা প্রসাদ রাণি ভিক্টোরীয়ার রাজ্যশাসনের জুবিলি উৎসবের স্মরণে এই স্কুলের নামকরণ করেছিলেন। বিজেতা জাতির দুর্বল ও হীনমন্য মনোভাবেরই প্রতিফলন এতে ঘটেছিলো। উল্লেখ্য এই স্কুলের ছাত্র হেমেন মজুমদার, অতুর বসু প্রমুখ পরবর্তী সময়ে এদেশে পাশ্চাত্য স্বভাবধর্মী একাডেমিক ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

উপনিবেশে প্রবল বিজেতা বিজিতের কাছে শক্তিমত্তার কারণে আদর্শের পরাকাষ্ঠা হয়ে ওঠে। কারণ বিজিত জাতির মধ্যে থাকে পরাজয়ের গ্লানিজনিত হীনমন্যতা। এই সুযোগ বিজেতা তার ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তৎপর থাকে এবং ক্রমাগত মানসিক অভিভাবন থেকে বিজিত জাতিও বিজেতার ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার আদর্শকে আত্মস্থ করে বিজেতার সাথে মানসিক ঐক্যের অনুভবে সম্পর্কিত হওয়ার চেষ্টা করে।

উপনিবেশ বিস্তারের সাথে সাথে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে স্বাভাবিকভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক পৌঁছেছিলো। ঊনবিংশ শতকে এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষের লেখায় ও কথায় নিজের দেশের পরম্পরা সম্পর্কে অজ্ঞতা, অনীহার সাথে নানা বিষয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিদিত হয়েছে।- এদেশেও এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষের কাছে ইংরেজরা নানা দিকে আদর্শের মাপকাঠি হয়ে উঠেছিলো।

"বিশ শতকের গোড়াতেও এদেশি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মানসিক দাসত্ব ছিল ব্যাপক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জনের অন্তিম লক্ষ্য মনে করা হত ইয়োরোপীয় আদর্শকে। এ-দেশি বালকেরা নেলসনের বীরত্বে অভিভূত হত, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হত বাংলার স্কট, রবিবর্মাকে ভারতের রাফায়েল, রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলি।"[৭]

বিজেতা এবং ইংরেজকে অনুকরণ করে তার সমকক্ষ হওয়ার বাসনা এবং কোনো ইউরোপীয় চরিত্রকে সাফল্য অর্জনের মাপকাঠি গণ্য করে সেই চরিত্র হয়ে ওঠার গৌরবে দাসত্বের পরিচয় ছাড়া আর কী থাকতে পারে?

এই হীনমন্যতা ভারতের জন্যে প্রবর্তিত বেবিংটন মেকলে'র দূরভিসন্ধিমূলক শিক্ষা প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ ফল, যা কলকাতা তথা বঙ্গদেশে প্রকট রূপ ধারণ করেছিলো। এরই পরিণামে ইয়ং বেঙ্গলের উড়নচণ্ডী তরুণরা এদেশের সমাজে ইউরোপীয় সভ্যতার শিকড় প্রোথিত করার স্বপ্ন দেখেছিলো। পাশ্চাত্য ধর্ম, পোশাক, ভাষা, রীতিনীতি, জীবন-যাপন সবকিছুকে তারা অনুকরণযোগ্য মনে করলেন। রাজনৈতিক দাসত্ব ক্রমে মানসিক দাসত্বে পরিণত করাই উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য থাকে। ফলে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি এদেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে জীবনের পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছিলো। কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক সমাজের চাত্রদের কাছেও ইউরোপীয় শিল্পচর্চা আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিলো।

এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে এদেশের শিক্ষিত মানুষ পাশ্চাত্য স্বভাবধর্মী একাডেমিক আর্ট এবং পাশ্চাত্যের সমস্ত রকম শিল্পকলাকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলো। এর ফলে ইউরোপ থেকে বহু নিকৃষ্ট মানের ও নিম্নরুচির শিল্পনিদর্শন বহুল পরিমানে এদেশে এসেছিলো এবং সমাজে শিল্পের পরাকাষ্ঠা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো। বিংশ শতকের গোড়াতেও এ দেশের বিত্তবান গোষ্ঠীর মানুষেরা যে এই একাডেমিক আর্টের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তা ইতালি থেকে আনানো পুতুলসদৃশ মর্মর পাথরের মূর্তি এবং পাশ্চাত্যের কালজয়ী শিল্পীদের ছবির নিকৃষ্ট অনুকৃতি দিয়ে ঘর সাজানো দেখলে সহজে অনুমান করা যায়। মূলত একাডেমিক চিত্র ও রোমান টাইপের মুর্তিগুলো এদেশে উপনিবেশবাদের সুবিধায় তৈরি হওয়া বিত্তবান সমাজে আভিজাত্য ও বৈভবের প্রতীক হয়ে উঠেছিলো।

একটি সমাজের চরিত্র, অভিজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও অর্জনসমূহ সেই সমাজের বিবর্তনেরই ফল। ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগে ঐতিহ্যের সেই ধারাবাহিকতার সাথে এদেশের সমাজের বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিলো। সেই বিচ্ছিন্নতার বোধ হয় এখনো অবসান ঘটেনি। কারণ পাশ্চাত্যকে মাপকাঠি ধরার সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় নানা ক্ষেত্রে এখনো আমাদের সমাজে বর্তমান। শিল্পকলা তথা সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে নির্বিশেষে অনুকরণের প্রচেষ্টার মাঝে সেই প্রবণতাই নিহিত আছে। অথচ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পাশ্চাত্যের যেসব শিল্প-আচরণবিধিকে এদেশের শিল্পীরা সর্বাধুনিক বিবেচনায় অনুকরণ করেছেন, সেই শিল্প-প্রবণতাসমূহের জন্মের পেছনে প্রাচ্য শিল্পের এক বিরাট ভূমিকা ছিলো। মূলত ঊনবিংশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপে শিল্পকলার বিমূর্তায়ন প্রক্রিয়া প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত শিল্পের সরাসরি সংস্পর্শে জন্ম নিয়েছিলো ।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস কেবল উপনিবেশ বিস্তার বা আর্থ-সামাজিক আধিপত্যের ইতিহাস নয় । এ দুই শতকে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সূত্রে আদান-প্রদানে উপনিবেশের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলো ক্রমে ইউরোপেরি দিকে পৌঁছাতে থাকে । জাপান ইউরোপের কোনো উপনিবেশ না হলেও জাপানি সংস্কৃতি ইউরোপে পৌঁছে সেখানকার সমকালীন চিত্রভাবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছিলো । ঊনবিংশ শতক জুড়ে যেমন ইউরোপে তেমন এশিয়া-আফ্রিকার নানা আত্মচেতন ও অসচেতন সংস্কৃতিতেও নিজেদের নতুন করে দেখার প্রবণতা জোরদার হয়েছিল । এই বিশ্বজনীন প্রবণতার দরুণ দেশে দেশে নিজেদের সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতার বাইরে তাকাবার এবং দেশ-বিদেশের চিত্রগুণ আত্তীগত করার প্রয়াস দেখা যায় । গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৎকালীন পাশ্চাত্য শিল্পের কেন্দ্র প্যারি'র তরুণ শিল্পীরা নতুন শিল্পভাষায় প্রেরণা ও উপাদান খুঁজেছিলেন নিজেদের পরিচিত সাংস্কৃতিক আবহের বাইরে ।

"আঠারো শ ঊনষাট-এ ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর এদ্‌গার দেখা নতুন শিল্পভাষার অনুসন্ধানে জাপানি কাঠখোদাইর গুণ আত্তীগত করেছিলেন । এ দুয়ার মানে, অলফ্রেদ্ সিসলি, পিয়ের অউগুস্ত রেনোয়া জাপানি কাঠখোদাই গুণ সাঙ্গীকরণে তৎপর হয়েছিলেন ।... পোস্ট-ইমপ্রেসনিস্ট পল গগ্যাঁ, ভিনসেন্ট ফান গখ্, তুলু লোত্রের ছবিতে জাপানি কাঠখোদাই প্রভাব অক্ষয় হয়েছে ।... এরপর আর্ত নুভ আন্দোলনে জাপানি, জাভানি, কম্বোজি, ফারসি শিল্পের নক্‌সাগুণ প্রবল প্রভাব ফেলেছে । কিউবিজমে হিসপানি ইবেরীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছাড়াও আফ্রিকি উৎসর্গ শিল্প ও আনুষ্ঠানিক শিল্প যথা দারুভাস্কর্য ও মুখোশের লক্ষণ সরাসরি বর্তমান ।[৮]

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পান্দোলনে শুধুমাত্র জাপানি, আফ্রিকি বা ফার্সি প্রভাবই যে ছিলো তা নয় । বাংলার নিজস্ব শিল্প ঐতিহ্য কালিঘাট পটের চিত্রাঙ্গিক যে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার মহান শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিলো, ইতিহাস চেতনার অভাবে এ সংবাদটি হয়তো আমাদের অনেকের জানা নেই । পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পান্দোলন শুধুমাত্র জাপনি, আফ্রিকি বা ফারসি প্রভাবই যে ছিলো তা নয় । বাংলার নিজস্বা শিল্পঐতিহ্য কালিঘাট পটের চিত্রাঙ্গিক যে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার মহান শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিলো, ইতিহসা-চেতনার অভাবে এ সংবাদটি হয়তো আমাদের অনেকের জানা নেই ।

"উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যখন ইয়োরোপের আধুনিক চিত্রকরেরা তাঁদের ঐতিহ্যের বাইরে অনুসন্ধান করছিলেন, তখন তাঁরা নিঃসন্দেহে কালিঘাটের পট আর বটতলার কাঠখোদাই- এর অবয়ব বিন্যাস দেখেছিলেন ।... কালিঘাটের ছবির ডৌলনির্ণায়ক পরিণাহ ঘেঁষা পর্দাজ রেখা, নলির মতো অবয়বের গড়ন, অবয়বের স্থুল পিণ্ডত্ব যে পাবলো পিকাসো, অঁরি মাতিস, ফেরনদঁ লেজে ব্যবহার করেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁদের ছবি ।[৯]

পাশ্চাত্য শিল্প-ঐতিহাসিক উইলিয়াম উল্লেখ করেছেন যে, বটতলার ছবি এবং কালিঘাটের পট ইউরোপে প্রচুর বিক্রি হত । ইউরোপের রাজধানীগুলোতে ছবির বাজারে এ ছবি যে বিক্রি হত সেটা বুঝা যায়, ইউরোপের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে কালিঘাটের পটের সংগ্রহ দেখে । কালিঘাটের পটে পাশ্চাত্যের স্বাভাবধর্মী শিল্পের প্রভাব আছে বলে একটা ভ্রান্ত ধারণা উইলিয়াম আর্চারের মধ্যে থাকলেও, পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন আধুনিক শিল্পীকে কালিঘাট ও বটতলার ছবি যে প্রভাবিত করেছিলো তা তিনি স্বীকার করেছেন ।

"ফরাসি আধুনিক শিল্পকলার একজন মহান শিল্পী ফার্নান্ড লেজারের শিল্পবৈশিষ্ট্যের সাথে কালিঘাট চিত্রাঙ্গিকের মিল একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। লেজারের চিত্রের বলিষ্ঠ বহিঃরেখা এবং নলির আকারে অবয়বের সহজ সরল রূপায়ণ কালিঘাটের চিত্রকলার আঙ্গিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।"[১০]

উইলিয়াম আর্চার এ প্রসঙ্গে সরাসরি উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কালিঘাটের পটের অনুকরণে বটতলার কাঠখোদাইকারের আঁকা 'গলদা চিংড়ি' ছবির বিষয়বস্তু, কম্পোজিশন ও অঙ্কন-শৈলীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় লেজার তাঁর 'সোডার বোতল' চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

এমন প্রমাণ আরো আছে। যেমন কালিঘাটের চিত্রকর নিবারণচন্দ্র ঘোষের আঁকা 'গোলাপ সুন্দরী' এবং লেজারের ছবি 'শায়িতা রমণী'। লেজার কালিঘাটের গোলাপসুন্দরীর মতো তাঁর শায়িতা রমণীর হাতেও গোলাপ ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এ দেশের শিল্পীরা প্যারিস, নিউইয়র্কের বিমূর্তাশ্রয়ী শিল্পকলাকে আধুনিক বিশ্ব-শিল্পকলার আদর্শ জ্ঞান করে তাদের অনুকরণে সক্রিয় থেকে ঔপনিবেশিক হীনমন্যতায় নিজেদের বিশ্ব শিল্পভাবনের শরিক মনে করেছে। পাশ্চাত্য চিত্রকলার আধুনিক অভিব্যক্তি নির্মাণে জাপান, পারস্য, আফ্রিকা, চীন ও অন্যান্য দেশের মতো এদেশের ঐতিহ্যগত চিত্রকলারও যে বিরাট ভূমিকা ছিলো, সে ইতিহাস জানা ও এ সম্পর্কিত কোনো আগ্রহ এদেশের শিল্পাঙ্গনে দেখা যায়নি। মূলত শিল্পকলার বিচার-বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য শিল্প-ঐতিহাসিকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিবেচনা না করে নির্বিশেষে গ্রহণ করার ফলেই এই আপাত-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো। কালিঘাটের পট আর বট তলার ছবি এদেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। বেবিংটন মেকলে'র অভিভাবনে অভিভূত এদেশের শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমের রেনেসাঁ, বারোক, রোমান্টিসিজম, রিয়ালিজমের চিত্রকলাকে আদর্শ বিবেচনা করেছিলো। এই শিক্ষিত মানুষের ভিক্টোরীয় রুচিতে এদেশের ছবির তীব্রতাও রুচিকর মনে হয়নি। কিনউত বিষয়ের ভার বইবার জন্যে বাংলার লোকায়ত শিল্পীরা নিজেদের অশিক্ষিত পটুত্বে যে আশ্চর্য 'বাঙলা ঘরানার' শিল্পকলা রচনা করেছিলেন, পাশ্চাত্যের মানুষ এর অসাধারণ শৈলীগুণে আকৃষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু এদেশের মানুষ তাদের ঘরের শিল্পকে উপেক্ষা করে পরের দ্বারে ধরণা দিয়েছিলো।

বাংলাদেশের শিল্পকলার সমস্যা ও বিভ্রান্তিসমূহ তার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার থেকেই জন্ম নিয়েছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের শিক্ষাক্রমের আলোকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিলো। এইসাথে ব্রিটিশ আমলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এই সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

এদেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনই হয়েছিলো একটা চরম ভ্রান্তি থেকে। কারণ ইংরেজরা সৃজনশীল চারুশিল্পী না গড়ে মূলত কারিগর সৃষ্টির লক্ষ্যে টেকনিক্যাল স্কুলের আদর্শে আর্ট স্কুল নির্মাণ করেছিলো। পরে বিভিন্ন সময়ে এই স্কুলের শিক্ষাক্রমে বেশকিছু পরিবর্তন আসলেও, সৃজনশীল শিল্পী তৈরির উন্মুক্ত পরিবেশ এখানে কখনো গড়ে ওঠেনি।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভারতের ঐতিহ্যগত শিল্পসমূহকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো। এবং পাশ্চাত্যের স্বভাবধর্মী শিল্পকলাকে শিক্ষার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারিত করা

হয়েছিলো। ফলে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের কাছে পাশ্চাত্যের স্বভাবধর্মী শিল্পই হয়ে উঠেছিলো সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকলার পরিচায়ক। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বিজিত জাতির হীনমন্যতায় এদেশের শিক্ষিত মানুষও মনে করত যে, ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। এদেশের আলঙ্কারিক শিল্প একটি নিকৃষ্ট শিল্প মাত্র। এদের কাছে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যগত স্বভাবধর্মী শিল্পকলাই শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো।

ঔপনিবেশিক ইংরেজরা কলকাতা আর্ট স্কুলে শিল্পকলা সম্পর্কে এক চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো। এই বিদ্যালয়ে চারুকলাকে পাশ্চাত্য শিল্প এবং প্রাচ্য শিল্পে বিভক্ত করে শিক্ষার্থী ও সাধারণের মাঝে সার্বিকভাবে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইংরেজরা শিল্পকলাকে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি নানা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় বিভক্ত করে একে সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেয়ার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলো।

ব্রিটিশ আমলে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তার প্রভাব শিল্পকলার অঙ্গনেও পড়েছিলো। কারণ ব্রিটিশ আমলের শুরুতেই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, তাতে হিন্দু সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিলো; কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানরা এতে অংশ না নেয়ায়, তারা শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের পেছনে পড়ে গিয়েছিলো। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক ব্যবধান বেড়ে যায়। এই শতকের গোড়ায় মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে চেতনার বিকাশ ঘটালেও উভয় সম্প্রদায়ের দূরত্ব কমেনি। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছিলো। পরিণামে সম্প্রদায়গত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ শতকের চল্লিশের দশকে মুসলমান সম্প্রদায় যখন সম্প্রদায়গত বাটোয়ারায় আলাদা আবাসভূমির দাবি তুলেছিলো, তখন নব্য শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরাও এতে সামিল হয়েছিল। এ শতকের ত্রিশের দশক থেকে যেসব বাঙালি মুসলমান শিল্পী শিল্পচর্চায় এগিয়ে এসছিলেন, তাঁরা এই পরিস্থিতির শিকার ছিলেন। প্রথমত শিল্পশিক্ষায় ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য, দ্বিতীয়ত নিজস্ব ধর্মীয় কারণে সামাজিক বাধা এবং তৃতীয়ত সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সম্প্রদায়গত তথা অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা চাপের মধ্যে ছিলেন। মূলত সংখ্যালঘু বাঙালি মুসলমান শিল্পীদের চাকরিগত অনিশ্চয়তা এবং শিল্পী হিসেবে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের প্রশ্নে কলকাতার মুসলমান শিল্পীরা মুসলমানদের জন্যে পরিকল্পিত আলাদা ভূখণ্ডে (পূর্ব পাকিস্তানে) আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্ব অংশে কলকাতা থেকে আগত বাঙালি শিল্পীদের একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা কঠিন ছিলো। কারণ রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সামাজিক পরিস্থিতি ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে শিল্পকলা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নীতিনির্ধারকরা জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সরকারে কর্মসূচির সহজ ও ব্যাপক প্রচারে শিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এখানে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা'য় যে আর্ট কলেজটি গড়ে উঠলো, তার চরিত্র— কাঠামোটি কলকাতা আর্ট স্কুলের ঔপনিবেশিক আদর্শেই নির্মিত হয়েছিলো। কারণ ঢাকা আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা কলকাতা আর্ট স্কুলের ঐতিহ্যই তাঁদের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। ফলে ঢাকা

আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রমে বিশেষ আঙ্গিকের ভিক্টোরীয় স্বভাবধর্মিতা এবং সামগ্রিকভাবে ঐতিহ্যহীন সৃজনবিমুখ এক আকারবদ্ধ পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। ঢাকা আর্ট কলেজের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই চেতান সঞ্চারিত হয়েছিলো।

পাকিস্তানের সমস্ত শৈল্পিক কর্মকাণ্ডকে একটি পরোক্ষ প্রভাব ও সুনির্দিষ্ট চরিত্র দেয়ার জন্যে যখন 'আর্টস কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শিল্পীদের মধ্যে পেশাদার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এরই পরিণামে সমাজ, রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি প্রতিযোগিতার বাজারে পৃষ্ঠপোষকের কাছে গ্রহণীয় শিল্পীশৈলী তথা নিজস্ব শিল্পাঙ্গিক নির্মাণে শিল্পীরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সামগ্রিকভাবে শিল্পীদের মধ্যে এই চেতনাই এসেছিলো যে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এমন শিল্পশৈলী তৈরি করতে হবে– যা সবার কাছে গ্রহণীয় বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনের এই সন্ধিক্ষণে এ দেশের শিল্পীরা প্রথম পাশ্চাত্যের বিমূর্ত ও বিমূর্তাশ্রয়ী শিল্পাঙ্গিকের সরাসরি সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকিস্তানের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই শিল্পের যেমন একটি স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তেমনি এর ছিল একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র। বিমূর্ত শিল্পের নানামুখী চর্চায় বাংলাদেশের শিল্পীদের সৃজনশীল চেতনা উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। আর এর ফলে ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার সৃজনবিমুখ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের শিল্পকলা তার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য পরিহার করে নতুন যুগে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলো।

তথ্যনির্দেশ

১. কামরুল হাসান, 'কণ্ঠস্বর (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা)- জুন ১৯৮৬', ঢাকা, পৃ. ৩৩।
২. Ed. Dr. Muhammad Sirajul Islam, 'Zainul Abedin', Dhaka, (See introduction).
৩. শোভন সোম, 'অনুষ্টুপ : শারদ সংখ্যা', ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ. ৬৮।
৪. ঐ, পৃ. ৭৫।
৫. ঐ, পৃ. ৭৭।
৬. শোভন সোম, 'অনুষ্টুপ : শারদ সংখ্যা', ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ. ৭৫।
৭. ঐ, 'ওপেনটি বাইস্কোপ,' কলিকাতা, পৃ. ৭৯।
৮. ঐ, পৃ. ৬৫-৬৬।
৯. ঐ, পৃ. ৫৬।
১০. W. G. Archer, 'Kalighat Paintings', London, p. 17.

[লেখক: গবেষক । প্রাবন্ধিক।]

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প

ম ই নু দ্দী ন খা লে দ

বাঙালির শিল্পকৃতির আধুনিকতা: আদিপর্ব
কথা: পরম্পরা

ধীর লয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল বাদশাহি জেল্লা। জৌলুসি মোগল অনুচিত্রের আভিজাত্য টুটে গিয়েছিল প্রতীচ্যের কানুনের সঙ্গে বৈঠকি আলাপ জমানোর জন্য। রঙের ঠাস বুনট, জমজমাট অলংকার, পট দ্বিমাত্রিক, কিন্তু কী ফুল্ল পটভূমি, এ মোগল জমিনও আর অনাবিল র্ইল না। রেখা একটু অন্যভাবে বেঁকে গেল, যাতে বেধ যোজিত হল তিন মাত্রার আর রঙ আভাসিত হল এমনভাবে যাতে উজিয়ে এল মডেলিং। পড়ন্ত মোগল সাম্রাজ্যর সময় থেকেই সাগরপাড়ের অচেনা নিয়মে আক্রান্ত হয় উপমহাদেশের ছবি। এক সময় ইতিহাসের অনিবার্যতায় দরবার ভেঙে যায়। অনুচিত্রের জমিনে স্বরাট পশ্চিমি নিয়ম। প্রতীচ্যের সেই নিয়ম তছনছ করে দেয় পূরবী ছবির দ্বিমাত্রিক রেখাময় বাগান।

সেই বাগান শুধু মোগলের ছিল না। তুরস্ক আর পারস্য ঘুরে দিল্লির দরবার ছুঁয়ে মুর্শিদাবাদে বা বাংলায় প্রসারিত হয়েছিল যে অনুচিত্র বা মিনিয়েচার, পূরবী ধারা বলতে শুধু তাকেই বোঝানো হয়েছে এতকাল। কিন্তু রেখা টেনে স্পেসের হিসাব মিলিয়ে ইমেজ সৃষ্টির মানে যদি ছবি আঁকা হয়, তাহলে মানতে হয় ব্রাত্যজনের অনাদি কালের সব আঁকিঝুঁকি, নকশা-সংকেত, চলচিত্র, এসবই ঐ একই ধারাস্নাত। বরং বলা যায় পূরবী ছবির জমিনে সবচেয়ে বেশি পলি উপহার দিয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের চিত্রভাবনা। আর দরবারি মিনিয়েচারের শুরুটা যদি তলিয়ে দেখি তাহলে স্পষ্টতই দ্রষ্টব্য যে পূর্ব এশিয়ার ব্রাত্যজনের অন্তরের রঙ ছুঁয়েই তা অনুচিত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল একদিন।

আর মাটির দেয়ালের চালচিত্র অথবা সরাচিত্র বা পটচিত্রের দিকে তাকিয়ে এখন এশিয়ার এই ব-দ্বীপের মানুষের নন্দনতত্ত্বের ঠিকুজি খোঁজার তাগিদ নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। নদী অববাহিকায় মৃৎপাত্রে যে চিত্র মানুষ এঁকেছিল অজানা অতীতে অথবা পাহাড়ি ভূমির আদিবাসীরা যে নকশা কেটেছিল তার শিকারের হাতিয়ারে, সেই প্রাগৈতিহাসিক নন্দনভাবনার সঙ্গে এখনকার মানুষের সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ, কিন্তু যখন ভাবি একটা নকশাই একটি ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠীর ভাবনার বিমূর্ত প্রতীক আর এ প্রতীক যদি পৃথিবীর অপরাপর প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখন সহজেই তার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। কেন তা একান্তভাবে এ ভূখণ্ডের, এশীয় বাংলার বদ্বীপীয়; কেন তা আফ্রিকার বা লাতিন আমেরিকার নয়, নয় তা অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের চারুভাবনার অনুসারী, তার গ্রন্থিমোচনের মধ্য দিয়ে আজকের বাঙালির স্বভাব বিশ্লেষিত হতে পারে। আবার শিল্প যখন আধুনিকতার সহস্রপথ পাড়ি দিয়ে এখন বিচিত্রভাবে ঋদ্ধ আর

ভূমণ্ডলায়ন, গ্লোবাল ভিলেজ, এসব শতাব্দী শুরুর ডাকে পৃথিবীর দেশীয় ও এমনকি মহাদেশীয় সীমা যখন উঠে যাচ্ছে তখনও কি আমরা ঠিক ঠিক চিনে নিচ্ছি না শিল্পের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য?

এটি এশিয়ার, ওইটি আফ্রিকার বা লাতিন আমেরিকার। আর ইউরোপীয় কাজ দেখে এখন কি ইঙ্গিত আসে না যে সেসব কাজের উৎস গ্রিস, রোম অথবা গথিক শিল্প? এ মনে হওয়া, মনে হওয়া মাত্র থাকবে না, যদি অনুপুঙ্খতায় চিরে চিরে দেখি সেই শিল্প। ভাবি, তার রেখার ধর্ম, রঙের আচরণ। একটি মানুষ যখন একটি রেখা টানে তুলি বা কাঠির মাথায় রঙ লাগিয়ে অথবা পুঁইগোটা বা অন্য কোনো বর্ণ উপাদান আঙ্গুলের ডগায় লাগিয়ে মাটিতে বা দেয়ালে টানে রেখা তখনই তাতে বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত হয়ে যায় তার চেতনা। মানে সেই মানুষের মন। মনন ভাবনা। নন্দনতত্ত্ব। সেই নন্দনতত্ত্ব একটি মানুষের নয় আর। একটি জাতির। একটি বিশাল ভূখণ্ডের জল হাওয়ায় লালন-পালনে সমৃদ্ধ সেই মন। এ মন কথা বললে আমরা বুঝতে পারি কার সঙ্গে সম্পর্ক সিন্ধু সভ্যতার, কে কথা বলছে দূর ক্রিটের সভ্যতার সঙ্গে। কার দেশ বঙ্গোপসাগরের জল ধুয়ে দেয় আর কাকে স্নিগ্ধ করেছে ভূমধ্যসাগরের জল।

যুগান্তরে শত সভ্যতার সহস্রস্রোতে আবিল হয়ে উঠলেও সে সংকেতে একটি দেশ, জাতি ও জনগোষ্ঠী নিজের বলে সনাক্ত করে নেয় বার বার। তা আসলে নিম্নবর্গীয় মানুষের চেতনা স্নিগ্ধ বৈশিষ্ট্য। যা বোধহয় কখনো মরে যায় না। কালান্তরে তা চালিত হয়ে অবিনশ্বর থেকে যায়। এ অবিনশ্বর চেতনার শৈল্পিক স্মারক বনাম বাইরের পৃথিবী থেকে আসা শিল্পের কানুনের মধ্য দিয়ে বাঙালির চিত্র একটা জঙ্গম চেহারা পেয়েছে। আর সব দরবারি নিয়ম দেশীয় অনুদানে নতুন লাবণ্য পেয়ে তবে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার হয়েছে। তাই প্রসিদ্ধ সভ্যতার সূত্র ধরে শিল্পের যে ইতিহাস বই পড়া হচ্ছে তাতে গুরুত্ব রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের সৌন্দর্যভাবনার। তাই মধ্য এশিয়ার মোগল ভারতে এসে ভারতীয় আর আমাদের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী টেরাকোটা পুরনো ঢাকা, লালবাগের বা মুর্শিদাবাদের অনুচিত্র পরিণামে সাধারণ ব্রাত্যশিল্পীর আঙ্গুলের চাপে বিশেষ নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ।

মাটির দেয়াল, মৃৎপাত্রের ঘোরানো-পেঁচানো রমণীয় শরীর, পিঁড়ির বুক, দা, ছেনি, খন্তির হাতল, বেড়া-দরমা, কড়ি-বরগার বাহু, বটি, কুলা, পলো-ঝুপড়ি, আর জালে ও চালে যত নকশা তাই প্রসারিত ছবিতে। পটচিত্র, পুতুল নাচের চিত্র, জুয়ার বোর্ডের চিত্র, জমপট, গাজীর পট, কালীঘাট চিত্র ও ধারার সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল ইংরেজ বণিকের আমদানি করা সাগর ওপারের চিত্রাদর্শের। আর এ বিরোধ যে কেন তা বুঝতে একশ, সোয়া'শ বছর লেগে গেছে বাঙালির। নিম্নবর্গের শিল্পধারা অর্থাৎ যা প্রধান স্রোত তা কখনো বাইরে থেকে আলটপকা এসে পড়া উপাদানকে আত্মস্থ করে না। বরং তা উগরে দিতে চায়। তা না হলে তার অবস্থা হয় এমন যে, তা আসতে কাটে, যেতে কাটে। ইংরেজের শিল্পাদর্শ শুরুতে অনেকটা এরকম ছিল বাঙালির শিল্পাঙ্গনে। মোগলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ সেই আদর্শ ধীরে ধীরে তার প্রভুত্বের দর্প ভুলে গিয়ে মিশে যেতে চেয়েছে এদেশের মাটির সঙ্গে। সোজাসাপটা কথা, এ ভূখণ্ডে তার আত্তীকরণ হয়েছে ভালো। এ আত্তীকরণের সম্ভাবনার পেছনের কারণ প্রাচ্যভূমির দর্শন, ধর্মভাবনা, আদর্শ, মরমিয়া বোধ আর বাঙালির বাউল তত্ত্বের অভিন্ন যোগাযোগ। প্রাচ্যবাদ বা ওরিয়েন্টালইজমের সূত্র ধরে যেভাবে পূর্ব-এশিয়ার বর্ণবহুল শিল্পধারা স্ফূর্তিময় ভারতীয় বিভিন্ন জাতির আচার-অনুষ্ঠান লোকচার-সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরে তেমন ইংরেজ পারেনি।

পারেনি ফরাসি, ডাচ বা অন্য কেউ। পাশ্চাত্যের এ ব্যর্থতার বড় কারণ, প্রাচ্যের মরমিয়া দর্শনকে তারা ছাড় দেয়নি, প্রাচ্যের আলাভোলা রেখার ছবির অন্তর তারা বুঝতে চায়নি। পরিণামে ঐ আর কি, পশ্চিমের বুদ্ধিমার্গী জড়দর্শনের সঙ্গে পূর্বদেশের অধ্যাত্মবাদের রেষারেষি। আর তার চেয়েও বড় কারণ পশ্চিমের রাজনৈতিক দর্শন। তারা ধরেই নিল, দখল করেছে। আবিষ্কার করেছে। উদ্ধার করেছে। আর ভাবল, তারা সভ্যতার প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী। দখলকৃত জনতার সব আয়োজন নিম্নমার্গের। কলম্বাসি চেতনা আর অভিযাত্রিকের চশমা পরার জন্য ইংরেজ ও ফরাসিরা এদেশের অন্তর অনুভব করতে পারল না। কৌলিন্যের চিন্তায় হৃদয় আক্রান্ত হলে সুহৃদ হওয়া যায় না, বন্ধুত্ব হয় না আন্তরিক। তাই পশ্চিম রয়ে গেল উপরে উপরে। আমাদের ছবির সঙ্গে তার মন দেয়া-নেয়া হল না। সম্পর্কটা হল অনেকখানি পোশাকি। আর দরবারের সঙ্গে দরবারের লড়াই। তাই মোগল মিনিয়েচার আর ইংরেজের তৈলচিত্র পরস্পর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভাবের আদান-প্রদান করেছে। কিন্তু বাংলা চিত্রের নিম্নবর্গীয় ধারা নানা পটচিত্র ও ভূয়োদর্শী কালীঘাট কিন্তু ইংরেজের আদর্শ প্রায় প্রাহ্যই করেনি।

কোম্পানি শৈলীর শুরু পর্বে ইংরেজের চোখে ছিল সাত সাগরের আর তেরো নদীর বিস্ময়। কলম্বাসি মুগ্ধতা। আঁকতে হবে সেই বস্তু, মানুষ, জীব, জীবন যা টেমসের পাড়ে সাত জনমে চৌদ্দপুরুষের কেউ দেখেনি। আর এসব এঁকে নিয়ে স্বদেশে নতুন গবেষণা শুরু করতে হবে। কিন্তু সবই আঁকতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এদেশের মানুষেরা এ কীভাবে আঁকে! ছি! ওজন, আয়তন ঠিক নেই। পরিপ্রেক্ষিত বোঝে না। আলো-ছায়ার বিলিবণ্টনে কী করে বস্তুর ভল্যুম দেখাতে হয় তা জানে না এ ন্যাটিভরা। কিন্তু শিল্প যে অন্তরের অভিব্যক্তি, বুদ্ধির কম্পাসে যে তা পরিমেয় নয় তা তখন কে বুঝাবে বিদেশি প্রভুদের। পোকা-মাকড়, লতা-গুল্ম, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, জন-জীবন সব আঁকল ইংরেজ নিজের হিসেবে। বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতার। কিন্তু তা শিল্প পদবাচ্য কিনা আজও এ প্রশ্ন শেষ হয়ে যায়নি।

এশিয়ার চিন্তা-ভাবনার বড় একটা কেন্দ্র ভারত। তাকে খুঁড়ে দেখতে হবে। চালাতে হবে নিবিড় জরিপ। ১৭৮৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ল ওরা। এ সোসাইটি দীর্ঘদিন সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করল এদেশের স্থাপত্য, প্রাচীন শাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি। তারপর দীর্ঘদিন ওদের আর প্রতিষ্ঠান হয়নি। যদিও শাসনের ছত্রছায়া উপনিবেশিক বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। এক সময় অনুভূত হল আবিষ্কৃত দেশের সম্পদ তো আমাদেরই। তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আর সংরক্ষণ করতে হলে সম্পদের হিসেব নিকেশ বুঝে নিতে হয়। এই যে এতসব দালান কোঠা, মন্দির, চৈত্য, সৌধ তা দুচোখের নজরে রাখতে হলে একটা সচিত্র আয়োজন দরকার। ১৮৫৪-তে স্থাপত্যের নকশা তুলে রাখার জন্য একটা বিদ্যালয় হল। নাম সোসাইটি ফর ইন্ডাসট্রিয়াল আর্টস। ১৮৬৪-তে এসে এ বিদ্যালয়ই হল সরকারি আর্ট স্কুল। এদিকে ১৮৬১-তে আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে পুরাতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে ইতিহাসের ধারা বিভিন্ন ঘটনায় হয়ে ওঠে লোমহর্ষক। ১৮৫৮-য় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর জমকালো পরিচ্ছদের ভেতর লুকিয়ে ফেলেন ১৮৫৭'র শহিদ সিপাহিদের রক্তাক্ত দলিল। আবারও ঘনিয়ে ওঠে পাশব প্রহর। সেই প্রহরে নীল-চাষিদের অস্তিত্ব ঘুলিয়ে ওঠে, শোনে তারা নিজেরই নাভিশ্বাসের করুণ নীলশব্দ।

প্রতিষ্ঠিত মানুষের এ চিত্রকলা একদিকে দাসত্ব করতে থাকে ব্রিটিশ নিয়মের। অন্যদিকে হুতোমি সময়, আলালের ঘরের দুলালের সময় বাবু কালচারের সচিত্র দলিল হয়ে প্রকাশ পায়

কালীঘাটের পটে। নিম্নবর্গের মানুষের সাহিত্য ও ছবির ভাষা অনেক সুরের কথা বলে। কখনো গার্হস্থ্য সুখ, কখনো সংসারের অনিত্যতা, আবার কখনো সময়ের সমালোচনা করে তা একই সঙ্গে কালিক ও চিরকালের, এ দুই সূত্র মিলিয়ে হয়ে যায় অবিনশ্বর আত্মা লালন। একই সঙ্গে আছে কোম্পানি শৈলীর ছবি। সেখানে জীবনের চেহারা আছে, আত্মা নেই। নিখুঁত বৈজ্ঞানিক অনুকরণ আছে। ঐ অনুকরণ আবার শুধু সাহেবদের ভালো লাগে যে তা নয়, দেশীয় নব্য ধনীর মন কাড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে শিল্পী আসে জাহাজে চড়ে বিলেত থেকে। তাদের দিয়ে বাবুরা নিজের রূপটা যথাযথ রূপায়িত করিয়ে নেয়। টাঙিয়ে রাখে নিজের সৌধপ্রতিম বাড়ির দালানের দেয়ালে। তা বংশের কৌলিন্য ও আভিজাত্য ধরে রাখার জন্য, পিতা-পুত্রের পরম্পরা ধরে চলে। বিশাল বিশাল তৈলচিত্র। মোহন অভিব্যক্তি মানুষের! মিশরীয় রাজারানির মতো অনন্ত জীবন প্রার্থনার আলো ফুটিয়ে যেন আঁকা সেই ছবি। প্রায় দেবতার অবয়বের মতো তাতে নিকষিত লাবণ্য। তা ঐশী জগতের দিকে আঙ্গুল দেখায়। আর আসলেও তারা সময়ের দেবতা। কারও মাথায় হ্যাট। কারও মাথায় আবার পাগড়ি টুপি। তারা ইন্ডিয়ান রাজার প্রতীক। নিজের অস্তিত্বের গাঁথুনি অটুট রাখার জন্য কোনো না কোনো উঁচু মাপের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত রাখতে হয়। আদর্শ বলতে তখন ধর্মাদর্শ। পৌরাণিক বিষয় আর রাজাপ্রতিম নিজের দেহের ছবি পাশাপাশি রেখে সময়ের ওপর দাপটে জাঁকিয়ে বসলেন সেই দেশীয় প্রতিভূরা। তাদের মনোরঞ্জন চিত্রকরদের করতেই হলো। কারণ, তারাই তো তাদের পোষক। পোষকের রুচি গুরুত্ব পেলে শিল্পের রূপ অনেকখানি মেকি হয়ে যায়। তা-ই রবি বর্মার তুলির স্পর্শে সেই ফ্যাশান মন ভোলালো অনেক বাঙালির। সব কিছুতে চাই রাজতকমা। রয়াল একাডেমির অনুমোদন। ১৮৭৩-এ রবি বর্মার মাদ্রাজের প্রদর্শনী একটা সাড়া দিয়ে গেল রাজতকমা সংগ্রহের। এ ধারাবাহিকতাই শশী হেস, হিরন্ময় রায় চৌধুরী, রণদা প্রসাদ, রামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলি, হেমেন মজুমদার। কিন্তু কোনো শিল্প শাস্ত্রই তো আর পূর্ণত অচল হয়ে যায় না। তা ছাড়া ব্যাকরণ যা-ই থাকুক, তা চুরমার করে সৃষ্টির বেগ ফিনকি দিয়ে বেরুবেই। কিন্তু ব্রিটিশ রয়াল হিসেবের ছবিতে সেই রক্তের ফিনকিটা ছুটতে আরও কিছু দেরি হয়েছিল। অপেক্ষা করতে হয়েছিল একজন অতুল বোস, একজন অমৃতা শেরগিলের জন্য। ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ ধরে নয়, ব্রিটিশ রয়াল একাডেমির সিলেবাস অনুসরণেও বড় মাপের চিত্র সৃষ্টি হয়েছে তা সনাক্ত করাও শিল্প ইতিহাসবিদের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। কলোনি বিরোধিতা আর স্বাজাত্য অভিমানের প্রকোপে শুধু কালীঘাট, লোককলার পরম্পরা ধরে অবনীন্দ্রনাথে এসে গা ভাসিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়ার মধ্যে একটা বড় ভ্রান্তি রয়ে গেছে। ভারতের, বিশেষত কোলকাতার অনেক শিল্প সমালোচক যখন বিভিন্ন পরম্পরা চিত্রকলার তুলনামূলক পাঠ নেন তখন দেখাতে চান যে দেশীয় বা ভারতীয় সভ্যতা ও ঘরানার সূত্র ধরে যে আধুনিকতার জন্ম তা সবসময়ই গুণে ও মানে শ্রেষ্ঠ আর প্রতীচ্যের নিয়মের অনুসারী ছবির মান তেমনভাবে গৃহীত না হলেও চলে। কিন্তু বিষয়টা ভিন্ন ব্যাখ্যা দাবি করে। শাস্ত্র যা-ই হোক না কেন শাস্ত্রের নির্ভরতায় যে সাধনা তা নানা সিদ্ধি আনতে পারে।

একথা অবশ্য সত্য, অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পরও কিন্তু শিল্পে নবজাগরণ আসেনি গত শতাব্দীতে। ১৮৭৪-এ অজন্তা গুহার ছবির ব্যাকরণ তুলে ধরে গ্রিফিথ প্রকাশ করলেন 'অজন্তা পেইন্টিং ইন ইন্ডিয়ান এন্টিকুইটি', ফার্গুসনের 'হিস্টরি অফ ইস্টার্ন আর্কিটেকচার' প্রকাশিত হল ১৮৭৬-এ। ১৮৯২-যখন শিকাগোতে রবি বর্মার ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে এবং আলোড়ন তুলছে, বাংলার নতুন শিল্প তখনও ঋজু হয়ে দাঁড়াতে শেখেনি। চার পায়ে আনুভূমিক হয়ে শৈশব পাড়ি দিচ্ছে মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের খাতার মধ্যে ফুল-পাতা ও মানুষের দেহ তখনও ইলাসট্রেশন মাত্র। কিন্তু ইলাস্ট্রেশনে ভালো জোর আছে। কারণ তার শিক্ষক বিলেতি। নাম পামার।

দুই.

রেনেসাঁর শেষ প্রদীপ: ছবি

গত শতাব্দীর কোলকাতাকেন্দ্রিক জ্ঞানদীপ্তির বৃক্ষের সে আলোর ফুলটি সবশেষে পুষ্পিত হয়েছিল তার নাম চিত্রকলা। দীপায়ন, জ্ঞানদীপ্ত, নবজাগরণ, যে নামেই ডাকা হোক না কেন সেই যুগকে তা বিনা বিতর্কে সার্বিক পুনর্জাগরণ বলে আজ আর সব মহল মেনে নিতে চাইছেন না। মেনে না নেয়ার কারণ– সেখানে যাদের অংশগ্রহণ ছিল সবার অবদান স্বীকার করা হয়নি। তা ছাড়া সবাইকে অংশ নেয়ার সুযোগও দেয়া হয়নি। আর তৃতীয় কারণটি হচ্ছে জাগরণ মানে মুক্তি অর্থাৎ নানামুখি মাত্রা প্রসারণ, তা কি যথাযথ অগ্রসর হয়েছে, নাকি সেই জাগরণকে সীমায়িত রাখা হয়েছে ধ্রুপদী বা ক্লাসিক রীতির বেষ্টনে। বিষয়টা আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে একটু উদাহরণ টানতে চাই। যেমন, গদ্যে বিদ্যাসাগর, কবিতায় মধুসূদন আর উপন্যাসে বঙ্কিম এরকম সরলীকরণে যদি সাহিত্যের বুদ্ধিদীপ্তির ইতিহাস মেলাই তাহলে দেখা যাবে কোলকাতার পথে যে হুতোমি সময়ের সাহিত্য, কালীঘাটের চিত্র ও কবির গান, এ রীতির মনোভঙ্গি ও সৃষ্টির মূল্যায়ন হল না। অথচ প্রথার প্রাচীর ভাঙতে এ ধারার শিল্প-সাহিত্যের অবদান দ্বিতীয় মাপের কিছু বলে বিবেচনা করার অবকাশ কোথায়? রেনেসাঁ যদি অবদানকেই স্বীকার না করে তা হলে তাকে জ্ঞানদীপ্তির মতো এত মোহনসুন্দর নামে ডাকাও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

যারা কালপৃষ্ঠধারী, কালের সারথি, সময়ের রাস টেনে ধরে চলে সেই নিরিখে নবজাগরণের কীর্তির অধিকার যাবে আউলে-বাউলে, কবিয়ালে, হুতোমি ও আলাল রচয়িতায় আর কালীঘাটসহ আরও অনেক পটচিত্রীর ঘরে। সমকালের সমলোচনা করেছে এসব চিত্রল আয়োজন। লোককলার শর্ত অনুযায়ী তা শুধু পৌনপুনিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। অবনীন্দ্র কীর্তির কথাই ধরি আর পটচিত্রীর সৃষ্টির কেন্দ্র ধরে বিচার করি, সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সংঘটিত হয়।

নিম্নবর্গের মানুষের সৃষ্টি সময়ের মুখোমুখি হয়ে যেভাবে স্বকালকে সমালোচনা করে নতুন রূপ দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীর হাতে অনুরূপ ঘটে না। তাই অবনীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেও স্বকাললগ্ন হন না। তাঁর চেতনা ঘুরে বেড়ায় পারসি প্রাসাদে। মোগল দরবারে বা আরও প্রাচীন হয়ে তা আবর্তিত হয় প্রাকপুরাণিক বৈদিক বলয়ে। অন্যদিকে কালীঘাটের শিল্পী আঁকেন কোলকাতার বারবণিতা, বাবুবিলাস, স্ত্রী-নির্যাতনকারী স্বামী, গোলাপ সুন্দরী। একথা বলা বোধহয় এখন আর তেমন অপরাধ নয় যে, ব্রাহ্মণ আর ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরেরা মিলে যে নবজাগরণ এনেছিলেন তার প্রতিধারা বা সমান্তরাল ধারা হিসেবে নিম্নবর্গের কবি, কবিয়াল, চিত্রীর দান কালের প্রতিনিধির স্বরূপা হিসেবে আরও দামি।

তবু বাংলার চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ মানে বিপ্লব। ছবি রচনার প্রেক্ষিত বিবেচনা, শিল্পীর দৃষ্টিকোণ সব মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ নতুন। রবি বর্মার বিপরীত। চিত্র রচনার নতুন কানুন বড় বেশি প্রয়োজন ছিল তখন। পাশ্চাত্যের নিয়মে প্রাচ্যের আবেগ যুক্ত হয়েও চিত্রকলা এতকাল আলোকচিত্রের স্বধর্ম ধরে রাখতে চেয়েছে। বিষয়ও ভারতীয় পুরাণ। যেসব দেখে মনে হয় কারা যেন অলৌকিকভাবে পৌরাণিককাল ক্যামেরাবন্দি করে ফেলেছে। যেখানে যেমন আলো-ছায়া দরকার ঠিক তেমনি আছে, আছে পরিপ্রেক্ষিত আর সেসব ছবির দিকে তাকালে কোনো কিছু মিথ্যা

মনে হয় না। সব আলোকচিত্রের পালিশে বিধৃত। রবি বর্মা, বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ছবির এ পালিশের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি নালিশ ছিল যেন বাংলার শিল্পীদের। সেই পালিশ না তুলে ফেললে তো মানুষের রক্ত-মাংস দেখা যাবে না। বস্তুত অন্তরও উন্মোচিত হবে না। রবি বর্মাদের ছবির সুচিক্কন ত্বকে চিড় ধরিয়ে বাংলা দেশেই বোধ হয় প্রথম চিত্রশিল্পের ভাষা নতুন মোড় নেয়। ছবির জমিনে জলরঙের স্পর্শে আসে নতুন ব্যঞ্জনা। রীতির অনুসারী হতে হতে একসময় শিল্প আর সময় বা ব্যক্তির মনের খবর জানায় না। তখন তার গায়ে তকমা এঁটে বলা হয় রীতিদুষ্ট। রীতিদুষ্ট ছবি অবনীন্দ্র'র মনের খবর প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই বদলে গেল ছবি। কিন্তু অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক প্রয়াস হয়েছে অফসল। বাংলার আধুনিক ছবির পুরোধাপুরুষ অবনীন্দ্রনাথও তো দীর্ঘদিন মোগল দরবারে ফরমাশ খেটেছেন। তাঁর অনেক ছবি দেখলেই মনে হয় মোগল মিনিয়েচারের যেন পানসে সংস্করণ। আর বিষয়ও বড় প্রেরণার কারণ হয় না। সমকাল প্রায় নেই। আছে হিন্দু-বৌদ্ধ পুরাণ, মোগল দরবার, পারসিক জগতের ওমর খৈয়াম ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর কাগজের জমিনে যখন রাখালিয়া ভুবন ভেসে ওঠে জলরঙের কৌশলি প্রয়োগে ইন্দ্রিয়ঘন হয়ে তখন সত্যিই খুলে যায় মুক্তির অপার প্রান্তর। পুরো ছবির জমিন বর্ণকণায় চনমনে, মাঝে মাঝে পলকা ওয়াশে স্ফূর্তিময় প্রদেশ দেখার আনন্দ ইত্যাদি খুব বড় উপহার অবনীন্দ্র'র। ভারবাহী উট, কিংবা ড্রইংগুলো আর বেলাশেষে কাটুম কুটুমে রহস্যময় কাঠামোর যে বাগান সেখানে সৃষ্টি আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ডাক দেয়। ১৮৯৭-এ ই. বি. হাভেলের সঙ্গে তাঁর দেখা না হলে কী-ই বা এমন ক্ষতি হত। চতুর্ভুজা ভারতমাতা এঁকে দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিক অনুভূতির তাপে পৌরাণিক ঐশীবলয় অনেকখানি পুড়ে গেছে এ ধারার ছবিতে। আর সবচেয়ে বড় কথা সেই ফটোজেনিক পালিশের প্রেক্ষাপট ছেড়ে চিত্র চলে এসেছে রেখার জগতে আর জলরঙের টলটলে ভুবনে। যে রেখাধর্মিতা ভারতীয় ছবির প্রাণ তা ঘুরপথে হলেও আবার ফিরে এসেছে ততদিনে। এ রেখার ছান্দসিক প্রয়োগ আছে যেমন অবনীন্দ্রনাথের জেবুন্নিসায়, তেমনি আছে ক্ষিতিন্দ্রনাথের চৈতন্য চিত্রে। অজন্তা ছবি দেখে আর প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রের পাঠে গভীর মনোনিবেশের কারণে ক্রমেই লাবণ্য যোজন, বর্ণিকাভঙ্গ, সাদৃশ্যায়ন, প্রমাণ ইত্যাদির শর্তে বন্দি হয়ে যায় শিল্প। বেঙ্গল স্কুল বা নব্য বঙ্গীয় রীতির মিছিলে যারা যোগ দিয়েছিল তারা পরিণামে একই মন্ত্র জপেছে। ছবিকে করেছে রীতিনিষ্ঠ, এমনকি কারও কাজ অনুকরণপ্রধান হয়ে রীতিদুষ্টও হয়ে পড়েছিল। আর স্বাদেশিক চেতনার ক্রমপরিণতিতে ১৯০৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট; স্বদেশি ভাবনার নৈষ্ঠিক গুরু কুমারস্বামী ১৯০৮-এ বক্তৃতা দেন ভারতীয় শিল্পের ভারতীয়ত্বের গ্রন্থিমোচনের জন্য এবং তিনি ১৯১৯-এ প্রকাশ করেন গ্রন্থ 'আর্ট এন্ড স্বদেশী'। ১৯১০ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সময়ে নন্দলাল, অসিত হালদার প্রমুখ ল্যাডি হ্যারিংহ্যামের নেতৃত্বে অজন্তা গুহার ছবির অনুকৃতি তুলে আনেন। তবে এসব জাতীয়তাবাদী ধারণা শিল্পীমনে দানা বাঁধার পেছনে খুব দাহ্য ইন্ধন যুগিয়েছেন জাপানি নন্দনতাত্ত্বিক ওকাকুরা, শিল্পী তাইকান ও হিশিদা। ১৯০২-এ শুনিয়েছিলেন ওকাকুরা এ বাণী যে, 'এশিয়া ইজ ওয়ান'। এ শ্লোগান দিয়ে প্রাচ্যের আত্মা অনুভবের নামে শিল্পকে প্রার্থনালয়ের চার দেয়ালে সীমায়িত করা হয়েছিল। এ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে বাঙালির চিত্রঐতিহ্যের নামে, ধর্মের নামে, পুরাণের নামে একই বলয়ে ঘুরপাক খেয়েছে যেন।

প্রথম বাঙালি ক্যারিকাচার বা কার্টুনশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রেখার যে গুণ তিনি ধরেছেন তা পাহাড়ি মিনিয়েচার বা অজন্তার নয়। নয় তা কোনো লোককলার। একটা গ্রাফিক্স চেতনায় অন্তর ধুয়েমুছে স্নিগ্ধ হয়েছিল তাঁর। তাই সামান্য রেখাভাসে তিনি স্পেসের বুকে ইমেজের ইঙ্গিত এনেছেন। তির্যক রেখার কাটাকুটি করে ব্যঙ্গবিদ্রূপে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন সময়ের অপশক্তিকে। আর সেখানেই মানুষের স্বভাবের হাস্যকর আচরণ দেখেছেন, কার্টুন এঁকে রং-তামাশা করেছেন। ঠাকুরবাড়িতে সবাই কিছু না কিছু করত। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা এ বাড়িতে আর বিরল কোনো ঘটনা ছিল না। আর সবার কর্মকাণ্ড বাঁকা চোখে চেয়ে দেখতেন গগনেন্দ্রনাথ। দেখি-ই না কী হয়, এ বিস্ময়ের কারণে নানারকম আতস কাচের মধ্য দিয়ে বস্তুকে দেখেছেন। প্রিজমের মধ্যে চোখ রেখে প্রত্যক্ষ করেছেন কী করে নানা কৌণিক রেখায় ভেঙে যায় ইমেজ। নিজের জন্য একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ খুঁজে পাওয়াই এক শিল্পীজীবনে যথেষ্ট। এ দৃষ্টিকোণ খুঁজে পেতে মানুষের দিকে, বস্তুর দিকে তো চোরাগোপ্তা চাহনি ছুড়ে দিতে হয়েছে। তাছাড়া গভীরতর স্তর অবলোকনের জন্য এমনকি চোখ রেখেছেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও। ক্যামেরায় চোখ গলিয়ে বুঝেছেন পৃথিবী মানে সাদা আর কালো। আলো ও অন্ধকার। এ সবই গগনেন্দ্র'র অন্তর গ্রাফিক্স-সচেতন করে তুলেছে। তাঁকে যদি বাংলার তুলুজ লোত্রেক বলা হয় তাহলে একেবারে খারাপ শোনায় না। কিন্তু শুধুই কটাক্ষ আর শ্লেষেই সব শেষ নয়। মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা বলেও তো কথা আছে। ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ কার্টুন আঁকলেন ইংরেজকে বিদ্রূপ করে। তুমুল আলোড়ন হল। থোঁতা মুখ ভোঁতা হল লাটসাহেবের। কারণ লাটসাহেব যে প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তাতে তা উপস্থাপিত হয়েছিল। গগনেন্দ্র যে ক্যামেরার স্বাধর্মে ছবির ভাষা বুঝতে চেয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষ করা যায় কালো ঘোড়ায়। আর প্রিজমের মধ্যে বর্ণবিভঙ্গের ইমেজ যা পরবর্তী সময়ে কিউবিজমে পরিণতি লাভ করে সেই ছবি বুঝতে হলে 'পরীর দেশ' দেখতে হবে। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান কিউবিস্ট। আনুভূমিক আর লম্বরেখার কূটনীতি নয় শুধু। গগনের কিউবিজমে তির্যক রেখা আর কৌণিকভাবে উৎসারিত উজ্জ্বল আলো এসে পটভূমিতে আরও কারচুপির আবহ সৃষ্টি করেছে। একজন ভারতীয় কিউবিস্ট ইউরোপীয় কিউবিস্টদের মতো নয়, একথা নৃতাত্ত্বিক স্টেলা ক্রামরিশই প্রথম বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। গগনেন্দ্র'র আবির্ভাব বিলেতি ধারাস্রাত হয়ে নয়। আবার মিনিয়েচার বা অজন্তা শৈলীর অনুসারী হয়েও নয়। বরং তা ইউরোপীয় অগ্রগামী শিল্পধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। গগন যখন কোলকাতার রাস্তার উৎসবি মেজাজ এঁকেছেন তখন তা একান্তভাবে ইম্প্রেশনিজমের অনুসারী। তুলিকে স্বাধীন করে রঙ ঝলকে দিয়ে বিষয় বিবৃত করেছেন তিনি।

কোনো কোনো প্রতিভা এমন বিরল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যে তা আর কোনো উত্তর ধারা সৃষ্টি করতে পারে না। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। কিন্তু যে প্রতিভা ভারতশিল্পের আধুনিক পরম্পরা সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন তাঁর নাম নন্দনাল। পাহাড়ি মিনিয়েচার, অজন্তা আর সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল তাঁর নিসর্গ থেকে, এসব মিলিয়ে একটা সহজ হিসেবে নন্দলাল বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতশিল্পের অন্তরে কীভাবে ঘনীভূত হয় রস আর সবকিছুই মনোহর ছন্দে বাঁধা। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের দু'টি প্রধান বিষয় 'রস' ও 'ছন্দ' এত মর্মস্পর্শীভাবে আর কোনো শিল্পী বোঝাতে পারেননি। এমনকি যে-অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ধরে পথ চলার প্রেরণা দিয়েছেন তাঁর ছবিও কিন্তু তাঁর কথায় অনুগামী নয়। কালো-সাদার পরিমিত বিনিময়ের উড্-কাট থেকে শুরু করে গান্ধীর হরিপুরা কংগ্রেস চিত্রমালা। ১৯৩৮ পর্যন্ত নন্দলালের জমিনে

দেখা যায় নানা ছন্দ ও রসের রূপ। কিন্তু হরিপুরা চিত্রে রঙিন রেখা আর টেক্সচার ডিজাইনিক কাজে যে সৃষ্টিশীলতা চাপিয়ে দিয়েছে তা আর কোনো শিল্পীর কাগজে বা ক্যানভাসে উদিত হয়নি।

নন্দলাল-অনুসারী শিল্পীর সংখ্যা বেশি হলেও তিরিশের দশকের শুরুতে শুধু ছন্দসুখ আর রসানুভবে তৃপ্ত হতে পারেননি বাংলার শিল্পীরা। কেউ কেউ হয়তো গুরুত্ব চেয়ে আরও বেশি রসঘন হয়েছেন এবং হতে চেয়েছেন আরও বেশি ছান্দসিক। মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেউজ, গোপাল ঘোষ, শৈলজ মুখার্জী প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্ক কখনো দূরের, কখনো আবার খুব কাছের। বিনোদবিহারী আর রামকিঙ্কর ছন্দের বন্ধন ভেঙে নতুন সংগঠনে ছবিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের কাজে অবিমিশ্র রেখা আর ফর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষত রামকিঙ্কর ছবিতে রেখার জ্যামিতিক উপস্থাপনা আর রঙের স্বাধীন উদ্‌গীরণে যে পরিবর্তনশীল গড়নের জন্ম দিয়েছেন তাতে বাঙলার চারুশিল্প নতুন দিগন্ত ছুঁয়েছে। সেই দিগন্ত বিমূর্ত চিত্রকলার।

নতুন পথ কাটলেন শৈলজ মুখার্জী ও গোপাল ঘোষও। তাঁরা আর শান্ত প্রকৃতি আঁকতে চাইলেন না। তাঁদের রাখালিয়া ল্যান্ডস্কেপে রঙের আগুন লাগল আর রেখার আক্রমণ এল এলোপাতাড়ি। ল্যান্ডস্কেপে বা মানুষি শরীরে রঙ–রেখার এ মাতলামি যদিও রামকিঙ্করে শুরু তবু তার ভিন্ন চেহারা দেখা গেল বিশেষত শৈলজ মুখার্জীর পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপে। নব্য বঙ্গীয় রীতির মধ্যে রঙ যেভাবে মেদুর মধুর পর্দা টেনে দিয়েছিল তা থেকে ছবিকে যেন মুক্ত করলেন রামকিঙ্কর, শৈলজ প্রমুখ।

এখন পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় বাঙালির চিত্রচর্চার খোল-নলচে পাল্টে দেয়ার গুরু দায়িত্বটা যেন পালন করেছেন তিরিশের দশকের শিল্পীরাই। এ সময়ই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার শিল্পপ্রবাহ আনলেন রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমি একাডেমির আদর্শ যে কোনো বাতিল মুদ্রা নয় পাঞ্জাবের মানুষের দুঃখ এঁকে তা বুঝালেন অমৃতা শেরগিল। মোগল-পাহাড়ি মিনিয়েচার নয়, এমনকি অজন্তাও নয়, আমাদের চিত্রের আত্মা চাপা পড়ে আছে লোককলায়। বাঁকুড়ার মন্দিরের দেয়াল-ছবি আর কালীঘাট-পট এ সময়ই যামিনী রায়ের মন বলে ওঠে, চিনেছি আপনারে। যামিনী রায়ের এ রূপান্তরের আগের ছবি ছিল প্রধানত উত্তর ইম্প্রেশনিস্ট ধারার, বহু ভ্যানগঘ কপি করেছেন তিনি। লোককলার নদীতে আচমন করার পর শিল্পী শুধু ভাষায় নয়, বিষয়েও রূপান্তর আনলেন। প্রতীকী পরিমার্জনায় আঁকলেন মানুষের মুখ, বিশেষত নারীর কল্যাণী রূপ। চিত্রিত করলেন অবশ্য কালীঘাটের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও। কিন্তু যামিনী রায়ের কাজে তা সময়ের সমালোচনা নয়। কৌতুকি পরিবেশনা। তাঁর আগে কেউ লোককলার দিকে চেয়ে এতটা অবিচল বিশ্বাসে শেকড় অনুসন্ধানের ডাক দেননি।

আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ছবি অজ্ঞাতকুলশীল। কবিতায় তিনি অনেক রহস্যময় প্রদেশ অতিক্রম করেছেন। সেই পথ পাড়ি দিতে দিতে অনেক ছন্দ বেঁধেছেন। যতই রহস্যময় হোক না কেন সেই দেশ, তা জানা আছে কবির। তা উপনিষদীয়। শান্ত, সুন্দর, কল্যাণ। কল্যাণ জয়ী হবেই পরিণামে; আপাতত বর্তমান যতই দুঃসহ হোক না কেন। কিন্তু কবির ছবি সেই কল্যাণের চিত্রায়ণ নয়। এমনকি তাঁর ছান্দসিক কাজও কবিতার সহোদরা নয়। তার মধ্যে আছে অন্য মন্ত্রগুপ্তি। শিশুতীর্থ, কবিতার যিশুর অনুভব আর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি ভিন্নার্থক। যদিও দুই-ই উৎসারিত একই মন থেকে। কবিতা পড়ে পড়ে তাঁর ছবির গ্রন্থিমোচন করা একটা ভুল পথ। তাঁর কবিতা ও ছবি পরস্পর সম্পূরক বা পরিপূরক হতে পারত। জগতে এমন অনেকেই হয়েছে।

ব্লেকের কবিতা ও ছবি অথবা গেটের কাব্য ও ছবির মধ্যে বিরোধ নেই তেমন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তা প্রবল। বলা যায় আকাশ-মাটি ফারাক। ছবিতে রবীন্দ্রনাথ অবচেতন-পাতালের কয়েক সিঁড়ি নেমে গিয়েছেন। অবচেতন থেকে উৎসারিত ইমেজগুলো হয়ে গেছে তাই কিম্ভূতকিমাকার। সেসব ইমেজে কোনো বোধ সঞ্চিত হয়ে তা কি প্রতীক হয়? প্রায়শ হয় না। কোনো কোনো বিমূর্ত অভিব্যক্তি আসে। আবার সেই বিমূর্ত রেখাভাস স্পষ্ট হলে যে অভিব্যক্তি প্রকটিত হয় তার গ্রন্থিমোচনের জন্য যেতে হয় পরাবাস্তব শিল্পের কাছে। তার শুধু রেখাধর্মী কাজও অন্তরের অচেনা অঞ্চল অবারিত করে দেয়। সেই কাজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়; লিরিকাল, বিমূর্ত ও পরাবাস্তব। গগনেন্দ্র'র ধারা এদেশে নতুন হলেও ইউরোপের অনেক ইজমের পাশাপাশি রেখে তার সূত্র সন্ধান করা যায়। কিন্তু মগ্নতা যদি এমন একটা স্তরে নিয়ে যায় যে সত্তা একটা উন্মাদ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তখনকার সৃষ্টি কেমন হবে তা বুঝতে হলে রবীন্দ্র চিত্রকলা দেখা যেতে পারে। ঘোরলাগা উন্মাদ মানসিক অবস্থাটাই যেন এঁকে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। একটা সিজোফ্রেনিক স্টেট। একটা প্যারোনোয়া আক্রান্ত মনের চিন্তার মতো কিলবিলিয়ে উঠেছে রেখা তাঁর ছবির জমিনে।

বাঙালির চিত্রচর্চার প্রথম চারদশক যদি ছক কেটে বুঝতে চাই তাহলে হিসাবটা এরকম হতে পারে; রবিবর্মা ও ধুরন্ধরদের তৈলচিক্কনত্বকের পাশ্চাত্য কানুন শাসিত ছবির ক্রমমুক্তি এসেছে যামিনী প্রকাশে, অতুল বোস হয়ে চূড়ান্তভাবে অমৃত শেরগিলে।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হালকা পলকা রঙের ভাব-লাবণ্যের যে ছবির গায়ে তকমা লাগল বেঙ্গল আর্টের তা ছন্দ ও রসে নতুন মুক্তি আনল নন্দলালে আর নন্দলালের ছন্দ ভেঙে আরও এগিয়ে গেলেন রামকিঙ্কর, বিনোদ বিহারী, শৈলজ। এঁরা নন্দলালের মতো রেখা, রঙ ফর্ম ও বিন্দুর বুনটকে অখণ্ড কোনো ছন্দ বা আবহ তৈরির একক হিসেবে গ্রহণ করলেন না। এঁদের হাতে চিত্রের এইসব মৌলিক অনুষঙ্গ অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা পেল। এবং সেইসব উপাদান মনোবিকার প্রকাশের অবলম্বন হয়ে প্রথাবিপরীত বিন্যাস তৈরি করল। এ ধারার চর্চা অবশ্য তখন থেকে শুরু হয়ে আজও অব্যাহত। গগনেন্দ্রকে ইম্প্রেশনিজম ও কিউবিজমের আলোকে বিবেচনা করে বুঝতে হবে শুধু ফর্মের বিন্যাসে ও স্পষ্ট জ্যামিতিতে কী করে তিনি ছবি আঁকলেন। রেখা বাঁকিয়ে অথবা বর্ণপর্দার তারতম্য নয়, স্ট্রাকচার ও ফর্মকে ছবি রচনার একক করে তিনি বাঙালির চর্চিত চিত্রশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। যামিনী রায় অকম্পিত বিশ্বাসে লোককলার শিল্পীদের মতো মোটা রেখা আর প্রাথমিক রঙের বড় বড় এলাকা এঁকে বুঝিয়ে দিলেন চিত্রের এ ভাষা একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও আধুনিক। আর রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল পরাবাস্তব কুঠুরির চাবি। তিনি তা খুলে দিলেন ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙালি কেন জানি সেই অবচেতনার ভয়াল, রহস্যময় অচেনা পটভূমে এসে নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইলেন না। পুরো তিরিশের দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে তুমুল বিস্ময়। বাইরে শুধু সাহিত্যকৃতির জন্য নয়, ছবির জন্যও। কিন্তু স্বদেশ তখনো বুঝে উঠতে পারেনি তাঁর চিত্রের সারাৎসার। দেশীয় সমালোচকরা অবশ্য নির্ণয় করতে পারেনি অমৃতা শেরগিলের স্বাতন্ত্র্যও।

তিন.

চল্লিশের তাতানো চৈতন্যের চিত্র

প্রাক-পুরাণিক জগতেই আবর্তিত হচ্ছিল বাঙালি শিল্পীদের চারু-চৈতন্য। ব্যতিক্রমী ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাতে তখন স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি শিক্ষানবীশ শিল্পীদের। তখনো বাংলার চিত্রপটে

তেমনভাবে আভাসিত হয়নি বাংলার চাষাভূষা, মাঝি-মালা, জেলে কামার কুমারের জীবন। কিন্তু তিরিশের দশকে তা কি খুব স্বাভাবিক? কাজী নজরুল দ্রোহের আগুন উগড়ে দিয়ে ততদিনে তো নিম্নবর্গের জয়গান গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। নজরুলের ডাক শুনে প্রতিবাদের ব্যানার হাতে আরও কেউ কেউ এসেছিলেন। কিন্তু বাস্তববাদ দিবালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে প্রতিভাত হল না কেন বাঙলার চিত্রপটে? আসলে দীর্ঘদিন ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণের জন্য হয়তো এমন একটা ঠুলি পড়ে গিয়েছিল যে চিত্র মানেই দূরস্থিত কোনো জগৎ। তাই যখন কৃষিজীবী মানুষ এল চিত্রের জমিনে তখন সেগুলোও মনে হত পৌরাণিক। এ পৌরাণিক পর্দা খসিয়ে দিতে আরও অনেক সাধনার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাংলার ছবির পৌরাণিক ধ্যানমণ্ডলে ফাটল ধরিয়েছিলেন, মূলত রামকিঙ্কর, শৈলজ মুখার্জী। যদিও তাঁরা রোমান্টিকবোধ গুঁজে দিয়েছিলেন, তবু কল্পনার ডানা ছিল তাঁদের ছবিতে হ্রস্ব। মাটির পৃথিবীর দিকে তাঁদের টানটা ছিল নিখাদ। কিন্তু স্মৃতিতে পুরাণ না থাকলে মাটির পৃথিবীর সঙ্গে দ্রুত মিতালি হয়ে যায়। যে সত্তার মননে-মগজে, অভ্যাসে-আচারে পৌরাণিক অধরালোকের অভিজ্ঞতা নেই তার পক্ষে চোখের কাছের প্রসারিত বস্তুপুঞ্জ, মানুষ, প্রাণিকুল, জীবন যাপনই পরম সত্য। ব্রহ্মপুত্রের তীরলগ্ন চাষাভূষা, কামার কুমার আর জেলেজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ তরুণ জয়নুল তিরিশের দশকের শুরুর দিকে কলকাতা শহরে যান শিক্ষার্থী হয়ে। সঙ্গে কোনো মাদুলি নেই, আছে শুধু নদীমাতৃক বাংলার সরস রেখার স্কেচ। এইসব স্কেচের সর্বস্বতা ব্রহ্মপুত্রের পাড়, ময়মনসিংহের মানুষের ও প্রকৃতির অন্তর্লীন রস। একেবারে গ্রামীণ। পূর্ববঙ্গীয়।

দুর্ভিক্ষের স্কেচ আঁকার আগ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের পাড় আর দুমকা অঞ্চলে প্রাগৌতিহাসিক প্রায় ধর্মনিরপেক্ষ সহজিয়া মানুষের জীবনসূত্র গুঁজে দিয়েছেন ছবিতে। অথবা চিত্রিত করেছেন গ্রীষ্মম-লীয় প্রকৃতির আলোছায়ার লুকোচুরি এবং এখানে তিনি দেখেছেন মরমী দর্পণ আর এক ধরনের ধু-ধু হাহাকারের মাঠ-নদী প্রান্তর। এবং তা তাঁকে করেছে রোমান্টিক। নদীমেখলা স্নিগ্ধ স্বদেশের রোদ-মেঘ জল-হাওয়া আলো-ছায়ার বিচিত্র আবহ মুগ্ধাবেশে জড়িয়েছেন তিনি ছবিতে। জয়নুলের তিরিশের দশকের এসব নদীমাতৃক দেশের ল্যান্ডস্কেপে বাংলার চিত্রের নতুন মুক্তি এসেছে। এতটা উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে প্রকৃতি এর আগে খুব একটা দেখা যায়নি। আর মানুষের প্রতি, হোক তা ব্রহ্মপুত্রের জেলে বা সাঁওতাল নারী-পুরুষ, এতটা আশ্বাস দৃঢ় রেখায় প্রকাশ পায়নি। ইংরেজের গড়া স্কুলকক্ষের নিয়ন্ত্রিত আলোর যে বাস্তবতা এতদিন ছিল তা জয়নুলে এসে পুরোপুরি উধাও হল। কালের একাডেমির আলো ছেড়ে অনাদিকালের প্রকৃতি ও মানবস্রোতের উপর নগ্ন আলোর পরিধিকে বুঝেছিলেন তিনি। জলরংয়ে আঁকা বাংলার প্রকৃতিতে তাঁর টলটলে মনটা সমার্থক হয়েছিল। এভাবে লেগেছিল তাঁর কাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আর্তি। সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার, সরকারি আর্ট স্কুলে চাকরি সবই অর্জিত হয়েছিল। তবু নাগরিক হওয়া হয়নি। মনে হয়েছে হয়তো, ভালোবেসে ষোলআনা নাগরিক যদি না হয়ে বরং হত ধানসিঁড়ি নদী। ব্রহ্মপুত্রের জন্য আমৃত্যু কেঁদে গেছেন, হাহাকার করে উঠেছে তাঁর মন বুড়ি পাইন্যার মা'র জন্য। কোলকাতার নাগরিকের প্রমিত ভাষায় কথা বলেননি কোনোদিন। কোনোদিন নাগরিক সভায় গিয়ে দেখাননি বুদ্ধির বাহাদুরি। সৎ সাহসে উচ্চারণ করেছেন আঞ্চলিক বুলি আর মানুষ ও পশুর দেহের দিকে চেয়ে, নদী ও নারীর দিকে তাকিয়ে যে রেখাগুলো চোখে পড়েছে ভেবেছেন কী করে তা অনূদিত করা যায় চিত্রে। তুলি কত পুরু হলে আর রং কতটুকু মাখালে রেখা আবেগের প্রতিনিধি হবে, তা নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন। মনের মধ্যে নদীপাড়ের মানুষের যে প্রত্নআবেগ, বুনো

ব্যাকরণ তার চিত্রায়ন কোলকাতার স্কুলে শেখা রেখায় বিবৃত করা সম্ভব নয়। নিজের মতো করে ভিশনারি হওয়া, বীক্ষণ লাভ করা এবং তাকে চিত্রিত করার জন্য নতুন ভাষা চাই। ভাষার নতুন উপাদান চাই। রেখাকে আরও পুরু না করলে মনের সেই বুনো তেজ যা নাগরিক সভ্যতায় মার্জিত হয়নি, তা প্রকাশ করা অসম্ভব। এভাবে জয়নুলের রেখা পুরু হল, গতিশীল ও সন্নিকর্ষ ধরে রাখার জন্য তা পাক খেল, চলমান রেখা হঠাৎ ভেঙে গিয়ে বুঝিয়ে দিল তার কী বেগ, যেমন একটি কি দুটি শব্দ করে বোঝানো হয় নৈঃশব্দকে। জয়নুলের এই রেখা নারীর দেহে আছে, হৃষ্ট কৃষকের গায়ে আছে, ক্ষ্যাপা গরুর পিঠে আছে। তুলি তাঁর বিরামহীন ছোটে আর অতর্কিতে থেঁতলে যায় পেশির গ্রন্থিল অঞ্চলে এসে। দেহ যে রেখা আর সেই গ্রন্থিল অঞ্চল, এই দুই উপাদানে রচিত জয়নুল তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাঁর ছবির দিকে তাকালে আমরা মুগ্ধ হই। কারণ স্বদেশ সেখানে একটা দূরস্থিত সময় থেকে এসে হঠাৎ ধাক্কা মারে বুকে। আমরা বুঝি, কী নিবিড় শান্তি ও জীবনের আশ্বাস আমরা হারিয়েছি। আমরা যখন তাঁর ছবির উপাদান অনুপুঙ্খতায় বিচার করি তখন উদ্ভাসিত হয় সেই বিন্যাস যেখানে তুলির মোটা রেখা, আর বড় বর্ণ ছোপ পরস্পরিত হয়ে আছে।

১৯৪৩-এ রোমান্টিক জয়নুলের স্বপ্নের পৃথিবী আগুন লেগে পুড়ে যায়। দগ্ধীভূত পৃথিবীতে চোখে পড়ে গৃহসুখী মানুষের কঙ্কাল। ঐ মন্বন্তরে তাঁর সুন্দরের চোখও কে যেন লৌহশলাকা দিয়ে গলিয়ে দেয়। তাই সেই ললিত লতানো রেখা আর তেমনভাবে ভেসে ওঠে না শিল্পীর ক্যানভাসে। রেখারা বেঁকে যায় মৃত্যুর দিকে। জীবনের পতনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখারা মরে যায় কাগজে ও ক্যানভাসে। আর সেই অস্থিসংস্থান চেপে রাখা যে গ্রন্থিল মোচড়ানো পেশির অঞ্চল তা-ও শিথিল হয়ে আসে। আগে মানুষের পেছনে ছিল গ্রামের ঢেউ, নদীর বাঁক। এখন সেখানে কংক্রিটের রাস্তার ইঙ্গিত, অথবা ভিক্টোরীয় স্থাপত্যের পিলারে হেলে পড়া মানুষ; নারী, পুরুষ, শিশু; পুরো সংসার। উন্মূলিত গার্হস্থ্য বেষ্টন। মৃতপ্রায় মানুষের দেহ ছুঁয়ে একটা থালা, ঘটি বা বাটি। কিংবা বৃদ্ধার হাতের লাঠি পড়ে আছে অদূরে। বৃদ্ধা মৃত। তাই তার শরীরের রেখাও নিস্পন্দ। কঠিন স্থাপতিক রেখা, বৃদ্ধার লাঠি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রান্তরেখা সব নিথর, নিস্পন্দ। যে রেখার স্পন্দময়তায় জীবনের বাঙময়তা প্রকাশজর্জর ছিল একসময়, আজ তা নড়ে না, চলে না। আজ তা হিম, সাদা হাড়ের মতো নির্জীব। মানুষ অস্থির অস্তিত্বে চিহ্নিত বলে জয়নুলের এ ধারার ছবিতে এক প্রাণহীন জ্যামিতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নানা কৌণিক অভিব্যক্তি নিয়ে মানুষি শরীরের এ কী রূপ! এ মানুষই সুফলা বাঙলার কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মাঝি, মাল্লা? কিন্তু জয়নুলের সেই কৃষির মহাকাব্য লুপ্ত হয়ে বাংলার চিত্রপটে সঞ্চিত হল নতুন ফসল। বাদামি কাগজের বিপরীতে রৈখিক বিন্যাসে চিত্রায়িত হল ঔপনিবেশিক শক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আকাল। এ আকালের কলঙ্ক থেকে সেই শক্তি কোনোদিন নিস্তার পাবে না। কারণ তথ্যচিত্রের মতো স্বচ্ছ ভাষায় তাদের অপরাধের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে ঐ স্কেচগুলো। চিত্রের এ স্বচ্ছ ভাষা ঘটনাকে প্রহেলিকা থেকে দূরে রেখেছে। জয়নুলের এ স্কেচগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত করে নানামুখী ক্যামেরা চালানোয় যে চলচ্চিত্র তৈরি হবে তার মন্বন্তর ১৯৪৩, কোলকাতা। মন্বন্তর আক্রান্ত গ্রাম যে কী দুঃসহ চেহারা পেয়েছিল তার দলিল তৈরি করেছেন শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। চিত্তপ্রসাদের কাঠখোদাই-এ কিছুটা রীতি অনুসারী হওয়ার প্রবণতা থাকলেও তা দুর্ভিক্ষের অক্ষয় দলিল। কৃষকের আহাজারি সেদিন আরও অনেক শিল্পীই শুনেছিলেন। জয়নুল বা একজন চিত্তপ্রসাদের মতো সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে আর কেউ ঘটমান দুঃসময়কে প্রাণস্পর্শী

রিপোর্টের মতো রাশি রাশি তথ্যে সন্নিবেশিত করেননি। কিন্তু এই কালের ছোবলে সমূলে নির্বাসিত হয়েছিল পুরাণ পৃথিবী বাংলার ছবির আঙ্গিনা থেকে। বরং সমাজ-বাস্তবতার সারাৎসারে অন্তর ধুয়ে গেল শিল্পীর। সমাজ-বাস্তবতার ঋজুত্ব অর্জনের ইতিবৃত্তটা পুনরাবৃত্তি করা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিরিশের দশকের একদম শেষ প্রান্তে কোলকাতায় গঠিত হয় 'এন্টি ফ্যাসিস্ট রাইটারস এসোসিয়েশন।' ১৯৪২-এ ঐ সঙ্ঘের নাম বদলে রাখা হল 'এন্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এন্ড আর্টিস্টস এসোসিয়েশন।' এভাবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক-শিল্পীর দল গড়ে উঠল। এর আগে বাংলার শিল্পীরা যে দ্রোহ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেননি তা নয়, কিন্তু এবার তা সাংগঠনিক অস্তিত্ব নিয়ে এল। আই.পি.টি. এ. বা ইন্ডিয়ান পিপল্‌স্ থিয়েটার এসোসিয়শন-এর অভ্যুদয় হল ১৯৪৩-এ। এবং এ বৎসরই বাংলার শিল্পাঙ্গনে আবির্ভূত হল উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পীদল ক্যালকাটা গ্রুপ। এই গ্রুপের সদস্যদের সবচেয়ে বড় দাবি, তাঁরা বেঙ্গল স্কুলের ধোঁয়াটে রোমান্টিক ও অতীতচারী বিষয় থেকে বাঙলার চারুশিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। এবং কেউ কেউ সদর্পে বলেই বসলেন, নব্য বঙ্গীয় রীতিকে তাঁরা কাফন পরিয়ে দিয়েছেন। ছবিতে আবাসিত করেছেন প্রতিদিনের রূঢ় বাস্তববাদ। বাস্তববাদের মন্ত্র পড়েই যদি নব্য-বঙ্গীয় রীতির কাফন মাটিচাপা দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এর আদি পুরোহিত হওয়ার দাবি কি জয়নুলের নয়? তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রের আগে পুরনো নিয়মের শ্যাওলা ছবির জমিন থেকে কেউ তেমন তুলতে পারেননি। ভেদ করতে পারেননি নব্য-বঙ্গীয় পর্দা। কিন্তু নতুন সৃষ্টির জন্য সেই আবরণ ছিন্ন করার দরকার ছিল। আগের যুগের আবরণ ছিঁড়ে খুঁড়ে নতুন ছবির জন্ম দিতে হয়। অতীতের মুখোশভেদ, যাকে বলে আনমাসকিং করা, তা জয়নুল শুধু শুরুই করেননি। দুর্ভিক্ষের স্কেচ এঁকে তা পূর্ণভাবে বেগবান করে দিয়ে গেছেন।

১৯৪৩ থেকে '৫৩ পর্যন্ত ক্যালকাটা গ্রুপ ভারতীয় চারুশিল্পকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছে। এমনকি এই গ্রুপের প্রেরণায় বোম্বে ও কাশ্মীরেও শিল্পীদল গঠিত হয়েছে একই ভাবাদর্শে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের নাম উল্লেখ করলেই অনুভব করা যাবে তাদের সুকৃতির সংবাদ। অবশ্য এই গ্রুপের বাইরের শিল্পীদের কাজের মূল্যায়ন ছাড়াও চল্লিশের দশকের চারুকলার দিক পরিবর্তনের পুরো প্রেক্ষাপট বোঝা যাবে না। যেমন বাংলা দেশের শিল্পী চিত্তপ্রসাদ, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, সোমনাথ হোড়সহ এমন আরও অনেকে ঐ গ্রুপের সদস্য ছিলেন না। ক্যালকাটা গ্রুপের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত। সহযোদ্ধাদের মধ্যে আছেন গোপাল ঘোষ, পরিতোষ যেন, নীরদ মজুমদার, সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোবর্ধন আশ, অবনী সেন, রথীন মিত্র, রামকিঙ্কর, সুনীল মাধব সেন, হেমন্ত মিত্র ও কমলা দাশগুপ্ত। ওকাকুরা, কুমারস্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, অবনীন্দ্র, নন্দনাল প্রমুখের দেশি-বিদেশি শিল্পতাত্ত্বিক ও শিল্পীর ভারতীয়ত্ব বা জাতীয়তা ভাবনার দিকে বিদ্রূপ ছুড়ে দিয়ে চল্লিশের দশকে শুরুতে ভারতীয় আধুনিক শিল্প বাস্তববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। অজন্তা-ইলোরা-মিনিয়েচার বিলেতি রীতির অটুট সংগঠন দুমড়ে-মুচড়ে ছবির নতুন ভাষা সৃষ্টি হল। আর ছান্দসিক আর ইতিবাচকতার ইঙ্গিতই বা আসবে কী করে? সময়েই তো কোনো শুভ লক্ষণ নেই। জীবনেও থেমে থেমে ছন্দপতন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ সবমিলিয়ে অস্তিত্ব যেন লাভায় নিক্ষিপ্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পিণ্ডাকৃতি হয়ে গেল। পুরো অবয়ব রূপ পেল কিম্ভুতকিমাকার। নিজের কাছে নিজের অচেনা। এমনি কালবেলা। অস্তিত্বের দাহ বুঝতে হলে ১৯৪৮-এ গঠিত 'বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ'-এর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্বীকার করতে হবে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের সঙ্গে

গভীর যোগাযোগ ছিল ঐ গ্রুপের সদস্যদের। আর একটি মহাদেশের শিল্পীরা যখন পরস্পরের স্বভাব ও কাজ দেখে চলছে তখন জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার সীমানা তুলে শিল্পপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করা সমীচীন নয়। ক্যালকাটা গ্রুপ শুধু বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপকে সঞ্জীবিত করেনি। বোম্বের শিল্পীদের কাজও পুরো চারের দশক ধরে বাঙলার শিল্পীদের ভাবিয়েছে। আর এখন পেছনপট বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায় প্রোগ্রেসিভের শিল্পীদের কাজ ছাড়া আধুনিকতার সব প্রান্ত পূর্ণ হয় না। এই গ্রুপের সদস্যরা হলেন কে, এইচ আরা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, সৈয়দ হায়দার রাজা, হরি আম্বাদাস গাড়ে, মকবুল ফিদা হুসেন এবং সদানন্দ কে বাকরে। ক্যালকাটা গ্রুপ কল্লোল তুলেছিল কাশ্মীর ও মাদ্রাজের শিল্পীদের মনেও।

চার.

চারুকলা চর্চার সূচনাপর্ব ও পঞ্চাশের শিল্পীদের কাজ

আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ শিল্পী জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে এদেশে প্রথম চারুশিল্পের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিল্পীর অন্তরে ছিল সৃজন ও নির্মাণের সংহতি। তাই তিনি ৪৭-এর ভারতবিভক্তির পর এই ভূখণ্ডে একটি চারুকলা চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগে দৃঢ় প্রত্যয়ী হন। অনেক প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হয়ে পুরনো ঢাকার জনসন রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে দুটি কক্ষের নির্ভরতায় ১৯৪৮ সালে এদেশের চারুকলা চর্চার প্রথম প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানের সরকারি নাম গর্ভনমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্ট। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জয়নুল আবেদিন। শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন আনওয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, হাবিবুর রহমান ও কামরুল হাসান। ড্রাফটসম্যান হিসেবে যোগ দেন সৈয়দ আলী আহসান এবং প্রেসম্যান হিসেবে শেখ আনোয়ার।

পূর্ব পাকিস্তানে একটি চারুকলার স্কুল স্থাপিত হোক, এ ব্যাপারে তখনকার সরকারের কোনো সদিচ্ছা ছিল না। তবে সরকারি চাকরি করলেও অনেকের মনে তখন এই তাগিদ অনুভূত হয়েছিল যে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হলে বাঙালির মননচর্চা বিশেষ গতিবেগ পাবে। সেদিন স্কুল প্রতিষ্ঠায় যাঁরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিপিআই কুদরাত-ই খুদা, পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভার সদস্য হাবীবুল্লাহ বাহার, সলিমুল্লাহ ফাহমী, পাবলিক হেলথের ডেপুটি সেক্রেটারি আবুল কাসেম, ড. এনামুল হক ও ড. এ. বি এম হাবিবুল্লাহ। ১৯৫১ সালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ইনস্টিটিউট স্থানান্তরিত হয় সেগুনবাগিচার মিউজিক কলেজে। ১৯৫৬ সালে স্থপতি মাযহারুল ইসলাম নির্মিত বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরাশ্রয়ীপ্রায় জীবনের অবসান ঘটে।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্ট-এ চারুশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রবর্তিত একাডেমিক রীতি। চল্লিশ দশকের শেষ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশকের মধ্য পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষা নিয়ে যে শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে তাঁরাই মূলত প্রথম বিরাট পরিবর্তন এনেছেন আমাদের শিল্পচর্চায়।

১৯৪৮-এর শেষে শুরু হয় প্রতিষ্ঠানের শিল্পশিক্ষা। সূচনাবর্ষে শিক্ষার্থী হয়ে এলেন আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, আব্দুল রহমান ভূইয়া, আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ ইসমাইল, আলফাজউদ্দিন খন্দকার, নূরুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেন, শামসুল আলম, জুলফিকার আলী, প্রভাস সেন, খালেদ চৌধুরী, লোকনাথ ধর, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, বজলে মওলা, বিজন

চৌধুরী। প্রথম বর্ষে অনেক শিক্ষার্থীদের মতো পরবর্তী কয়েক বর্ষের শিক্ষার্থীরাও আমাদের আধুনিক চারুকলায় বিস্ময়কর ফসল ফলিয়েছেন। এই শিল্পীদের প্রতিভা বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেছে পুরো পঞ্চাশ দশক ধরে। এঁদের কেউ কেউ বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাঁরা এ দশকেই বিকশিত হয়েছেন। পঞ্চাশের এই শিল্পীদের মধ্যে আছেন মুর্তজা বশীর, আব্দুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মুস্তফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নভেরা আহমেদ, জুনাবুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম নিজামী, নিতুন, কুণ্ডু, কাজী আব্দুল বাসেত, শাহতাব, কাজী আব্দুল রউফ প্রমুখ।

১৯৫০–এ ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন খাজা শফিক আহমেদ, ১৯৫২-এর মোহাম্মদ কিবরিয়া, ১৯৫৫-তে শফিকুল আমীন। এই তিন ব্যক্তিত্ব শিল্প সৃজনে ও শিল্পের শিক্ষাদানে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ঢাকাভিত্তিক শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও চল্লিশের দশকে কোলকাতার আর্ট স্কুলে শিল্পপাঠ নিয়ে এস এম সুলতান নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ধারা।

পঞ্চাশের দশকেই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন কয়েকজন ছাত্রী। প্রতিষ্ঠানের এই প্রথম পর্বের ছাত্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছেন তাহেরা খানম, হাসিনা বেগম মিনু, যোবেদা ইসলাম, সৈয়দা মইনা আহসান ও রওশন আরা আমীন। ঢাকা শিল্পবিদ্যাপীঠের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের সৃজন চৈতন্য অভিষিক্ত হয়েছিল বাস্তববাদে। কর্মমুখর মানুষের জীবন ও বস্তুপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করে তা রূপায়ণে শিল্পসিদ্ধির প্রেরণা দিয়েছেন জয়নুল আবেদিন। তবে গ্রীষ্মম-লীয় দেশের প্রকৃতির প্রফুল্ল মেজাজ ও ঋতুর বৈচিত্র্য অনুভব করে এদেশের শিল্পীরা তখন জলরঙে নয়নলোভন ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রও রচনা করেছেন।

ভাষা আন্দোলনের শিল্পিত হাতিয়ার হতে গিয়ে তখন নবীন শিল্পীদের বাস্তববাদী কাজে এসেছে প্রকাশের দীপ্রতা। সময়ের সংকটের মুখোমুখি হতে হবে, এই তাগিদ থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এসে দাঁড়ান একই মঞ্চে। গঠিত হয় এদেশের প্রথম শিল্পী সংগঠন 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'। ১৯৫১ সালে কার্জন হলের লিটন হলে অনুষ্ঠিত এই গ্রুপের বিশাল প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে শিল্পী ও শিল্পানুরাগী দশকের মধ্যে রচিত হয় সেতুবন্ধ।

জয়নুলের বাস্তববাদী চিত্র একাডেমি প্রতিষ্ঠিত নিষ্প্রাণ রীতির অনুসারী নয়। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ রেখে তিনি সৃজন করেছেন শিল্প। তবু তাতে আকর্ষণ হারাতে থাকেন পঞ্চাশ দশকের নবীন শিল্পীরা। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তারা অন্বেষণ করেন শিল্পের মুক্তি। ইতোমধ্যে অবশ্য সৃজনের পথ বদল করেছেন জয়নুল। ১৯৫২-তে ইউরোপ ভ্রমণশেষে শিল্পী দেশে এসে বাংলার লোকশিল্প উপস্থাপন করতে শুরু করেন ভিন্ন জ্যামিতিতে। এ পর্বে তাঁর কাজে যুক্ত হয় ফর্মের দৃঢ়তা। বিবর্তিত হন কামরুল হাসানও। পাশ্চাত্যের একাডেমির আদর্শ ও বাঙলার লোকশৈলীর যুগলবন্দিতে তাঁর তুলি কলম থেকে উৎসারিত হয় দেশীয় ঐতিহ্যপ্রধান নতুন চিত্রকলা। সফিউদ্দিনের ক্যানভাসেও উদ্ভাসিত হয় জাল, মাছ, পাতা, পতঙ্গের শুদ্ধ রূপবন্ধ। এ সময় এস.এম.সুলতানের চেতনাতে স্ফুট হয়ে ওঠে কৃষিজীবী সভ্যতার পুনর্জাগরণের স্বপ্ন, তাই তার ক্যানভাসে প্রমাণ আয়তনের চেয়ে বড় পেশিবহুল স্ফীতকায় মানুষেরা আবাসিত হয়। তবু পূর্বসূরিদের শিল্পাদর্শের প্রতি নবীন প্রজন্মের আস্থা শিথিল হয়ে আসে। সমকালের ইউরোপ ও আমেরিকার চিত্রাদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য টেনে আমাদের শিল্পকে হতে হবে আন্তর্জাতিক, এ ভাবনাতে তাড়িত হয় অনেকের মন। চারুকলায় উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার জন্য পঞ্চাশ দশকে এদেশের

কয়েকজন শিল্পী পাড়ি জমান বিদেশে। এঁদের কেউ গেলেন ইউরোপে, কেউ যুক্তরাষ্ট্রে কেউ বা দূরপ্রাচ্যে। তারপর মূলত পাশ্চাত্যের শিল্পশিক্ষার অভিঘাতে আমাদের অবয়বধর্মী চিত্রকলায় অভিব্যক্তির ভিন্নতা আসে।

প্রকৃতির চিরচেনা অনুষঙ্গ, মানুষ ও অন্য প্রাণীর দৈহিক গড়ন রিপ্রেজেনটেশনাল নিয়ম ভেঙে ও নতুন স্টাইলাইজেশনে শিল্পের মুক্তি অন্বেষণ করেন এ দশকের শিল্পীরা। ভাঙনের সূত্র সংগৃহীত হয়েছে লোককলা, মুরাল, মোজাইক শিল্প ইত্যাদি নানা উৎস থেকে। মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আব্দুর রাজ্জাক, শাহতাব, আবদুল বাসেত, নিতুন কুণ্ডু প্রমুখ প্রত্যেকেই প্রথানিষ্ঠ অবয়বধর্মী ছবির আদর্শ উপেক্ষা করে নতুন স্টাইলাইজেশনে ও বিমূর্ত ধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের চিত্র রচনা করেছেন। লোকশিল্পের মোটিফের সামান্য ইঙ্গিত রেখে রশিদ চৌধুরী পুরু রেখে ও বর্ণের উদ্দাম গতির নির্ভরতায় যে আধা-বিমূর্ত শৈলীর ট্রাপেস্ট্রি ও চিত্রকলা রচনা করেছেন তা জয়নুল বা কামরুলের লোকশিল্পের নিরীক্ষার অনুগামী নয়, তা পূর্ণভাবে নতুন সৃষ্টি। আর দেশের প্রথম আধুনিক ভাস্কর নভেরা আহমেদও বাংলার পুতুলের গড়ন ও পাশ্চাত্যের ভাস্কর্য শৈলীর মিশ্রণে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাস্কর্য নির্মাণে পারমিতা দেখিয়েছেন।

ইউরোপে শিক্ষালাভের পর লিরিকাল কিউবিজমের প্রতি বিশেষ আকর্ষণবোধ করেন আমিনুল ইসলাম। তাই তাঁর কাজে ঋজু গড়ন ও গতিময় রেখা পরস্পরিত হয়ে আছে। তাছাড়া এই নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী জটিল মানবঅস্তিত্ব ও দুঃসময়ের বিশ্লেষণের জন্য কোলাজ ও স্টেইন্ড গ্লাস মাধ্যমে নান্দনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চাশ দশকের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিবর্তিত হয়েছেন মুর্তজা বশীর। শিল্পী আমিনুল ইসলামের মতো এ শিল্পীও চিত্রচর্চার শুরু থেকেই রিপ্রেজেনটেশনাল চিত্ররীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ইউরোপে শিল্পশিক্ষা লাভের পর বর্ণিল মোজাইক মোটিফ যোজিত হয়ে ছবিতে সংহত করেছেন ফর্মের প্রাধান্য। তারপর ফিগার ছেড়ে শিল্পী যখন একক মোটিফে অন্তরিত করলেন সৃজনের আবেগ তাতেও গুরুত্ব পেল ফর্মের শুদ্ধতা। এপিটাফ সিরিজ তাঁর বিমূর্ত পর্বের সবচেয়ে সংবেদী সৃষ্টি। কাইয়ুম চৌধুরীর ছবিতে মানুষ নিসর্গবেষ্টিত। কখনো তিনি দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষলতার মোটিফের স্নিগ্ধ পরিমার্জনায় শিল্পের নান্দনিক সিদ্ধি অনুসন্ধান করেন। তাঁর কাজে সুবিন্যস্ত মোটিফগুলো শূন্য স্পেসে দ্বিমাত্রিক ডিজাইনের শর্ত স্পষ্ট করে তোলে। ইম্প্রেশনিজম যে নানা ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে তারই সাক্ষী কাইয়ুমের প্রকৃতিনির্ভর কাজ। নিসর্গ ও মানুষের মুখ ছাপিয়ে চিত্রের জমিনে শুধু রেখা ও গড়নের সংযোজনে অনির্বচনীয় বোধ প্রভাবিত করেছেন বির্মূত ধারার শিল্পীরা। এদেশের বির্মূত চিত্রকলায় প্রত্যক্ষ করা যায় তিনটি অভিব্যক্তি। বস্তুর প্রান্তরেখা ও প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য অপসারিত করে রঙ-রেখার স্বাধীন উৎসারণ, নিসর্গ ও প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতময় প্রয়োগের আধা বিমূর্তন এবং তৃতীয় ধারায় রয়েছে শুদ্ধ জ্যামিতির সংহতি। শেষ ধারার শিল্পীদের অন্বিষ্ট, বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চৌকোনার যোজন-বিয়োজনে দৃষ্টিনন্দন বিরচন।

মুক্ত স্পেসে কয়েকটি গঠন বিজড়িত করে এক ধরনের সংগঠন চিত্রার্পিত করেছেন কাজী আবদুল বাসেত। তাঁর বিমূর্ত পর্বের কাজে বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে মনের স্থির ভাবের। বাসেতের কাজে নিসর্গের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্পষ্ট। অন্যদিকে মোহাম্মদ কিবরিয়ার কাজে দেখা যায় শুধু গড়নের সমীকরণ ও সন্নিকর্ষ। কখনো বা তাঁর কাজে রঙের সতত সচল উৎসারণে অনুভূত হয় বিষাদিত মনের ভার, অন্তর্দাহ। চাপ চাপ বর্ণের অন্ধকার সংস্থাপন থেকে মাঝেমধ্যে বিচ্ছুরিত

উজ্জ্বল রঙের দ্যুতি। এভাবে কিবরিয়া প্রেরণ করছেন অন্তর্লীন অব্যক্ত অনুভূতি। বাস্তববাদের বিরোধ ও পুনর্মূল্যায়ন, লোকশিল্পের পুনর্বিন্যাস, সমকালের ইউরোমার্কিন শিল্পাদর্শে নতুন করে আত্ম অনুসন্ধান; এ সবের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়েছে এদেশের পাঁচের দশকের চিত্রশিল্প।

পাঁচ.

স্বাধীনতা-উত্তর চিত্রকলার স্বরূপসন্ধান

বিরূপ পরিবেশ শিল্পী-চেতনায় সমাজ, সময়, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার বীজ বপন করে। ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস-এর কর্ণধার শিক্ষকেরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে সজ্ঘবদ্ধ হন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-বন্দি থেকে স্বাধীন হৃদয়াবেগে জ্বলে ওঠা যায় না। তাই চল্লিশের দশকের শেষে জন্ম নিল 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'। সাধারণ মানুষের মননে শিল্পবোধের জাগরণ গভীরতর ও স্পষ্ট করা এবং চিত্রশিল্পের প্রতি যে-সমাজ এতকাল সংস্কারের বিষবৃক্ষ বাঁচিয়ে রেখেছে, তার শেকড় উপড়ে ফেলাই ছিল এ গ্রুপের লক্ষ্য। জয়নুল আবেদিনের শিল্পদীক্ষা এবং ভাষা-আন্দোলনের শিল্পিত হাতিয়ার হতে গিয়ে তাই পঞ্চাশ দশকের শুরুতে চিত্রশিল্প বাস্তববাদে অভিষিক্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রীয় কালাকানুন এবং সর্বোপরি অসুস্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে শিল্পীরা ব্যক্ত করেছেন অঙ্গীকারাবদ্ধ দ্রোহ। আর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দেশের শিল্পীরা বরাবরই তাঁরা বাস্তববাদে প্রাণিত থাকতে চেয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে এদেশের চিত্রচর্চায় ছিল রিপ্রেজেন্টেশনাল শৈলীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের শুরুতে এদেশের শিল্পধারায় বাস্তববাদের সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন নিরীক্ষাধর্মী নির্মাণ। এই নিরীক্ষানিষ্ঠ শিল্পীরা ঢাকার শিল্পবিদ্যাপীঠেরই প্রথম প্রজন্মের শিল্পী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই শিল্পীদের অনেকে দেশের বাইরে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বুঝতে পারেন যে স্বদেশের শিল্পবিদ্যালয়ে একটি অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছে এবং এই অচলায়তন থেকে মুক্ত হতে না পারলে নতুন শিল্প নির্মাণ সম্ভব নয়। তাই আর প্রকৃতি ও জীবনের নিটোল নিভাঁজ চিত্রায়ণ নয়, বহুচর্চিত ফর্মকে ভাঙতে হবে এবং ভেঙে আবার গড়তে হবে। এই তাগিদ অনুভূত হওয়ার পর বদলে গেল চেনা পৃথিবী। এ দেশের অবয়ধর্মী ছবিতে এল নতুন ব্যাখ্যা। ক্রমশ অবয়ব মুছে গিয়ে ক্যানভাসে ভেসে উঠল আধাবিমূর্ত ও শুদ্ধ বিমূর্ত গড়ন। আর যাঁরা আজন্মলালিত অবয়বের মায়া ছাড়তে পারেননি তাঁরাও পাশ্চাত্যশৈলী ও বাঙলার লোকশিল্পের শৈলী পরস্পরিত করে ভূমিষ্ঠ করলেন নতুন আঙ্গিক। অবশ্য আধা বিমূর্ত রীতি ও পূর্ণ বিমূর্ত রীতির শিল্পীরাও লোককলার কাছে ধার নিয়েছেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসে। গ্রীষ্মম-লীয় অঞ্চলের সুফলা প্রকৃতিতে এবং সেই প্রকৃতিলগ্ন মানুষের জীবন চর্চায় যে মিস্টিসিজমের বাসা তা থেকে কেউ-ই উৎখাত হতে চাননি। তাই স্বাধীনতা-পূর্বকালে এদেশের প্রায় সব রীতির চিত্রশিল্পই ইতিবাচক দর্শনস্নাত। স্বাধীনতা-যুদ্ধোত্তর কালের চিত্রশিল্পে একইসঙ্গে প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নতুন নির্মাণের প্রেরণা এবং অবশ্যই আশাভঙ্গের বেদনা। আমাদের জীবনে এসেছে উৎকণ্ঠা, হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের দুঃসহ আঘাত। মানুষের সামাজিক বন্ধনে শৈথিল্য এলে ব্যক্তির মানসলোক অনিবার্যভাবে জটিলতর হয়ে উঠে। এই কালকে চিত্রিত করতে গিয়ে শিল্পীদের নিয়োজিত হতে হয়েছে নতুন নিরীক্ষায়। স্বাধীনতার পূর্বে অবাধে চিত্র চর্চা করা এবং চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজন করাটাই ছিল বৈপ্লবিক কাজ। আর এ লক্ষ্যেই তো সজ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন এ দেশের প্রথম শিল্পী সংঘ ঢাকা আর্ট গ্রুপের শিল্পীরা। 'এই গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল নীল আকাশের মতো স্বচ্ছ। শুধু ছবি আঁকব

আর ছবি আঁকব। সরকারি চাকরির বাইরেও যে সমস্ত শিল্পমনা ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নিয়ে সুষ্ঠু আন্দোলন ভিত্তিক কাজ করাই ছিল এর মূল এবং পবিত্র উদ্দেশ্য।’[১]

কিন্তু একাত্তর-পরবর্তীকালের শিল্পীদের যূথচারী হওয়ার পেছনে মতাদর্শগত মিলটাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত না থেকে আমরা আমাদের মতো ছবি আঁকব—এই তাগিদটা অনেক দীপ্ত হয়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তরকালের চিত্রপটে। ফলে বাংলাদেশের অবয়বনির্ভর ও নির্বস্তুক চিত্র, দুটিই আরও বিচিত্রগামী হয়ে উঠেছে। আশা-নিরাশা, ঘটনা-দুর্ঘটনায় মালায় গাঁথা পুরো সত্তর দশক জুড়ে আবির্ভূত হয়েছে অনেকগুলো শিল্পীসঙ্ঘ। এই শিল্পীসঙ্ঘের মধ্যে উলেখযোগ্য, ‘স্কেচগ্রুপ’, ‘সেঁজুতি’, ‘ফাইভ ফিংগারস’, ‘ঢাকা আর্ট গ্রুপ’, ‘আর্ট গ্রুপ’, ‘আর্ট গ্রুপ,’ ‘ঢাকা সার্কেল’ এবং ‘সময়’।

‘স্কেচ গ্রুপ’ ব্যানারের তলে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য কোনো স্টাইলের প্রচার করা নয়, বরং শিল্পকর্মকে সজীব রাখা। অর্থাৎ এঁদের প্রত্যেক নিজের নিজের ধারার ছবি আঁকবেন। তবে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা পরস্পর অনুপ্রাণিত হবেন আশা করেন।[২] এ ধারার শিল্পীদের কাজের মূল প্রেরণা দুটি। প্রথমটি বাংলার লোকশিল্প। দ্বিতীয়টি কিউবিজমের ললিতবিন্যাস।

স্কেচ গ্রুপের সদস্যরা হলেন কাইয়ুম চৌধুরী, আব্দুল বাসেত, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, রফিকুন নবী, হাশেম খান প্রমুখ। এ গ্রুপের শিল্পীরা প্রধানত জীবনের ইতিবাচকতায় শিল্পের বিকাশ চেয়েছেন। নিসর্গলগ্নতা ও প্রফুল্ল জীবনের অনাবিল সুখ ও ফ্যান্টাসি কীভাবে শিল্পিত পরিবেশনা পেতে পারে তা-ই ছিল এ ধারার শিল্পীদের আরাধ্য। কিন্তু মনের কোনো না কোনো খেয়ালকে উড়িয়ে দিতে না পারলে অন্তত শিল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় না, এ সত্য এ অবয়বী ধারার শিল্পীরা মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালের সুখী-সুন্দর নিসর্গের বয়ানে নতুন তাৎপর্য যোগ করেছেন রফিকুন নবী। প্রকৃতির গভীরতর প্রদেশে আলোছায়ার খেলা, পাখি, প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পর আমুদে সম্পর্ক এবং সর্বোপরি স্বপ্নময় মানবচৈতন্যের রূপায়ণে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের ছবি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য; ‘মর্বিডিটিকে আসলে কখনো আমি ছবির বিষয় করতে পারি না। তাছাড়া জলরঙের রোমান্টিক চরিত্রের সঙ্গে ওইসব বিষয়ের একটা স্ববিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও যে ছিল না, তা নয়। স্মৃতির মধ্যে যে নস্টালজিয়া আছে, সেটা আমাকে দারুণ টানে। জলরঙের মতো রোমান্টিক মাধ্যমের জন্য স্মৃতি তো একদম মানানসই একটা বিষয়। স্মৃতির ওপর ভয় করলে ফ্যান্টাসির একটা জগৎও খুলে যায়। স্মৃতির কাছে হাত বাড়ালে রসদ পাওয়া যায় প্রচুর।’[৩] কাইয়ুম চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ নিসর্গবিলাসী সৃষ্টিশীল শিল্পীর পাশাপাশি রফিকুন নবী নিজের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখে চিত্রসাধনা করে আসছেন।

কোনো শিল্পীসঙ্ঘের সদস্য না হয়েও সৃজনীশক্তিতে নিজে একই সমকালের শিল্পাকাশের উজ্জ্বল তারার মতো দেদীপ্যমান, এমন শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। এ সূত্রে মনিরুল ইসলামের নাম সবার আগে উল্লেখের দাবি রাখে। নিসর্গ বিশ্লেষণে ও মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি নতুন শিল্পভাষা সৃষ্টির প্রয়াসী। এই প্রয়াসে সৃষ্টিশীলতার অনেক স্বাক্ষর রেখেছেন শিল্পী। তাঁর শিল্প রোমান্টিকতার সঙ্গে মরমিয়া বোধ যুক্ত করে নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। মনিরুলের কাজে রং-রেখার যে সতত সচল প্লাবন লক্ষ করা যায় তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি চিত্রতল অনুভূতির স্বয়ংক্রিয় চাল প্রভাসিত রাখতে পারঙ্গম। বায়ু, অগ্নি, জল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এইসব মৌলিক উপাদানও উপাত্ত হিসেবে নির্বাচন করেছেন শিল্পী পরিবেশবাদী ভাবনার তাড়নায়।

অবয়বধর্মী ছবির বৈশিষ্ট্য নতুন ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে শহীদ কবীরের কাজে। আশাবাদ ও সমকালের অসঙ্গতিজর্জর পটভূমি দুটোই বিবেচনায় রেখে শিল্প-সৃষ্টিতে একসময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন শিল্পী। একদিকে তিনি লালনের মর্মবাণী শোনাতে চেয়েছিলেন এবং অন্যদিকে দরিদ্রশ্রেণির ক্ষুধার্ত অবয়ব এঁকেছিলেন। বর্তমানে শহীদ কবীর রোমান্টিক আবেগতাড়িত ছবির সঙ্গে মিতালি করেছেন। সামান্য জড়জীবনের ছবিও তাঁর আবেগের বেগে দীপ্র। এ প্রসঙ্গে ফরাসি চিত্রসমালোচক জেরা জিরুগেরার মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ—"কয়েক দশক হয় বিশ্ব চিত্রশিল্পে ফিগারেটিভ ছবির চর্চা বেড়ে গেছে। শহীদ কবিরের ছবি সেই সূত্রে আলোচিত হবে। আবেগ তাঁর ছবিকে নিজস্ব চরিত্র দিয়েছে।"[৪]

স্বাধীনতাযুদ্ধে একটি জাতির শক্তির জোরালো উন্মেষ ঘটে। গেরিলা যোদ্ধা চিত্রায়ন করতে গিয়ে শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের অবয়বধর্মী ছবির মাত্রা সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে প্রসারিত করেছেন। তাঁর ছবিতে ফিগার একটা ধূমকেতুর মতো সাদা মেঘে ভাসমান থাকে। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমিত ইঙ্গিতে এবং সামান্য বর্ণছোপে, বিশেষ করে লাল বর্ণচ্ছটায় শিল্পী যুদ্ধনিষ্ঠ গেরিলার মনোজগতের প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুন ব্যঞ্জিত করেছেন। শাহাবুদ্দিনের ছবিতে এমন একটি শিল্পভাষা সৃষ্টি হয়েছে যাকে অবয়বধর্মী চিত্রকলার নব নিরীক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর চিত্রতলে ফিগার এতটাই শোধিত যে তাকে স্পেসের মধ্যে এক ধরনের স্পেস সৃষ্টিকারী রূপবন্ধও বলা যেতে পারে। ফরাসি দেশে দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য তাঁর ছবি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একসময় তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে সাযুজ্য ছিল বেকন ও ভেলিকোভিচের কাজের। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর স্বভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "বেকন, ভেলিকোভিচ জীবনের নেতিবাচকতাকে প্রকাশ করেছে, কিন্তু ফিগার ভেঙে আমি আশাবাদী চৈতন্যকে প্রকটিত করেছি।[৫]

একাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চিত্রধারা নতুন দিগন্তের দিকে বাঁক নিয়েছিল চট্টগ্রামে অবস্থানকারী শিল্পীদের নতুন নির্মাণে। লোকশিল্পের পুনর্বিন্যাসে প্রকৃতির রং-রূপ নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছিলেন রশিদ চৌধুরী। রশিদ চৌধুরীর অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা হয়েছে। "বাউহাউসের আদর্শ প্রতিফলনে উৎসাহী ছিলেন রশিদ চৌধুরী। কিন্তু ঢাকা আর্ট কলেজকে ঘিরে আমাদের দেশে যে শিল্পান্দোলনটি গড়ে উঠেছিল, দেশ ও সামাজিক বৈরী অবস্থার চাপে এবং অভ্যন্তরীণ শৈল্পিক দ্বন্দ্বে তা স্থবির হয়ে পড়েছিল।[৬]

রশিদ চৌধুরীর দীক্ষা এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির প্ররোচনায় পরাবাস্তববাদী ছবি তৈরির শক্তি অর্জন করেছেন চট্টগ্রামের অনেক শিল্পী। হাসি চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দে, মনসুর-উল-করিম প্রমুখ শিল্পীরা নিসর্গের কুহকী পরিধিতে দাঁড়িয়ে অবচেতনার অচেনা অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত করেছেন। এঁদের মধ্যে রূপবন্ধের স্নিগ্ধ পরিবেশনে মনসুর-উল-করিমের পারমিতা সবচেয়ে বেশি। খড়-বিচালির মতো কিছু প্রাকৃতিক ও মানুষি গড়ন স্পেসে ছড়িয়ে দিয়ে পরিমিত অনুষঙ্গে ছবি গড়ার বিশেষ শৈল্পিক চাতুর্য অর্জন করেছেন শিল্পী। কখনো প্রকৃতির অন্তর্গত আলোছায়ার দোলাটুকু রঙিন রেখাজালে চিত্রিত করে ফেলতে পারেন তিনি। শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজ বড় প্রফুল্ল মেজাজের। ক্যানভাসে শোভা পাচ্ছে যেন বহুবণ ফুল-লতা-পাতার একটি হৃদয়গ্রাহী প্রতীকী বিরচন [Composition]। আমাদের শিল্পবাগানে প্রতীকের এতটা সার্থক অঙ্কুরোদ্‌গম আগে দেখা যায়নি। অবিন্যস্ত প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে যেমন ব্যঞ্জনা পায় বিচিত্র সুরের সাংগীতিক হারমনি তেমনি রেখা ও রঙের বিহারে শিল্পীর ছবিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সাংগীতিক গুণ। রেখা ও গড়নের স্বতঃস্ফূর্তি

কখনো লাতিন আমেরিকার শিল্পী মাত্তার [Matta] কাজ মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃতির অন্তর্লীন রহস্যকে আঁকার অনুধ্যান ছিল কে এম কাইয়ুম, এ কে এম আলমগীর, বনিজুল হক প্রমুখেরও। সমকালের ঘটনা ও তন্ত্র-শিল্পের যোগসাজসে আত্মার শুদ্ধ সত্তা অনুভব করতে চান কালিদাস কর্মকার। তাঁর দৃষ্টিতে রূপবন্ধ আত্মার স্মারক হতে চায়।

একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বা শুদ্ধতা অর্জন করার লক্ষ্যে সংগঠিত হয়েছিলেন 'ঢাকা পেইন্টার্স' গ্রুপের শিল্পীরা। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই সংগঠন ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়ায় মোট পাঁচটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গ্রুপের শেষ প্রদর্শনী ক্যাটালগে শিল্পীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কায়সার হক বলেছেন : "The members sought a balance between theory and practice, read and discussed varied writing of on art, and held group shows."

ঢাকা পেইন্টার্স গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম কাজী রকিব, দীপা হক, উত্তম দে ও তরুণ ঘোষ। কাজী রকিব একসময় বাস্তববাদী আবহের ছবি আঁকতেন কিন্তু বর্তমানে মুক্তি খুঁজছেন বিমূর্তপ্রায় গড়ন বিনির্মাণে। তরুণ ঘোষের কাজে পুনর্বিশ্লেষণ পেয়েছে লোকপুরাণ বেহুলা। অতিমাত্রায় চিত্রল হলেও তাঁর কাজে পুরাণকথার ভাবব্যঞ্জনা এবং বেহুলা মনের করুণ আর্তি প্রভাসিত হয়ে আছে।

এখন আমাদের চেতনা ঘূর্ণিত হচ্ছে এক অবক্ষয়িত মূল্যবোধের কুগ্রহে। হত্যা, নারীধর্ষণ, মিডিয়া আগ্রাসনে অপসংস্কৃতি প্রচার, মৌলবাদের উত্থান, গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা কালো টাকার চালিয়াতি ইত্যাদি নেতির আক্রমণে সমাজ স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অস্থির। জীবন কোনো শান্তিময় গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। ব্যক্তি কেবলই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। নিরাপত্তাহীনতায় কতটা জটিল হতে পারে মানবজীবন তা কিছুটা অনুমান করা যায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চিত্রশিল্পের দিকে তাকালে। ছবির দ্বিমাত্রিক জমিনে কত অনুষঙ্গের ভিড়। যা পাঠ করার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অচেনা রূপবন্ধ, ঘূর্ণিত ক্যালিগ্রাফি, জ্যামিতিক গড়ন, মনোগত রেখা ও রূপ, সবকিছুমিলে মিশে জীবনের অন্তর্লীন এক দুষ্পাঠ্য বিমূঢ় প্রেক্ষিতে ভেসে আসে। অনেক সমালোচক মনে করছেন এগুলো এক ধরনের রং-রেখার খেলা মাত্র। কে কত বিচিত্রভাবে সারফেস ভরাতে পার, তারই প্রতিযোগিতা চলছে। সমকালের নিরীক্ষা নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো স্পষ্ট মন্তব্য সম্ভবপর না-ও হতে পারে। এ ধারার চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আছেন মোহাম্মদ ইউনুস, জি. এস. কবীর প্রমুখ।

বাস্তববাদ নতুন পরীক্ষার অবতীর্ণ হয়েছে। এই পরীক্ষারত চিত্রশৈলী অধুনা আখ্যায়িত হয়েছে বিশ্লেষণী বাস্তববাদ হিসেবে। এই শৈলীর সঙ্গে গভীর ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় জার্মান প্রকাশবাদী রীতির। এ ধারায় উন্মোচিত হয়েছে শ্বাসরুদ্ধকর পরিমণ্ডলে মানব অস্তিত্বের আতঙ্ক। এই আতঙ্ক রূপায়ণে রণজিৎ দাস এঁকেছেন ফ্রেমবন্দি মানুষের মুখ এবং এই মুখ কেবলই উজিয়ে আসতে চায় ফ্রেম থেকে। কখনো একটি লাল চোখের ভয়ংকর চাহনি দেখা যায় তাঁর ছবিতে। এই চোখ শিকারের, না শিকারির তা বোঝা যায় না। দুঃসময়ের ঘূর্ণিতে সবকিছু একাকার হয়ে যায়।

দুঃসময়ের চিকিৎসা করতে হবে, এই প্রতিজ্ঞায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন 'সময়' গ্রুপের শিল্পীরা। এ সঙ্ঘের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢালী আল মামুন, নিসার হোসেন, দিলারা বেগম জলি, ওয়াকিলুর রহমান, শিশির ভট্টাচার্য, সাইদুল হক জুইস প্রমুখ। 'সময়ে'র প্রতিষ্ঠার বছর ১৯৭৯। এ পর্যন্ত সাতটি প্রদর্শনী করেছে গ্রুপের শিল্পীরা। সূচনালগ্নের আদর্শ থেকে এঁদের অনেকে এখন সরে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য সত্তর ও আশির দশকের সামরিক ও ছদ্ম সামরিক দুঃশাসনের ঘোরও

এখন কেটে গেছে। 'সময়'-এর শিল্পীরা তখন রাজনীতিসচেতন থাকতে ভালোবাসতেন। এই গ্রুপের শিল্পীরা কালবেলার বিচিত্র বিকারধ্বনি শুনিয়েছেন মানুষি ও নৈসর্গিক অনুষঙ্গের বিশেষ ধারালো পরিমার্জনায়। সময়ের মর্মবাণী শোনা যায় গ্রুপের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত বুলেটিনে, "ষাট দশকে পশ্চিম থেকে অনুলিপির মতো যে আধুনিক ধারাকে বিনা বিচারে বিশ্লেষণে ফ্যাশনের মতো আমদানি করা হয়েছিল এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রেই যা অবিকৃতভাবে বিশুদ্ধ শিল্পকলার মাপকাঠি হয়ে আছে সেই রক্ষণশীল মানসিকতার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে কালের উদ্দীপনায় আজকের তরুণ-উন্মাদনা বিশ্বনন্দনে নতুন সচেতনতা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য কিনা তারও একটা উত্তর এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে।"[৮] মামুন এখন একনিষ্ঠ হয়েছেন লোক-পুরাণের শক্তি অনুভবে। সমকালের সংবেদনা প্রোথিত করেছেন তিনি বেহুলা-পুরাণে। ক্যারিকেচার শিল্পের বিশেষ প্রজ্ঞা পারমিতা অর্জন করেছেন শিশির ভট্টাচার্য। ওয়াকিলের আর জিঘাংসায় মনোবৃত্তি নেই। জেনবাদী শিল্পীদের মতো সামান্য রেখার আঁচড়ে তিনি সময়ের পরিহাস তুলে ধরতে চান। বিক্ষিপ্তভাবে অনেক রকম নান্দনিক সাফল্য লক্ষ করা যায় অনেকের কাজে। সময়ের দাবদাহ থেকে মুক্তির জন্য ফ্যান্টাসিতে মন মজিয়েছেন রোকেয়া সুলতানা। একসময় এদেশের আধুনিক শিল্পীরা নিসর্গের সুচিক্কন রূপটি তুলে এনেছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত শৈল্পিক চাতুর্যে। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে জামাল আহমেদ এক্রিলিক মাধ্যমে নিসর্গের অনাবিল সুখ চিত্রিত করেছেন একটা নিজস্ব মনোভঙ্গি প্রকটিত করে।

লোকশিল্পের শরণাপন্ন হয়ে শিল্পে আধুনিকতার মাত্রা যোজন এদেশের শিল্পীদের একটি মৌল প্রবণতা। এই প্রবণতার এখন উজ্জ্বল স্বাক্ষর আবদুস শাকুর। আলংকারিক সংক্রমণ অপসারিত করে নিজস্ব নিয়মের পুঁথিচিত্র উদ্ভাবন করতে উদ্যমী হয়েছেন শাকুর।

এদেশের নির্বস্তুক শিল্পীরা পশ্চিমের 'কালার ফিল্ড' শিল্পী-গোষ্ঠীর পরম আত্মীয়। কিন্তু প্রশস্ত বর্ণস্তরে রেখার আকুলিবিকুলি কেটে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ ফেলেন মাহমুদুল হক। একটি মাত্র রূপবন্ধের মধ্যে কিভাবে অন্তরিত করা যায় বিষয়-বৈশিষ্ট্য এই নান্দনিক মাত্রা যোগ করার লক্ষ্যে যাঁদের অভিনিবেশে নতুন ছবি সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মধ্যে মমিনুল রেজা, ফরিদা জামান উল্লেখযোগ্য। ফরিদা জামান একটি বিষয়ের নানামাত্রিক উপস্থাপনে বিষয়ের তাৎপর্য নতুন করে উপলব্ধি করতে চান। মনের তাৎক্ষণিক উপস্থাপনের বিষয়ের তাৎপর্য নতুন করে উপলব্ধি করাতে চান। মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনার চিত্র রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন আবদুস সাত্তার।

বাংলাদেশের চিত্রধারার সাম্প্রতিকতম বিকাশের প্রান্তরের পরিমাপ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ এই সময়ের শিল্পীদের অনেকে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন না এবং তাঁদের নিজস্ব কোনো গ্যালারিও নেই। কিন্তু যাঁরা প্রদর্শনী করেছেন তাঁদের ছবিই হয়ে আছে শিল্পানুরাগীর চোখের কাছে। সমকালের চিত্রশিল্পের নিত্য পরিবর্তনশীল ধারা অনুধাবন করা এবং তার প্রকার, প্রকরণ ও নান্দনিক সিদ্ধির হিসাব মেলানো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না।

বছর কয়েক ধরে চোখে পড়ছে শেখ আফজালের বিস্মিত শিশুদের মুখ, গৌতম চক্রবর্তীর শুচিস্নিগ্ধ প্রকৃতি, ইকবালের প্রকাশবাদী চাড়-লাগা বাউল জীবনের ছবি ইত্যাদি।

এখন লক্ষ করা যাচ্ছে, অবয়বধর্মী বা ফিগারেটিভ চিত্রকলা উত্তরাধিকারের জোরে আবার শিল্পীমানসে ঠাঁই নিয়েছে। অনুভূতির সংক্রামক বিস্তারের কারণে চিত্রতলে জমাট বেঁধেছে বিচিত্র অনুষঙ্গ। এই অবয়বধর্মী ছবির নতুন মাত্রা-অনুসন্ধান তাৎপর্যবহ। নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে হতে হয় আধুনিক, এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন আজ অনেক শিল্পী। পৃথিবীজুড়ে চলছে এখন ঐতিহ্য উদ্ধারের প্রয়াস এবং ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা। এ শেকড় অনুসন্ধানের অভিযাত্রার যাত্রিক হওয়ার সঙ্গত কারণও আছে এদেশের শিল্পীদের।

তথ্যসূত্র

১. কামরুল হাসান, আমার কথা : বাংলাদেশের শিল্পী আন্দোলন। কামরুল হাসান, সম্পাদনা আবুল হাসনাত থিয়েটার।
২. আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, দৈনিক সংবাদ, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৮।
৩. চারুকলা ইনস্টিটিউটের রজতজয়ন্তী স্মরণিকা।

টীকা

১. কামরুল হাসান : পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প আন্দোলন সরকারি কলাভবনের প্রতিষ্ঠা। ভোরের কাগজ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৮।
২. নজরুল ইসলাম: সমকালীন শিল্প ও শিল্পী : 'স্কেচগ্রুপ বসন্তকালীন প্রদর্শনী ১৯৭৫', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
৩. রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাজ্জাদ শরিফ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।
৪. জেরা জিরুগেরা: শিল্পাঙ্গন প্রদর্শনী ১৯৯৭-এর ক্যাটালগের ভূমিকা।
৫. আরত আকতুয়েল ১৯৮৮ জুলাই সংখ্যায় দেয়া শিল্পীর সাক্ষাৎকার।
৬. ফয়েজুল আজিম: রশিদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রামের শিল্পকলা; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২।
৭. Kaiser Haq : Four Dhaka Painter in a group show 1994. ক্যাটালগের ভূমিকা।
৮. SHOMOY Special issue 6th April, 1986.

[লেখক: চিত্রশিল্প সমালোচক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ।]

চিত্রশিল্প: বাংলাদেশের

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

জয়নুল আবেদিন এখন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এবং একই সঙ্গে বিরোধিতা করে চিত্রশিল্পের আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনে উদ্ভাবন আছে, সেইসঙ্গে আছে প্রতিধ্বনি, তবু গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে যুক্ত হয়েছে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক চিত্রের ধারাতে। শিল্পকলার মধ্যে চিত্রের মাধ্যম আন্তর্জাতিক এবং তার আবেদন ভূগোলের সীমা মানে না। মাধ্যমের এই আন্তর্জাতিকতা চিত্রশিল্পে যে-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, সে হচ্ছে তার ইতিহাস, হয়তো বা ইতিহাসের নিয়ম। এই নিয়মের দরুন জয়নুল আবেদিন হয়ে উঠেছেন সহযোগী, প্রতিযোগী এবং মন্ত্রদাতা। এখানে তরুণ যাঁরা ছবি আঁকছেন তাঁরা প্রায় সবাই তাঁর ছাত্র। মাধ্যমের আন্তর্জাতিকতা তাঁর ছাত্রদের আধুনিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যে-আধুনিকতা দেশের সীমা মানে না, কোনো রীতিকে পর্যাপ্ত বলে স্বীকার করে না, বহু ভঙ্গিম রীতির চর্চা বুঝি আধুনিক মনোভঙ্গির নিশানা।

দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানটাতেই। দ্বন্দ্বটি মাধ্যম ও ব্যক্তির, মাধ্যমের সঙ্গে মনের। চিত্রশিল্পের মাধ্যম থেকে যে-আধুনিকতার উৎসারণ সে-উৎসারণকে শেষ অবধিতো মনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশ কি আধুনিক? পশ্চিম ইউরোপের সমস্যাবলিতে আমরা কি বিদীর্ণ? জয়নুল আবেদিনের এই প্রশ্ন কেন্দ্র করে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের আন্দোলনের বিরোধিতা দানা বেঁধেছে। দেশকে জানতে হলে দেশের মূলে যেতে হবে, লোককলার উজ্জীবনেই তা সম্ভব। কিন্তু মাধ্যমের পথে যে-আন্তর্জাতিকতা আমাদের দেশে অথবা মনোলোকে দেখা দিয়েছে সেই বিশাল আবেদনে সাড়া তো দিতেই হবে। চিত্রশিল্পে দেশজরীতিই কি সবকিছু? চিত্রে শেষ অবধি যা টিকে থাকে সে হচ্ছে দেখবার চোখ, বস্তুকে, দৃশ্যকে, এমনকি অদৃশ্যকেও নতুন আলোকে দেখার প্রয়াস। এবং এই প্রয়াস অন্তহীন। জয়নুল আবেদিনের তরুণ বন্ধুদের এই যুক্তি অস্বীকার করার নয়। সেজন্য আমার মনে হয় আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের সমস্যা সংকীর্ণ অর্থে এবস্ট্রাক্ট আর্টের সঙ্গে রিয়ালিস্টিক আর্টের দ্বন্দ্ব নয়। বস্তুকে, নিসর্গকে, মানুষের মুখকে কি দেখব সুন্দর করে, সুমিত করে, লোককলার রীতি মেনে? না বস্তুকে, নিসর্গকে, মানুষের মুখকে দেখব মনোলোকের জটিল আলোকে, নতুন ফর্ম তৈরি করে, যে-ফর্ম নিসর্গে নেই, লোককলায় নেই? এবং এভাবেই হয়তো মানুষের দেখার ও বোঝার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়া যায়। খুব সম্ভব দ্বন্দ্বের রূপটি এই।

দুই

আমাদের দেশে লোককলার স্বরূপ কিভাবে দানা বেঁধেছে? লোককলার চরিত্র রক্ষণশীলতা। একই নক্সা বহুদিন টিকে থাকে, তার রূপান্তর নেই, পরিবর্তন নেই, বুঝি লোকজ মনে বৈচিত্র্যের তৃষ্ণা

নেই। তার কারণও আছে। লোককলা যে-সমাজে দানা বেঁধেছে সেই কৃষিজীবী বাঙালি সমাজের কাঠামো অপরিবর্তিত থেকেছে বহুদিন। সমাজকাঠামোর অপরিবর্তনের দরুন লোককলার চারিত্রে এসেছে রক্ষণশীলতা এবং ঐ কারণেই সমাজের মানসিকতায় অস্থির কোনো অতৃপ্তির দোলা লাগেনি। তাছাড়া শিল্পকলার চর্চা হয়েছে বংশানুক্রমে। তাই কুমার, পাটিকর, কাঠের নকসিকর, সবাই বংশানুক্রমে কাজ করেছে। ব্যক্তির ঐ বংশানুক্রমিক জীবিকা গ্রহণ করা কিংবা ব্যক্তির বংশানুক্রমিক জীবিকার মধ্যে অন্তরিত হওয়া লোক-কলার ঐতিহ্যে একপক্ষে এনেছে গতানুগতিকতা, অন্যপক্ষে এনেছে নিশ্চিত অভ্যাসের স্থির দীপ্তি। যে-কারিগর পুতুল গড়ছেন তাঁর সব পুতুল এক রকমের, তাঁর সব ঘোড়া এক ধরনের। কিন্তু তাঁর গড়া যে-কোনো একটি পুতুল, যে-কোনো একটি ঘোড়া দেখতে আশ্চর্য সুন্দর। বংশের পর বংশ একই কাজ করছেন, তাই কাজে এসেছে অভ্যাসের নিয়ম, কাজ হয়েছে পাকা, এতটুকু গরমিল নেই। কিন্তু কাজ যে একঘেয়ে তা-ও অস্বীকার করার জো কই। অন্যপক্ষে পাহাড়পুরের পোড়ামাটির কাজের সঙ্গে ময়নামতীর পোড়ামাটির কাজের তফাৎ নেই, একই নক্সা, একই শ্রী-ছাঁদ, একই ছন্দ। ঐ সর্বজনীনতার কারণ কিন্তু সমাজকাঠামোর মধ্যে নিহিত। লোককলার শিল্পগত উপাদান সীমাবদ্ধ; যান্ত্রিক উৎকর্ষও সীমাবদ্ধ। উপাদান হচ্ছে মাটি, কাঠ, বেত, বাঁশ, এসব। যন্ত্র হচ্ছে ছেনি, নরুন, চাকা, দা, এসব। যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা বংশানুক্রমে ঐসব উপাদান ও ঐসব যন্ত্র ব্যবহার করছেন। ফলে খুবসম্ভব এক ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। চতুর্দশ শতক হচ্ছে ময়নামতীর পোড়ামাটির কাজের সন-তারিখ। ময়মনসিংহ জেলার নানা মেলায় পোড়ামাটির যে-সব কাজের দেখা মেলে তাদের গঠন শ্রী-ছাঁদ অবিকল ময়নামতীর পোড়ামাটির কাজের মতো। তার কারণ উপাদান ও যান্ত্রিক উৎকর্ষের সীমাবদ্ধতা। ঐ দুই সীমাবদ্ধতা ভিন্ন ভিন্নভাবে কিংবা পারস্পরিক-ভাবে একপক্ষে লোককলার ফলিত দিকটিকে অন্যপক্ষে লোকশিল্পীদের বংশানুক্রমিক অভ্যাসকে নিরূপিত করেছে। অমন নিরূপণের দরুণ লোককলার প্রবণতা জ্যামিতিক নির্বস্তুকতা কিংবা প্রাকৃতিকতার ছন্দিত রীতিবদ্ধতার দিকে। জ্যামিতিক কাজের নমুনা : পাটি, বিভিন্ন সুচিশিল্প, রঙিন কাঁথা, এসব। প্রাকৃতিক ছন্দের নমুনা : কাঠের কাজ, পুতুল, খেলনা, এসব। কখনো-কখনো দু-ধারাই মিলেমিশে গেছে। শীতল পাটির নক্সায় জ্যামিতির বিস্তার অথবা কাঠের কাজে অলঙ্করণ কিংবা বাঁশের ছাঁচের বেড়ায় রেখার বাঁকা ঢেউ চোখ কাড়ে, মন ভোলায়। জ্যামিতিক নির্বস্তুকতা কিংবা ছন্দিত রীতিবদ্ধতার দিকে যাত্রার কিছুটা কারণ কারুকর্মের স্বরূপ ও অলঙ্করণের উপাদানাবলির মধ্যে নিহিত। শীতল পাটির বুনোনের ঝোঁক স্বভাবতই জ্যামিতিক নক্সার দিকে। কুমারদের চাকা স্বভাবতই ঘূর্ণমান রেখার নক্সা গড়ে তোলে। সূচিশিল্পের ঝোঁক প্রাকৃতিক নক্সার দিকে। লোককলা কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্প বলতে যা বোঝায় তা নয়। হাতি, ঘোড়া, পুতুল লোকশিল্পে অবিকল হাতি ঘোড়া পুতুল নয়। পাটিতে কিংবা কাঁথায় যে-সব অলঙ্করণ সে-সব লতাপাতা ফুল পাখির মতো অবিকল নয়।

তিন

বাংলা লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্য এসেছে মন্দিরের টালির চিত্র, প্রতিমা ও ধাতু ঢালাই রীতি থেকে; অন্যপক্ষে এসেছে দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার লোকচিত্র ধারায় সংশোধিত হয়ে অজন্তার দূর ঐতিহ্য থেকে। বাংলাদেশে ঐ দুই রীতির দেখা মেলে। একটি রীতি অজন্তা, দাক্ষিণাত্য ঘুরে, উড়িষ্যা হয়ে বাংলাদেশের পশ্চিমে প্রভাব ছড়িয়েছে। অন্য রীতি এসেছে তিব্বত, নেপাল থেকে নালন্দা,

উত্তরবঙ্গ হয়ে পূর্ব বাংলায়। ঐ রীতি এসেছে ধাতু ঢালাইয়ের কাজের রেখায়, যে-রেখা অনূদিত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি চিত্রাবলির ছবির ভাষায়। ঐ দুই ধারার সমন্বয় থেকে তৈরি হয়েছে বাংলার শিল্পের মেজাজ। তিব্বতি ও নেপালি ধাতু ঢালাইয়ের টেকনিক সার্থকতা পেয়েছে বাংলার মন্দিরের টালি ও পাটার কাজে। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যসুলভ কাজের মিল আছে নেপালি ও তরাই অঞ্চলের ধাতু ঢালাইয়ের কাজের। মন্দিরের গায়ের দেবদেবী অসুরের মূর্তির ভিত্তি তিব্বতি ও নেপালি প্রতিমাতত্ত্ব। ঐ মূর্তিতত্ত্বে শরীরের চেয়ে
অ-শরীরীভাব, প্রশান্তি, অমর্ত্যভাব বেশি।

ঐ দুই ধারার সমন্বয়ের ফলে বাংলা পটে মুখ্য হয় মূল ফর্ম, আকার ও ডিজাইন। ঐ ফর্ম, আকার, ডিজাইনের কাছে অন্য গুণ গৌণ, সংক্ষিপ্ত; রং-এর প্রয়োগে বিপরীত বৈষম্যে প্রতিহত হয়ে ফর্মটি ফুটে ওঠে। ঐ ফর্ম বা ডিজাইনের বিকাশে বিবর্তনে সাহায্য এসেছে মন্দিরের গায়ের টালির কাজ, ধাতু ঢালাইয়ের কাজ, ভাস্কর্য, মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ থেকে ; তেমনি সাহায্য এসেছে উড়িষ্যা, গুজরাটি ও দক্ষিণ ভারতের ক্যালিগ্রাফির রেখা থেকে। ঐ দুই রীতির সমন্বয় থেকে উৎসারিত বাংলা পট : সে-পট তীক্ষ্ণ স্পষ্ট ; সে-পটের গড়নে এসেছে মূর্তিসুলভ গভীরত্ব, ঘনত্ব। আরেক প্রভাব এসেছে নেপালি ধাতু ঢালাইয়ের কাজ ও বাংলার মাটির প্রতিমা থেকে। ঐ প্রভাব পড়েছে কাপড়ের ভাঁজে।

বাংলাদেশের আদিম জাতিদের চিত্র, ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদে প্রতিফলিত স্থানিক ভাব। ঐ স্থানিক ভাবটি ফুটে উঠেছে চার-পাশের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ঢং থেকে। বাংলাদেশে তাই এসেছে রংয়ের স্নিগ্ধ অসচ্ছলতা, সাদা ধূসর অথবা সাদা গেরুয়া আল্পনা, দিগন্তের উধাও বিস্তারের সঙ্গে মানানসই মাটির বাড়ির খড়ের বাঁকানো চাল। যেন শুদ্ধ জ্যামিতিক নক্সা, মৌলিক বর্ণ সমন্বয়; ত্রিকোণমিতির গড়ন উৎসারিত তাদের কাজে। দেশজ রীতির আদি উদাহরণ কালিঘাটের পট ও ভ্রাম্যমাণ পটুয়াদের কাজ। কালিঘাটের চিত্রকররা জাতে পটুয়া, আদি পেশার দিক থেকে সূত্রধর। কাঠের কাজ, মন্দির নির্মাণ, মাটির প্রতিমা গড়া তাঁদের পেশা। কিন্তু প্রতিমা গড়া ঋতুভিত্তিক, সেজন্য প্রতিমা গড়ার সময় হলে তাঁরা আঁকতেন পট, গড়তেন খেলনা মাটির ও কাঠের। কড়া, চিত্রিত রেখার ক্ষমতা তাঁদের রক্তের অন্তর্গত, ফর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব-পুরুষদের উত্তরাধিকার। প্রতিমা গড়ার অভ্যাস থাকার দরুন তাঁদের ছবিতে আসে মডলিং ও ফোরসটনিং, মাটির ওজন ও গুণ।

যাযাবর পটুয়ারা ছিলেন ধর্মে দো-আঁশলা। তাদের জড়ানো পটের এক ঐতিহ্য এসেছে উড়িষ্যার প্রাচীন রীতি থেকে। ঐসব পটে ভল্যুম, ম্যাস, পরিপ্রেক্ষণ থাকত না, ফ্ল্যাট জমিতে দ্বিরায়তনিক অলঙ্কারবহুল চিত্র থাকত। অন্য ঐতিহ্য এসেছে মাটির প্রতিমার ভল্যুম, ম্যাস, মডলিং থেকে। পট ঐ দুই রীতির ঐতিহ্যের ফল; ফিগার ঘিরে আছে শক্ত, কড়া রেখা, ভিতরে তুলির কাজ সমান, অথচ সংগঠনে এসেছে মাটির প্রতিমা বা পুতুলের ছন্দ। মাটির কাজে স্বাভাবিক আকার ভেঙেচুরে ভিন্ন আকার পায়, তেমনি পটে আসে ঐ মডলিং-এর অস্বাভাবিক আকার। প্রতিমা বা পুতুল গড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফর্মটি তুলে ধরা, ডিজাইনটি তুলে ধরা, তেমনি পটেও বিপরীত রং-এর মাধ্যমে ছবির আসল ফর্মটি ফুটিয়ে তোলা হয়। ব্যবহৃত রং কম; গাঢ় সবুজ, তীব্র লাল, জাঁকালো ব্রাউন, জমকালো নীল। জড়ানো পট ও কালিঘাটের পটের তফাৎ রং ব্যবহারে, রেখা ব্যবহারে।

ঐ শিল্পরূপের সম্প্রতি অবনতি ঘটেছে সমাজকাঠামোর পুরনো গ্রাম্য বিন্যাসে বদলের দরুন। কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজে পরিবর্তনের দরুন একপক্ষে বংশানুক্রমিক গোত্রগুলো অসংহত হয়ে পড়েছে, অন্যপক্ষে শিল্পোৎকর্ষের মান অবনত, রেখা শিথিল, বিন্যাস অসতর্ক হয়ে পড়েছে। সমাজকাঠামোর যে-সংহতি ঐ শিল্পরূপ টিকিয়ে রেখেছে এতদিন সেই কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজকাঠামো বদলে যাচ্ছে। তাই জীবিকার সামাজিক সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেলা পালা পার্বণ যাচ্ছে কমে।

চার

বাংলাদেশের চিত্রকলার নতুন আবিষ্কার ঘটেছে ইংরেজ অভিঘাত থেকে। ঐ অভিঘাতের ফলে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে, নতুন চেতনার বিকাশ হয়েছে। ঐ চেতনার উপযোগী প্রকাশভঙ্গি খোঁজার তাগিদে প্রথমে এসেছে খানিকটা দিকভ্রান্ত হাতড়ানি, নানা রীতির মিশ্রণ, বিভ্রান্ত ভাব; ঐ তাগিদ থেকে ঐতিহ্যের আবিষ্কার শুরু হয়েছে। আবিষ্কৃত ঐতিহ্য তিনভাবে প্রতিভাত হয়েছে : সামন্ত ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য, লোকজ ঐতিহ্য।

অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা চিত্রশিল্পের জনক, তিনি বাংলা চিত্রকে নানামুখী জিজ্ঞাসার মধ্যে শোধিত করেছেন। তিনি চিত্রে এনেছেন স্বদেশীয়ানা ইউরোপীয় চিত্র সকলের বিপরীতে, ঐ স্বদেশীয়ানা আত্মসম্মানের জন্য জরুরি ও চেতনার শুদ্ধতার এক অনন্য সরঞ্জাম। ইউরোপে আত্মসমর্পণ নয়, ঐতিহ্যের প্রয়োজন এই বোধ থেকে তিনি ঐতিহ্য আবিষ্কারে বেরিয়েছেন। কিন্তু লোকচিত্র, লৌকিক আচার, রীতিনীতি সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তিনি আবিষ্কার করেছেন ঐতিহ্যের খণ্ডাংশ; অজন্তা কোনারক : ঐ ঐতিহ্য সামন্তবাদী, ঐ ঐতিহ্যের ভাববাদী ব্যাখ্যানে তাঁর প্রতিভা নিরন্তর নিয়োজিত থেকেছে। অন্যপক্ষে লোকজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিবিড় গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা, শেষ বিশ্লেষণে, থেকে গেছে সমান্তরাল। তাঁর বাদশাহি মেজাজ, তাঁর জাপানি ওয়াশ টেকনিক, তাঁর রক্তে গীতরত খেয়ালিপনা যে-বাস্তব তৈরি করেছে, সে-বাস্তব মূলত অ-ধরা, সুদূর, কবিতার সহোদরা; রং নরম, নমিত বিলীয়মান। এভাবে শিল্প আন্দোলনের প্রথম পর্যায় আধুনিক ইউরোপীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছে; অন্য পক্ষে রাখালিয়া বিষয়, কবিতার বিষয়, চিত্রকলার বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছে।

আকাডেমিক রীতি উৎসারিত হয়েছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল থেকে। ঐ রীতি তৈরি করেছে রেনেসাঁ সৃষ্ট নিশ্চল দর্শকের চোখে প্রতিভাত একক স্থির বস্তু দেখার বোধ কিংবা ড্রইংক্লাশ দৃষ্টিভঙ্গি। ঐ বোধ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইউরোপের একটি পর্বের চিত্র বোঝা যায়, কিন্তু নানা রীতির কাজ বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে বাংলাদেশের আধুনিক পর্বের শিল্পীদের শিক্ষা শুরু হয়েছে ইউরোপীয় আঙ্গিকে। ঐ আঙ্গিক ব্যবহার করে তাঁরা শিখেছেন দুই মাত্রার সমান কাগজে তিন মাত্রার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব, ঘনত্ব আনার কৌশল; রেখা ও রং-এর মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বস্তুতে ভল্যুম ও ঘনত্ব আনার রীতি; ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের গুণ চিত্রে আনার ব্যবহারবিধি। কিন্তু পরে, পরিণত জীবনে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন দুই মাত্রার সমান কাগজে আলঙ্কারিক প্রতিমার প্রতিভাস ও বিন্যাসই প্রাচ্য রীতির ঝোঁক। ঐ রীতিতে আসে দুই মাত্রিক ডিজাইন ; ফর্মকে মুখ্যত রেখা গৌণত রংয়ের সাহায্যে তুলে ধরা। ঐ দ্বন্দ্বের, ঐ বৈপরীত্যের ফাঁদে পড়েছেন প্রায় সব শিল্পী, তাঁরা ভুগেছেন প্রস্তুতি-পর্বে দো-টানায়।

লোকজ ঐতিহ্য মূলত ফিগারেটিভ, রেখা ক্যালিগ্রাফির রেখা, প্রথম টানেই শেষ, পুনরাবৃত্তির পরপারে। চিত্র শুদ্ধ ফর্মের ডিজাইন; পুরো বাস্তবধর্মী মডলিং নেই; রং কড়া, উজ্জ্বল। বিষয়টি রং ও রেখার মধ্যে, সর্বাশ্রয়ী ডিজাইনের মধ্যে অন্তরিত। চিত্র আখ্যানধর্মী, চিত্র আখ্যানের একটি মুহূর্ত। চিত্রিত রেখা আঁট-সাঁট, সংহত, ফিগারে উচ্চকিত অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ, চিত্রিত বিষয় বাস্তবের ইঙ্গিত দেয়, কল্পনাকে মুক্তি দেয়। চোখের চেনার সঙ্গে ফিগারের মিলটুকু বুঝিয়ে দেয়, তার বেশি নয়। এভাবে স্পষ্ট হয় বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা, রেখার অনিবার্যতা; চোখের চেনা বাস্তব, অলঙ্কার, চিত্তবিভ্রান্তিকর উপকরণ এখানে অনুপস্থিত। যামিনী রায়ই প্রথম জয় করেছেন লোকজ ঐতিহ্যের স্বরূপ, ব্যবহার করেছেন ঐ ঐতিহ্য নিজের প্রতিভার নিয়মে।

শিল্পকলার আলোচনায় ঐতিহ্যের ঐ সামাজিক ও মানসিক দিক মনে রাখতেই হয়। কোনো ঐতিহ্যই চিরকালের নয়, তার পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে। পরিবর্তমান সমাজে ঐতিহ্যের রূপান্তরণ ঘটে প্রতীকের পথে, কখনো পুনর্নির্মাণের পথে, কখনো বা ভেঙে। সমাজকাঠামোবিহীন ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা যায় না। সেজন্যই ঐতিহ্যের নতুন বিন্যাস একপক্ষে পরিবর্তমান সমাজ অন্যপক্ষে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল মনের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজে এই সত্য ছায়া ফেলেছে। বৈদেশিক চিত্র আন্দোলনের আঙ্গিক ও তার মানসিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন স্বদেশের গভীরে মর্মে মূলে পৌঁছোবার জন্য। স্বদেশের চিত্রাভাস তাঁদের কাজে এসেছে কারুকর্মীদের পথে পটুয়াদের পথে, কখনো বা কুসংস্কার, পুঁথির পথ ধরে। এসবই দেশের মানুষের মনে লিপ্ত হয়ে আছে, মিলেমিশে গেছে। তাঁদের উৎসাহ ক্লান্তিহীন প্রতীক গড়ে তোলার দিকে। রূপকথা, লোককথা, কুসংস্কার, পুঁথি দেশের আত্মার যে-প্রতীক গড়ে তুলেছে তাতে মিলেমিশে গেছে কল্পনার জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও পশু-পাখির জগৎ। যেন কোনো ভেদরেখা নেই, সবই প্রতিবেশী, পরস্পরের সঙ্গী, সহচর। ঐ একান্ততা বোধের উপফসল হচ্ছে সহজতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা।

সমকালীন চিত্রশিল্পজগতে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সেই সবের অভিঘাত পড়েছে শিল্পীদের কাজে। সেই সঙ্গে আছে দেশীয় শিল্পরীতি আবিষ্কার, পুনর্নির্মাণের প্রবল আগ্রহ। একই সঙ্গে দেশজ ও দেশোত্তর এই মনোভাব আবেগে অস্থির, দ্বিধায় আরক্তিম। তাই তাঁরা ফর্ম ভেঙে কাজ করছেন, কখনো ফর্মকে সরল করে, কখনো বা প্রতীকের খোঁজে দুই চোখে আলো জ্বেলে। আবার বুদ্ধির অভিযানে স্পেস, রং ও ফর্মের সমন্বয়ে নতুনতর সূচনা আনার দিকে তাঁদের উৎসাহ ক্লান্তিহীন।

বাংলাদেশের প্রবীণ শিল্পীদের মানসজগৎ গড়ে উঠেছে বিভাগ-পূর্ব যুগের কলকাতা থেকে। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ভাববাদী শিল্পদৃষ্টি এবং লোকজ ঐতিহ্যের একপেশে বোধ জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দীন আহমদকে বলীয়ানভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের মধ্যে লোকজ রীতির বিভেদ তাঁরা বুঝেছেন খণ্ডিতভাবে; অন্যপক্ষে ভাববাদী দৃষ্টি দিয়ে লোকজ রীতির বাস্তব ব্যবহার ধরতে গিয়ে জন্ম দিয়েছেন দৃশ্যমান বাস্তবতা সম্বন্ধে উৎসাহের। এভাবে তাঁরা লোকজরীতির সঙ্গে সমীকরণ করেছেন দৃশ্যমান বাস্তবতার এবং দৃশ্যমান বাস্তবতার উদ্ভাবনকে দেশজ ঐতিহ্য বলে ধরে নিয়েছেন। ঐ দ্বন্দ্বের ছাপ পড়েছে তাঁদের কাজে এবং ঐ বৈপরীত্যের দরুণ তাঁদের আঙ্গিক ব্যবহার থেকে থেকে দ্বিধান্বিত হয়েছে।

পাঁচ

সাম্প্রতিক চিত্র কি বিশৃংখল কল্পনা, উদ্ভট স্থাপনা, আশ্চর্য আবর্জনা? জবাব : না। তার কারণ চিত্র বিচারের রীতি, পদ্ধতি নিয়মের মধ্যে অন্তরিত। ঐ রীতি, পদ্ধতি, নিয়মের সমাচারের অন্য নাম সমালোচনা। নেহাৎ ভালো-লাগা মন্দ-লাগার পরপারে তার কেন্দ্র, সেজন্য সমালোচনার অন্তিম লক্ষ্য সৃষ্টি ও সৃষ্টির জনককে বোঝা। ঐ বোঝার তাগিদ থেকে মৌল সব ধারণার জন্ম হয়। সে-সব হচ্ছে : শিল্পীরা ব্যক্তিক মানুষ। সকল মানুষের মতন তাঁরা সময়ের বাসিন্দা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি, চিরন্তন কোনো পৃথিবীর অধিবাসী নন। শিল্পকাজ প্রতিভূ হিসেবে দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার অধীন নয়, ঐ অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন, নিজেই এক বিশ্ব। শিল্পী শুরুতে অন্য শিল্পকাজ দেখেন, প্রকৃতি নয়। চিত্রসৃষ্টি স্টাইলের প্রকাশ, ঐ প্রকাশ সবসময়ই ব্যক্তিক, ব্যাখ্যানের রীতিনিষ্ঠ ধরন। চিরন্তনের ধারণা ইতিহাসের ধারণায় শুদ্ধ হতে থাকে। চিত্র বিচারে ঐসব বোধ দরকার, ঐসব বোধ প্রয়োগ করে ব্যক্তিমানুষটির কাছে আসা যায়, তাঁর কাজ চোখের মধ্যে তৈরি করার প্রয়াস পাওয়া যায়। ঐ প্রয়াস রুচি ভাঙে, রুচি গড়ে, রুচি জোড়া দেয়। রুচির ভাঙা-গড়া নির্ভরশীল ঐসব বোধের সাবলীলতা কিংবা ঝোঁকের ওপর। ঝোঁক প্রাথমিক, কিছুতেই অন্তিম নয়। সকল মানুষের মতন শিল্পীরা সময়ের বাসিন্দা, সেজন্য ইতিহাসের দুই মুহূর্ত এক নয়, স্মৃতি কেবল সাযুজ্য তৈরি করে। ইতিহাস সেজন্য প্রক্রিয়া, সময়ের স্রোত, তার প্রভাব প্রবল ও বলীয়ান, ঐ অর্থে অতীত স্পষ্ট কিংবা লুপ্ত নয়; ঐ অর্থে মানুষের কাছে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; ঐ অতীত, ঐ সময়, বিশ্ব পৃথিবী তার মধ্যে পরিশোধিত হতে থাকে। ঐ পরিশোধনের প্রাথমিক স্তর রুচি, অন্তিম স্তর নন্দনতত্ত্ব।

স্টাইলের মিল থেকে পর্ব এবং স্কুলের ধারণা তৈরি হয়। অমন মিল দু'জন শিল্পীর মধ্যেকার এবং একদল শিল্পীর মধ্যেকার যোগসূত্র এবং একটি স্টাইলের বিকাশ কিংবা পরিবৃদ্ধির প্রমাণ। অন্যপক্ষে পরিবর্তনের বোধ উৎসারিত হয় শিল্পের নিয়মে : নিসর্গ; ফিগারবিহীন নিসর্গ; স্টিল লাইফ; স্টিল লাইফ থেকে নির্বস্তুকতা; স্থায়ী নক্সা ও ভঙ্গি থেকে উদ্ভূত দীপ্ত রেখা ও আততি; একখণ্ড রং; গতির মধ্যে রং-এর ফর্ম; মনোজ ঝোঁক; বিষয়ের তিরোভাব; নতুন বিষয় : ক্যানভাসে শিল্পীর উপস্থিতি; শিল্পীর বেশি করে, আরো বেশি করে ছবির স্পেস দখল; এসব চিত্র-বিচারে নতুন যুক্তির অবতারণা করেছে।

বাস্তব ধরা দেয় তিন পথে : অনুভুতি কিংবা যুক্তি কল্পনার পথে। বাস্তবের ঐ উদ্ভাসন, শিল্পবিচারের অতীত রীতি ও সাম্প্রতিক ঝোঁক সবই বিচারের আওতায় এসে যায়। অন্যপক্ষে ইতিহাস ও সময়ের সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে জরুরি। ইতিহাস উপেক্ষা করে, ভবিষ্যতের মধ্যে শিল্পী নিজেকে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন কিংবা আদিম শিল্পের মধ্য দিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন দূর অতীতে, প্রাক্ ইতিহাসে। যদি প্রতিভাস, প্রকৃতি কিংবা ইতিহাস বাস্তব না হয়, তাহলে এ-ও সত্য যে, ঐ প্রতিভাস, প্রকৃতি এবং ইতিহাস মানবিক অভিজ্ঞতা সংগঠন করে এবং ঐসব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল বাস্তবতার অন্তঃজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। তার দরুন, কিউবিজম প্রাথমিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, ঐতিহ্যেরই সংশোধন এবং নতুন প্রয়াস সঙ্গতি ও গাণিতিক নিয়ম আবিষ্কারের দিকে, ঐসব নিয়ম প্রকৃতিকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে ধরা হয়। অন্য পক্ষে বাস্তবতার বিভিন্ন পর্যায় কিংবা স্তর আছে। শিল্পী তার নিজের বাস্তবতার স্তর তৈরি করেন। ঐ স্তর তৈরির জন্য তিনি বহুসংখ্যক আয়তনে একই সঙ্গে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযান চালান। প্রতিটি আয়তন, কালে, চোখের আড়ালে চলে যায়, এভাবে হয়ে ওঠে অতীত; কিংবা অভিযানের নিজস্ব

নিয়মে ফের দেখা দেয়, হয়ে ওঠে বর্তমান; বহুসংখ্যক আয়তনের বিভিন্ন দিকে পরিবৃদ্ধি চিত্রের কাঠামোবিচারে নানা সমস্যার জন্ম দেয়। চিত্রশিল্পের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে যেই শিল্পের জন্ম হয়, তখনই উদ্ভূত হয় স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক ফর্মের বিকার। এভাবেই প্রকৃতির নতুন জন্ম হয়; বিকার, ভাঙন, যোজন, উদ্ভাবনের পথে। ফর্মকে অনুভূত করতেই হবে শুদ্ধ ফর্ম হিসেবে, কিন্তু ঐ অনুভবের পথে জয়নুল আবেদিনের মতন বর্ণনা, কিংবা কামরুল হাসানের মতন স্মৃতিচারণা দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়।

চিত্রের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে অন্তরিত : রেখা, টোন এবং রং। রেখা পরিমাপযোগ্য, তার গুণাবলির মধ্যে আছে দৈর্ঘ্য, কোণ, কেন্দ্রিগ দূরত্ব। টোনের স্বভাবে আছে কালো ও সাদার মধ্যেকার পর্যায়ক্রমিক ভেদ, এবং আছে ওজনের গুণ। রংএর চরিত্রে আছে ওজন কিংবা পরিমাপের ভিন্ন দ্যোতনা। রং গুণসূচক; ওজনযোগ্য; কারণ বর্ণের উজ্জ্বলতা; পরিমাপযোগ্য, কারণ রং-এর সীমা, ক্ষেত্র, বিস্তৃতি। ঐসব আয়তনের সঙ্গে যুক্ত হয় অন্য একটি আয়তন। সেটি হচ্ছে রেখার নির্দিষ্ট সঙ্গতি, টোনের স্কেল থেকে কতক টোনের সমাহার; রং-এর নির্দিষ্ট সুষমা; এভাবে তৈরি হয় স্পষ্ট, স্বতন্ত্র, প্রকাশভঙ্গি।

চোখের দেখা বদলে যায় ঐসব কারণেই। ঐ বদলের পথে অনবরত তৈরি হতে থাকে শুদ্ধ ফর্ম; সেজন্য শিল্পীরা প্রাকৃতিক ফর্মের অনুকারক নন, ফর্মের আবিষ্কারক। কিন্তু ঐ আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবনের ব্যক্তিক প্রয়াস শেষ সত্য নয়, কারণ শিল্পীর আবিষ্কারের কিংবা উদ্ভাবনের ক্ষমতার উৎস সমাজই, সমাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা কিংবা একাত্মতা ঐ ক্ষমতার পরিধি।

পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলায় ঐ সৃষ্টফর্মের আদি খোঁজ মেলে সেজানের কাজে। এখানেও তার খোঁজ মেলে : জয়নুল আবেদিনের *সাপুড়ে, মনোহরণ, চতুষ্কোণ* প্রভৃতি কাজে। রমণীর গলা লম্বা হয়ে গেছে কিংবা রমণী বসে আছে ত্রিকোণের মতো। এভাবেই শিল্পীদের কাজে নির্বস্তুক উপাদান এসেছে, সমালোচক ঐ উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন শুধু। নির্বস্তুকতার ঐ চেতনা শিল্পীদের কাজের বিচার ও ব্যাখ্যার নতুন এক ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। আমিনুল ইসলামের একটি নিসর্গের উল্লেখ করা যায়। চিত্রটির নাম : *ভোর,* এখানে শিল্পীর চোখে যে-ভাবে বাস্তব উদ্ভাসিত সেখানে বাস্তবের চেনাজানা চরিত্র নেই যে-সবের মাধ্যমে বাস্তবের কংক্রিট অস্তিত্ব আমাদের কাছে ধরা দেয়। বাস্তব এখানে পর্যবসিত স্পেস ও ভল্যুমের শুদ্ধ উপাদানাবলিতে। নির্বস্তুক পৃথিবীতে এসব উপাদান সুষমভাবে সংস্থিত, শিল্পীর ইন্দ্রিয়জ বুদ্ধি দ্বারা সংগঠিত, ফলে যৌক্তিক সংহতি লাভ করেছে। ঐ নির্বস্তুকতার প্রকাশ হয়েছে রং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

তাহলে নতুন রীতির কাজের বিচারের ভিত্তি কী হবে?

চারভাবে হয়তো বিচার করা সম্ভব। ঐ বিচারের ভিত্তি শিল্প স্বরূপের চার তত্ত্ব।

এক : যান্ত্রিক সমালোচনার কাছে নন্দনতত্ত্ব বিষয়নিষ্ঠ আনন্দ।

দুই : পটভৌমিক সমালোচনা প্রয়োগবাদী। ঐ সমালোচনায় নন্দনতত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র কোনো-একটি-গুণ-বিশেষের স্পষ্ট অন্তরানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাস বলে বিবেচিত। অভিজ্ঞতা যত স্পষ্ট তত তার গুণ বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ, ততই তার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য।

তিন : সংহত সমালোচনা ভাববাদী। ঐ সমালোচনায় শিল্পকাজ উচ্চতর সংস্থিত এক সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত। শিল্প অনন্য এবং অন্তরানুভূতির বর্ণাভাস খণ্ডমাত্র।

চার : রূপবাদী সমালোচনার ভিত্তি স্বভাবী মানুষের ধ্যান-ধারণা। নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যের প্রতিনিধি কোনো একটি বোধ, সেই বোধের সঙ্গে সাযুজ্য শিল্পকাজে অন্তরিত। ঐ সাযুজ্য স্টাইলের সঙ্গে, চূড়ান্ত পর্যায়ে সংস্কৃতির সঙ্গেও। ঐসবের প্রকাশরূপ শিল্পকাজ। ঐ চার ধরনের সমালোচনা একসঙ্গে কাজ করতে পারে এবং একই শিল্পকাজের বিভিন্ন দিকের ওপর আলো ফেলতে পারে।

ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কিংবা রুচি এসবই সমালোচনার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। কেন এই বিশেষ ছবি ভালো লাগে তার জবাব ঐ চারভাবে দেয়া যেতে পারে। তার মধ্যে কোনটি সত্য কিংবা বেশি সত্য এ বলা দায়। কেননা, শেষ বিশ্লেষণে নন্দনতত্ত্বের কথা এসে যায়। সেক্ষেত্রে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কিংবা রুচি প্রাথমিক, বিচারের জন্য দরকার তত্ত্ব প্রণয়ন, শিল্পকাজের মনস্তাত্ত্বিক ও রূপবাদী দিকের পর্যালোচনা, তাদের সম্পর্কের উদ্ভাসন।

সাম্প্রতিক চিত্রতত্ত্বের ধারণা থাকা দরকার সাম্প্রতিক চিত্র বোঝার জন্য। ঐ তত্ত্বে ফের অন্তরিত শিল্পীর ব্যক্তিত্ব। সাম্প্রতিক কাজ বোঝার জন্য প্রতিষ্ঠিত, সুবর্ণিত কোনো ঐতিহ্য নেই। কাজের মুখোমুখি সেই ব্যক্তিকে নির্ভর করতে হয় নিজের ওপর, নিজের সমালোচনাত্মক শক্তির ওপর, তাকে বাছাই ও বাতিল করতে হয় সৃজনশীল কল্পনার দ্বারা পুনর্নির্মাণ করে ও বুদ্ধির দীপ্তি, চাতুরী, ছলের সমাবেশ আবিষ্কার করে। সেজন্যই সমালোচককে হতে হয় একপেশে বাছাই কিংবা বাতিল করতে গিয়ে। এর মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয় প্রতিটি জীবন্ত সমালোচকের চরিত্র। নির্লিপ্তি শিল্প সমালোচকের জন্য নয়, কারণ তাকে চলাফেরা করতে হয় মানুষি পৃথিবীর মানুষি আবেগ, উদ্ভাস, ধ্যান, কল্পনার মধ্যে। শিল্পী তাঁর সত্তা প্রকাশ করেন ফর্ম ও রং-এ, সেজন্য সাম্প্রতিক সমালোচনায় জোর দেয়া হয়েছে তার পর্যালোচনার ওপর। কখনো এ পর্যালোচনা নির্বস্তুক ফর্মের সমঝদারিতে পর্যবসিত হয়েছে, কখনো বা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব থেকে দূরে সরে গেছে। তবু রং ও ফর্মের ধারণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

রং ও ফর্মের সৃষ্টিশীরতার অনন্য সমন্বয়ের ওপর শিল্পবিচার করা যায়, কিন্তু সৃষ্টিশীলতাকে কিছুতেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এক্ষেত্রে তাই নৈতিকতা, মতাদর্শ এসবের প্রশ্ন ওঠে।

বলা হয়ে থাকে শিল্পকাজ নিজের সময় পেরিয়ে যায়। তার মানে হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা সকল মানুষের, তারই– যে অনুভব করে ও কল্পনা করে। কিন্তু কল্পনা তো সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই নিঃশেষ নয়, স্ব-সময়ে অংশভাগ, সময় মেনে কিংবা সময়ের বিরুদ্ধে গিয়ে। ইতিহাসে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শিল্প ইতিহাস পেরিয়ে যায়। কোনো একজন শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা তাঁর প্রতিবেশের সম্পূর্ণ ধারণা ছাড়া বিচার করা সম্ভব নয়। প্রতিবেশের ধারণা দুভাবে সম্ভব, হেগেল যেমন মানুষি আদর্শের প্রণয়ন করেছেন কিংবা বুর্খহার্ট যেমন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের টাইপ প্রণয়ন করেছেন।

সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বটি দশটি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব থেকে ভিন্ন, কারণ ঐ ব্যক্তিত্বে ঐ মুহূর্ত অন্তরিত যখন মানুষের সৃষ্টিশীল কল্পনা রং ও ফর্মে মূর্ত হয়। মানুষের অন্যান্য সব কর্ম, বুদ্ধিবাদী নৈতিক ধর্মীয় সামাজিক সবই ঐ কেন্দ্র ঘিরে এবং তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় নিয়োজিত, কিন্তু ঐ সবের মূল্য নির্ভরশীল কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত বলে।

অতীত সংস্কৃতির জন্য সহানুভূতির কারণ বোঝা যায়। কিন্তু শিল্পবিচারের সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। অমন সহানুভূতির দরুন সমালোচক হয়তো অতীতের মূল্যমানে তাঁর স্ব-সময়ের কাজ বিচার করবেন, ফলে হয়তো ভুল বুঝবেন সাম্প্রতিক কাজ যা-কিনা মৌলিক ও সত্য, কিংবা ঐতিহ্যের অনুকরণ সৃষ্টিশীল ভেবে বসবেন। ঐভাবে বর্তমান কিংবা অতীত কোনো কালেরই কাজ বোঝা, বিচার ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।]

বাংলাদেশের শিল্পকলা

সৈয়দ আলী আহসান

একটি জাতির শিল্পচৈতন্যের প্রকাশ তার স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এবং চিত্রকলায়। প্রধানত এ তিনটি অঙ্গনেই শিল্পকর্মের মৌলিক স্ফূর্তি ঘটে। যে-কোনো প্রসিদ্ধ শহরেই আমরা প্রবেশ করি না কেন সেখানে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তার অট্টালিকা এবং তার ভাস্কর্য অবশেষে বিভিন্ন গ্যালারিতে প্রবেশ করে শিল্পকলার অনুধ্যানে আমরা নিমগ্ন হই। যেমন রোম শহরকে তার প্রাচীন সৌভাগ্যে বিলসিত দেখি, তেমনি প্যারিসকে তার বিচিত্র স্থাপত্যনিদর্শনের দ্বারাই পরিচয় সূত্রে আবদ্ধ করি, কিন্তু আমাদের দেশে যখন আমরা আসি তখন স্থাপত্যের কোনো নির্ণেয় রূপ পাই না। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পুরনো দিনের স্থাপত্যের খুব বেশি নির্দশন নেই এবং যেগুলো আছে সেগুলোও সমাদৃত নয়। আমরা নতুন যে সমস্ত ভবন নির্মাণ করছি সেগুলো পুরনো স্থাপত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক ধারাক্রমে নির্মিত নয়। সুতরাং ইতিহাসের ধারায় আমাদের পরিচয়যোগ্য কোনো স্থাপত্যকর্ম নেই। চরম বিশৃঙ্খল এবং অব্যবস্থায় আমাদের অট্টালিকাগুলো নির্মিত হয়েছে এবং

হচ্ছে। সেগুলোর না আছে চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গতি, না আছে ইতিহাসের প্রতি সমর্থন, না আছে ব্যবহার-উপযোগিতার সার্থকতা। সুতরাং নিষ্ঠুরসত্য উচ্চারণ করলে বলতে হয় বর্তমানকালে আমাদের একটি নগর-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো স্থাপত্যের নিদর্শন নেই। একটি অট্টালিকা উর্ধ্বমুখে যাবে, না সমান্তরালে প্রসারিত হবে, না বৃত্তাকারে প্রদর্শিত হবে তা নির্ভর করে যতটা অট্টালিকার ব্যবহারের স্বভাবের উপর, ততটা তার চতুর্দিকের দৃশ্যাবলির উপর। একটি স্পেসের অনেকটি দিক আছে—তার উর্ধ্বলোক আছে, অভ্যন্তরীণ দিক আছে এবং বহিপার্শ্ব আছে। এসব কিছুকে সমন্বিত করে একটি স্থাপত্যের জন্ম হয়। পুরনো ঢাকার বাড়িগুলো প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এক একটি আবরিত অন্তরালতা নির্মাণ করেছে। সেগুলোর না আছে রাস্তার সঙ্গে সঙ্গতি, না আছে পার্শ্ববর্তী গৃহের সঙ্গে সমন্বয়, না আছে কোনো ব্যবহার উপযোগিতার দীপ্তি। কিন্তু একসময় মোগল আমলে এই শহরে স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দ্রষ্টব্য শহর হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। সে সময়কার গৃহগুলো উর্ধ্বগ ছিল না। অনেক খোলা জায়গা নিয়ে বিস্তারিত পরিক্রমায় উন্মুক্ত ছিল। লালবাগের দুর্গ এবং তার অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলো দেখলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ঢাকা শহরের একটি নতুন বিস্তার ঘটেছিল। পুরোন শহরকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ যুগে রমনা এলাকায় একটি নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। বৃত্তাশ্রয়ী অর্থাৎ সার্কুলার রোড নির্মাণ করে তার বিভিন্ন দিকে যে সমস্ত অট্টালিকাশ্রেনি নির্মিত সেগুলো আধুনিক হয়েও ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হয়নি। যদিও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার-উপযোগিতায় অধিকাংশ গৃহ এ দেশের আবহাওয়ার সমর্থনে গড়ে ওঠেনি কিন্তু বহির্ভাগ সুষম সৌন্দর্যে দৃশ্যমান ছিল। ব্রিটিশ আমলে কোনও অট্টালিকাই এককভাবে সমাদৃত হয়নি, বৃক্ষশোভায় সমাবৃত হয়ে সেগুলো তাৎপর্য পেয়েছে। যেহেতু ইটের রং লাল তাই একই উপকরণের বহিঃপ্রকাশ লাল রং-এ উদ্ভাসিত ছিল। সজীব বৃক্ষসমূহ ছিল সবুজ এবং অট্টালিকা ছিল লাল, এ দু'টি রঙের আশ্চর্য সমন্বয়ে একটি বিস্মিত প্রভা নির্মিত হয়েছিল। একটি নগরের শোভা শুধু অট্টালিকায় নয় তার বৃক্ষরাজির দ্বারাও। জার্মানির অধিকাংশ শহরই এক অর্থে Garden City বা বাগানের শহর। বড় বড় বৃক্ষশোভিত হয়ে বিচিত্র আকৃতির বৃক্ষশাখার প্রসারের মধ্যে বিভিন্ন অট্টালিকা পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে স্থাপত্যকর্ম শুধু অট্টালিকা নির্মাণেই সমাপ্ত নয়, তার সকল দিগন্তকেও সুসজ্জিত করতে হয়। ঢাকা শহর মোগল আমলে যেমন, তেমনি ব্রিটিশ আমলেও বিশেষ বিশেষ স্বভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তার নিজস্ব কোনও স্বভাবই নেই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর আমরা যেন সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করে একটি নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ করলাম। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নগর পরিকল্পনার সুযোগ না থাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকা আমরা গঠন করতে লাগলাম যেখানে চরমতম স্বাধীনতায় এক একজন এক এক ধরনের বাড়ি-ঘর তৈরি করতে লাগলেন। বিদেশ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থপতিরা পূর্ণাঙ্গভাবে একটি নগর পরিকল্পনার অথবা অঞ্চল পরিকল্পনার কোনও সুযোগ পাননি। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অট্টালিকা সীমিত সুযোগের মধ্যে তাঁরা নির্মাণ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে স্থপতি মযহারুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিকল্পিত ঢাকা চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় বহির্বিভাগের এবং অভ্যন্তরের স্পেস বা পরিসরের মনোজ্ঞ সমন্বয়ে স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নগর পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে কোনও প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত নয়, সুতরাং কোন সঙ্গতিতে পথঘাট এবং গৃহগুলো নির্মিত হবে তার কোনও নির্দেশ জনসাধারণের জন্য নেই। নির্মাণ প্রকল্পের সর্বভুক্ত স্বাধীনতায় আমাদের অট্টালিকাশ্রেনি কোনোরূপ

শিল্পগত অবস্থায় রূপলাভ করেনি। সুতরাং সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে এককভাবে দু'একটি অট্টালিকা অথবা কোনও কোনও গৃহনির্মাণ প্রকল্প সঙ্গত-শরীরী হলেও সামগ্রিকভাবে স্থাপত্যশিল্পে আমাদের কোনো সুচিহ্নিত অভিপ্রায় এখনও জ্ঞাপিত নয়।

আমাদের দেশে এককালে প্রস্তরনির্মিত ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন ছিলো। হিন্দু মন্দিরের মৃন্ময় মূর্তিগুলো প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত সুগঠিত ছিলো। এসব মূর্তি ছিল ধর্মার্চনার সঙ্গে যুক্ত আদর্শভিত্তিক। কোনও মূর্তি ছিল শক্তির প্রতীক, কোনও মূর্তি অভয়ের, কোনও মূর্তি ধ্বংসের, কোন ও মূর্তি সমৃদ্ধি এবং এভাবে বিভিন্ন স্বভাব, সৌভাগ্য এবং শক্তির প্রতীক হয়ে মূর্তিগুলো নির্মিত হয়েছিল। এ কারণে এসব মূর্তিকে প্রতিনিধিগত বা Representational বলা চলে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মানব-শরীরের গঠন-সৌষ্ঠবকে ধারণ করলেও এগুলোর কোনোটাই বিশেষ কোনও মানুষ অথবা মনুষ্য স্বভাবের প্রতিমূর্তি নয়। বাংলাদেশে যে সমস্ত মূর্তি আমরা পাচ্ছি সেগুলো হিন্দু দেবদেবীদের বিভিন্ন প্রতিভার প্রতিকৃতি, কখনও তারা-মূর্তিরূপে, কখনও সূর্য-মূর্তিরূপে, কখনও গঙ্গা-মূর্তিরূপে, কখনও কালী-মূর্তি অথবা দশমহাবিদ্যা রূপে। অধিকাংশ মূর্তি কালো পাথরের। মূর্তি নির্মাণটি মুসলমান সমাজে গৃহীত কোনো শিল্প নয় তাই মুসলমানদের হাতে এর কোনও ইতিহাসও নির্মিত হয়নি। যেহেতু মূর্তি নির্মাণটি ধর্মসাধনার অঙ্গ তাই হিন্দু এবং বৌদ্ধদের হাতেই আমাদের দেশে এর একমাত্র পরিচর্যা ঘটেছে। ব্রিটিশ আমলে শাসকগণ তাদের প্রতাপকে এবং দর্পিত কার্যক্রমকে চিহ্নিত রাখবার জন্য রাস্তার মোড়ে এবং পার্কে তাদের সম্রাজ্ঞীর অথবা রাজার অথবা কোনও বীর সৈনিকের মূর্তি স্থাপিত করেছিল। তবে এগুলো কোনও প্রকার শিল্পধারার সঙ্গে যুক্ত নয়।

১৯৪৭ সালের যখন দেশবিভাগ হল তখন পাকিস্তানের শিল্পকলায় এক নতুন উদ্দীপনা এল। কিন্তু সে উদ্দীপনা মূলত চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে নয়। গৃহ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি নির্মিত হয়েছে অবশ্য কিন্তু সেগুলোকে ভাস্কর্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। একসময় দেশবিভাগের পূর্বে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কিছু প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন এবং ভাস্কর্যসাধনে তাঁর একটি সিদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু পাকিস্তানে মূর্তি নির্মাণকলা কোনোরূপ বিবেচনা পায়নি। কখনও কখনও ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও শিল্পী কিছু কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। সেগুলোতে তাঁদের সম্ভাবনার পরিচয় পাই কিন্তু পরিণতির পরিচয় পাই না।

আধুনিককালে ভাস্কর্য মূলত দু'প্রকারের, মনুষ্য বা প্রাণীর মূর্তি অথবা বিমূর্ত কোনও আকৃতি। একটি অট্টালিকা অথবা উদ্যানের বৃক্ষের পটভূমিতে বিমূর্ত আকৃতির কিছু কিছু ভাস্কর্য বিদেশের মতো আমাদের দেশেও হয়েছে। তেমনি আবার মনুষ্যমূর্তিগুলো পুরোপুরি মনুষ্য আকৃতির না হয়ে ভঙ্গিতে মনুষ্য স্বভাবকে ধারণ করেছে মাত্র, অর্থাৎ এক প্রকার ইঙ্গিতময়তায় এগুলো প্রতীকীরূপে প্রদর্শিত। পাথরের যে জমাটবাঁধা স্তব্ধতা আছে—যাকে বস্তুপুঞ্জের একটি চাপ বলতে পারি, ইংরেজিতে যাকে বলি Mass, ভাস্কর্য নির্মাণে তাকে বিশেষ সৌষ্ঠব দিলেই চলে না, তাকে বিশেষ কৌশলে জীবনময়ও করতে হয়, কখনও কখনও প্রবাহিততা আনতে হয়। আধুনিককালে হেনরি মুর যে কৌশলে এটা সম্ভবপর করেছেন তাকে ক্যাভিটি বা হলোনেস (cavity বা hollowness) পদ্ধতি বলা হয়। নির্মিত অবয়ব বা আকৃতির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপের শূন্যতা সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ স্বরূপকে প্রাণগত বহমানতায় দীপ্ত করে হেনরি মুর একটি নতুন ভাস্কর্য-প্রক্রিয়ার জন্ম দিলেন। ইংরেজিতে একে পেনিট্রেশন অব দি ম্যাস (penetration of the mass) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যার সাহায্যে বস্তুর স্তব্ধতা ভেঙে যায় এবং তা যেন সচলতায় বাঙ্ময় হয়। এভাবে শিল্পী

আকৃতিগত যে অনুভূতি নির্মাণ করেন তা শুধু বস্তুর বহির্বিভাগ নিয়েই নয়, অন্তর্বিভাগ নিয়েও গড়ে ওঠে।

আমাদের দেশে ভাস্কর্যকর্মের আধুনিক কিম্বা প্রাচীন কোনও কৌশলই অবলম্বন করা সহজসাধ্য নয় উপকরণের অভাবে। পাথর নেই, কাঠও দুর্মূল্য, ধাতব দ্রব্যও সহজলভ্য নয়। কোনও কোনও শিল্পী কংক্রিটের সাহায্যে ভাস্কর্য-সাধনে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু কংক্রিট হচ্ছে একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ গঠন-প্রকৌশল বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ঢালাইয়ের কাজ। উভয়ের সমন্বিত সম্পাদ্যে কংক্রিটের আকৃতি তৈরি হয়। সুতরাং কোনও শিল্পী যখন কংক্রিট ব্যবহার করবেন তখন তাঁকে শিল্পবোধের অতিরিক্ত প্রকৌশল জ্ঞান এবং ঢালাইয়ের রীতি-প্রকরণ জানতে হবে। কংক্রিটের সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতির সমতল এবং বহুবিধ জ্যামিতিক ব্যঞ্জনা নির্মাণ করা যায়। সুতরাং নগরের শোভা বর্ধনের জন্য বিবিধ বিমূর্ত আকৃতি কংক্রিটের সাহায্যে গঠন সম্ভবপর। কোনও নতুন নগর-পরিকল্পনায় নব-নির্মিত এককসৌধ বা সৌধশ্রেনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাস্কর্য তৈরি হতে পারে যেমন হয়েছে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ায়। ব্রাসিলিয়ায় ব্রাসিলিয়া শহরটি একটি উপত্যকায় স্থাপিত। পরস্পর সন্নিবিষ্ট এবং পর্যায়ক্রমে সন্নিহিত সৌধশ্রেনি স্থাপত্যশিল্পে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। স্থপতি ওসকার নিমেয়ার ফেরোকংক্রিট ইঞ্জিনিয়ার ওয়াকিম কার্দোজোর সহযোগিতায় তাঁর সৃষ্টি-কুশলতার বিচিত্র প্রদর্শনী নির্মাণ করেছেন। কোনও কোনও অট্টালিকা সামগ্রিক দৃশ্যমানতায় বিমূর্ত করেছেন। কোনো কোনো অট্টালিকা সামগ্রিক দৃশ্যমানতায় বিমূর্ত ভাস্কর্যের আকৃতি পেয়েছে। এরকম সুযোগ একটি সম্পূর্ণ নগর-পরিকল্পনায় না পেলেও অংশত আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু তার সদ্ব্যবহার আমরা করিনি। পাকিস্তান আমলে দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে পরিকল্পিত লুই কানের স্থাপত্য-নির্দেশনাকে স্থানবিশেষে পরিবর্তন করে যে বিকৃতি সৃষ্টি করেছি তা দুঃখজনক, শুধুমাত্র তাই নয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে একক উপকরণের উচ্চতাকে বিবিধ উপকরণে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। সমগ্র এলাকায় কুশল বিন্যাসে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা হয়নি। বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য স্থাপনারও সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি। এ-অঞ্চলে স্থাপত্যকর্মের পরিশীলন ছিল নতুন, কালানুগত আচারের নয় তাই তার নতুনতার রহস্যকে বিবেচনা করেই তার কৌশলকে দীপ্যমান করা উচিত ছিল। তার রূপগত ভিন্নতাকে মান্য করেই তার প্রাণের সন্ধান আমরা করতে পারতাম।

ভারতের রামকিঙ্কর কংক্রিটের বহিরঙ্গগত প্রাথমিক রুক্ষতাকে বিদ্যমান রেখে যেসমস্ত মূর্তি নির্মাণ করেছেন অথবা সিমেন্টের ব্যবহারেও সারফেসকে অমসৃণ রেখে যে আবহ সৃষ্টি করেছেন তাতে উপকরণের স্বভাবকে রক্ষা করার একটি শিল্পসঙ্গত চেষ্টা দেখা যায়। তবে কাঠের ব্যবহারে তাঁদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্য অত্যন্ত হৃদয়বেদ্য। আফ্রিকার বেনিন অঞ্চলে প্রধানত এবং অন্যান্য দেশেও কাঠের মূর্তিগুলো যে লম্ব এবং ঊর্ধ্বগ স্বভাব নিয়ে নির্মিত, ভারতের শিল্পীরাও তাকে মান্য করেছেন। আমাদের দেশে বর্তমানে কাঠ দুর্মূল্য হলেও উপকরণ হিসেবে কখনই দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং ভাস্কর্যের যে-কোনও প্রকার ফর্ম গঠনের ক্ষেত্রে কাঠের ব্যবহার সহজবোধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কোনও শিল্পীই উল্লেখযোগ্যভাবে এ-পথে অগ্রসর হননি। অসঙ্গত অনির্ণেয়তায় এ-পথে আমাদের কোনও শিল্পসাধন ঘটল না।

একমাত্র হামিদুজ্জামান মুক্তাঙ্গন বা ওপেন-এয়ার ভাস্কর্যকর্মে বর্তমানে সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। নানাবিধ উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে তামা আছে, পিতল আছে, লোহা আছে, টিন আছে। বিভিন্ন আকৃতির উদঘাটনের জন্য একক বা সমন্বিত উপকরণের সাহায্যে তিনি

অনেকটা চিত্রপদ্ধতিগত রূপের অভিব্যক্তি এনেছেন। তবে একটি ফাউন্টেন বা ঝরনার ঊর্ধ্বগ পানি নিঃসরণের গতিকে অনুসরণ করে একটি পাখির বিমূর্ত উড়ন্ত ভঙ্গিকে তিনি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। প্রকৌশলীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এবং তাদের সাহসিকতায় তাঁর এ ভাস্কর্যকর্মটি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ডিজাইনের পরিকল্পনার বহুবিধ পরীক্ষার পর তিনি তাঁর নির্মিতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। দার্শনিক Kur (kant) বলেছিলেন 'The design is what is essential', রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে এ-বিশ্বাসের পরিবর্তন অবশ্য ঘটেছে—কিন্তু উদ্যান-পরিকল্পনায় এবং মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের আকৃতি গঠনে বর্তমানেও ডিজাইনের গুরুত্ব সমভাবেই রয়েছে।

চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয়তা সমপুস্থিত এবং সমুচ্চারিত। কলকাতার শিল্পধারার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কলারীতির সমর্থন নিয়েই ১৯৪৭ সালে আমাদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির অভিযাত্রা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোগল চিত্ররীতির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং তার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলাপদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। প্রধানত একক এবং যুগল মূর্তিকে নির্বিঘ্ন আবদ্ধ কম্পোজিশনে (closed composition) সংক্ষিপ্ততম গভীরতায় তিনি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রং-তুলির চারুতা এবং প্রলেপন যে শিল্প-লক্ষণার সৃষ্টি করল তাতে নতুন ভাবানুভূতির উন্মোচন ঘটল। চীন ও জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে তুলি ব্যবহারের যে সুনিপুণ সূক্ষ্মতা আমরা লক্ষ করি, অবনীন্দ্রনাথ তা আয়ত্ত করেছিলেন। তুলির লঘু স্পর্শের এ-কৌশলকে তিনি বলতেন 'হস্তলাঘবতা'। কখনও মোগল পদ্ধতি, কখনও প্রাচীন চিত্রধর্মিতা, কখনও চীনা বা জাপানি কৌশল তাঁর শিল্প-মানসকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু সর্বত্রই একটি সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর চিত্রকলায় ভাব-লাবণ্যের অপূর্ব সংবেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যিনি প্রথম সার্থকভাবে ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির জ্যামিতিসিদ্ধতা এবং কিউবিস্ট অভিনিবেশের আকৃতিকে এ-দেশের শিল্পে প্রবর্তন করেন তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নন্দলাল বসু ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের গড়নকে তাঁর চিত্রকর্মে উপস্থাপিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশি আল্পনা ও পটচিত্রকে অপরূপ শোভন কৌশলে তাঁর চিত্রে ব্যবহার করলেন। এভাবে অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ আমরা যামিনী রায়ের বিস্ময়কর স্বকীয়ত্বে অভিভূত হলাম। যামিনী রায় দেশজ গ্রামীণ শিল্পকর্মের স্বভাবকে আত্মস্থ করে যে চিত্রিত শিল্প প্রবর্তনার নতুন অঙ্গীকার আনলেন তার অসাধারণত্ব আজও অম্লান ও অবিমর্ষ। মোটা তুলির টানের নিঃসংশয়তা, ক্যানভাসের সীমাবন্ধনে, ডিজাইন ও কম্পোজিশনের সম্পূর্ণতা, একই প্রবৃত্তির রেখার পৌনঃপুনিক প্রয়োগ তাঁর চিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। জাপানি চিত্রের মতো পশ্চাদভূমিকে অস্বীকার করে চিত্রিত বস্তুকে স্তব্ধভাবে প্রকাশ করা যামিনী রায়ের একটি কৌশল ছিল। তাঁর ছবিতে অবশ্য আলো-ব্যবহার নেই, সূর্যালোকের বর্ণিক প্রতিফলন নেই।

যামিনী রায়ের জীবিতকালে তাঁর পূর্ন সিদ্ধির সময়ে তরুণ জয়নুল আবেদিন বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের অযাচিত মৃত্যুর দৃশ্যপট উন্মোচন করলেন। মৃত্যুময়তা এবং মৃত্যু পথযাত্রার অথবা বুভুক্ষায় দুর্বল অসহায় শরীরগুলো বিচিত্র আকৃতি নিয়ে আবেদিনের দীপ্ত মোটা তুলির টানে বিস্ময়কর স্তব্ধতায় প্রকাশিত হল। নতুন বিষয়ের নতুন আবেদনে আবেদিন সকলকে অভিভূত করলেন। এ চিত্রগুলোতে সমাজের কোনও সমালোচনার অথবা রাজনীতির কোনও প্রেক্ষাপট ছিলো না, শিল্পী আবেদিনের স্বকীয় জীবনগত কৌতূহলের উপস্থাপনাই ছিল। সে সময় আরও কয়েকজন তরুণ মুসলমানশিল্পী অনেকের দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন আবক্ষ প্রতিকৃতি-শিল্পী

আনওয়ারুল হক, কাঠখোদাই শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ এবং রেখাঙ্কনে সুদক্ষ কামরুল হাসান। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর এঁদের নিয়েই চিত্রজগতে আমাদের প্রথম যাত্রা।

একটি শিল্পকর্মের বিশিষ্টতা এবং সম্পন্নতা নির্ভর করে বহুলাংশে শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, কৌশল এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপর। চিত্রটির বিষয়গত অর্থবৃত্তি শিল্পীর মানসলোকের চৈতন্যের উপর স্থাপিত। বাস্তবের কোনও আকৃতি বা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিতে শিল্পের যাথার্থ্য নয়, শিল্পের যথার্থ্য হচ্ছে কণ্ঠের উচ্চারণের মতো শিল্পীর অঙ্কনশৈলীর স্বকীয়তা। এ-স্বকীয়তাই জয়নুল আবেদিনকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। শিল্পীর তুলির টানে যে ইডিয়াম নির্মিত হয়, বস্তুর দৃশ্যগত আকৃতির যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা এক ধরনের ট্রান্সফরমেশন (Transformation)। আবেদিন এরকম ট্রান্সফরমেশন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতগত গভীরতা নেই, পূর্ণাঙ্গ মডেলিং-এর কারুতা নেই, গঠিত আকৃতির একটি স্তব্ধতা আছে। মোটা তুলির টানে পৌনঃপুনিকতা তাঁর চিত্রগুলোতে একধরনের রিদ্‌ম্ বা ছন্দ এনেছে। তাঁর দুর্ভিক্ষকালীন চিত্রগুলোর ফোরগ্রাউন্ড বা নিম্নভাগটি খুবই সংকীর্ণ কিন্তু উপরিভাগে শূন্যতার একটি বিস্তার আছে। এ কৌশলের ফলে তাঁর এ-সমস্ত চিত্রগুলো আলেখ্যগুণ পেয়েছে, আমরা আকৃতিগুলোকেই একমাত্র দেখি। মোটা মোটা বলিষ্ঠ রেখায় আবেদিন এক পৃথক স্বভাবের চিত্র সৃষ্টি করলেন।

পাকিস্তানে এসে 'ঢাকা আর্ট' স্কুল প্রতিষ্ঠার পর আবেদিন কিছুকাল লন্ডনের স্লেড স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এ-প্রশিক্ষণের ফলে তিনি পাশ্চাত্য শিল্প-ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হয়েছিলেন। আলো-ছায়ার সন্ধান, স্পেসের ব্যবহারের কৌশল, দ্বিমাত্রিক ক্যানভাসের স্বভাবগত সৌহার্দ্যকে মান্য করে তার সঙ্গে ত্রিমাত্রিকতাকে সম্পর্কিত করা, রঙের স্নিগ্ধ নমনীয়তা এগুলো তাঁর কিছুসংখ্যক তৈল-চিত্রে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা ছিল মোটা তুলির রেখাচিত্রে। ইউরোপীয় পদ্ধতির শিল্পলোক-পরিক্রমা তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে নতুনভাবে ধার্য করতে পারল না। জীবনের শেষের দিকে তিনি আবার ফিরে গেলেন একক আকৃতিসর্বস্ব রেখাঙ্কনে। তিনি দুর্ভিক্ষকে দেখেছিলেন কলকাতায়, কর্মরত সাধারণ মানুষকে দেখেছিলেন গ্রামে—শুধু মানুষ নয়, গরু-মহিষ ইত্যাদি কৃষিকর্মের প্রাণীকে। এ-গ্রামকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি। পাকিস্তান আমলে মোগল চিত্রধর্মিতার সার্থক প্রতিবেদক আবদুল রহমান চুঘ্‌তাই অথবা আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রধর্মের কুশল অনুপ্রাসে প্রাণবন্ত জুবায়দা আগা—এঁদের উভয়ের সঙ্গে আবেদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটলেও তা ছিল চিত্রশাস্ত্র-নিরপেক্ষ। আবেদিন আজীবন রেখাঙ্কনে এবং কম্পোজিশনে তাঁর যৌবনকালের বোধ এবং স্বভাবকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি বিদেশি রংও ব্যবহার করতে চাইতেন না, যখনই সম্ভব হত সম্পূর্ণ দেশজ উপাদান দিয়ে রং তৈরি করে নিতেন। নতুন নতুন আঙ্গিক, বর্ণের প্রয়োগে নব নব বিভা এবং ডিজাইনের বিভিন্ন প্রকার 'বিভঙ্গ' আবেদিনের সৃষ্টিতে আমরা পাই না। কিন্তু তিনি শিল্পসাধনায় সর্বদাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তরুণ শিল্পীদের সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী আঙ্গিককেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর ঔদার্যে এবং সমর্থনে আমাদের দেশে নতুন নতুন শিল্পভঙ্গি জন্ম নিয়েছে।

ড্রয়িং যাঁরা করেন তাঁদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সদৃশকরণকে নিশ্চয় করা। কিন্তু সদৃশকরণতো অবিকল প্রতিরূপ নয় কেননা আকারগত সাদৃশ্য রক্ষা করা বা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শিল্পীর রয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে উপমায় সাদৃশ্যের উপকরণ দেওয়া আছে বিচিত্র তাৎপর্যে, যেমন খঞ্জনা পাখির মতো চোখ, কনককুম্ভের মতো স্তন, পিপুলপত্রের মতো রমণী-চিহ্ন, রুদ্ধদ্বার কপাটের মতো পুরুষের বক্ষ, হরিণীর মতো নয়ন ইত্যাদি। এ-সমস্ত উপমায় যথাযথ সাদৃশ্য

আসে না কিন্তু সদৃশতার আনন্দ তৈরি হয়। ড্রয়িং-এর রেখাঙ্কনে যাঁরা সুদক্ষ তাঁরা রেখার বিচিত্র লীলায় আকৃতির বহু আশ্চর্য ভঙ্গি নির্মাণ করেন। বস্তুর নিজস্বরূপ উদ্ভাসিত হয় এবং বলা যায় কল্লোলিত হয় উপমা হয়ে নানা সাদৃশ্যে। একটি রমণীশরীরে কত বিচিত্র রূপ যে রয়েছে অজন্তা গুহার চিত্রগুলো দেখলেই তা অনুভব করা যায়, কখনও মেঘমালাসদৃশ প্রবহমানতায়, কখনও ফলভারে আনত বৃক্ষশাখার মতো, কখনও হরিণীর চকিত উৎকণ্ঠার মতো। দৃশ্যমানতার অজস্র আকৃতিকে কখনও রূপগত সাদৃশ্যে, কখনও ভাবের সাদৃশ্যে, কখনও অন্তর্লীন কল্পনার সাদৃশ্যে শিল্পী তাঁর তুলিকে চালনা করেন। আমাদের দেশে ড্রয়িং-এর কারুতার সুদক্ষতায় কামরুল হাসান সদৃশকরণের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন বস্তুস্বরূপকে প্রতিরূপকে মান্য করে। এর ফলে ইলাস্ট্রেশন বা বস্তুগত রেখাঙ্কন তাঁর হাতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বস্তুর আকৃতির আদলকে সর্বদাই তিনি রক্ষা করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে ড্রয়িংই প্রাধান্য পেয়েছে এবং ড্রয়িংই তাঁর প্রধান ব্যসন। এ-ছাড়া পটচিত্রের দেশজ ভঙ্গিমায় মৌলিক কয়েকটি রং-কে অবিমিশ্রিভাবে ব্যবহার করে আমাদের গ্রামীণ জীবনকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন। এ-সমস্ত ছবিতে পরিসর বা স্পেসের বিশ্লেষণ নেই, বিশুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার নেই। ক্যানভাস বা চিত্রপটের সর্বাংশ জুড়ে আকৃতির সংস্থাপনা ঘটেছে। তাঁর চিত্রকল্প বিষয়-নিরপেক্ষ বিমূর্ত নয় কিন্তু দেশজ ভাব-লাবণ্যের উজ্জ্বল প্রকাশে প্রাণবন্ত।

ছাপটিত্রের বিশেষ কোনও রহস্য নেই কিন্তু ছাপচিত্র তুলতে অপরিসীম ধৈর্য এবং কৌশলগত দক্ষতার প্রয়োজন। ধাবত প্লেট থেকে হোক, পাথর থেকে হোক, কাঠ থেকে হোক, যে-কোনও উপকরণ থেকেই চিত্র উদঘাটন তীক্ষ্ণকুশলতার প্রয়োজন। যাঁরা কাঠ ব্যবহার করেন তাঁরা সরাসরি কাঠের সারফেসে ধারালো ছুরি বা অন্য কোনো সূচালো যন্ত্র দিয়ে আকৃতি খোদাই করেন। বহু যুগ থেকে এ-কৌশল চলে এসেছে। ইতিহাসের দিক থেকে ছাপচিত্রের শিল্পীকে 'গ্রাফিক হিসটোরিয়ান অব সোসাইটি' (graphic historian of society) বা সমাজের রেখাকৃতিগত ঐতিহাসিক বলা হয়ে থাকে। শিল্পীরা ছাপচিত্রের মাধ্যমে তাঁদের সময়কালের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। চীন দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের ছাপচিত্রের প্রচলন ছিল, কাপড়ের উপরও রঙিন ছাপের প্রচলন সে-দেশে বহুকালাবধি চলে আসছে। সুচিহ্নিতভাবে সপ্তদশ শতকের জাপানে উকিয়ুয়ে নামে পরিচিত কাঠের ছাপচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উদঘাটিত হয়েছিল। এ-সময়কার একজন শিল্পী উতামারু পৃথিবীর শিল্পকর্মের ইতিহাসে অদ্যাবধি মর্যাদা পেয়ে আসছেন। ইউরোপে ছাপচিত্রের প্রচলন আরম্ভ হয় পঞ্চাদশ শতক থেকে। ধর্মীয় কাহিনী, লোক-কাহিনী, সামাজিক প্রথা ও আচরণ আলব্রেখট ড্যুয়ার অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকর্মে নির্মাণ করেছেন সে কারণে তাঁকে সর্বকালের supreme engraving technician বলা হয়। ড্যুরার তাঁর সময়ে পৃথিবীতে যে আচরণ ও বিশ্বাস দেখেছেন তা থেকেই তাঁর চিত্রের বিষয় নির্মাণ করেছেন।

আমাদের দেশে ছাপচিত্রের প্রচলন মূলত সাম্প্রতিককালের। ইউরোপীয় শিল্পপদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে-দেশের বিভিন্ন অঙ্কনপদ্ধতি আমরা অনুসরণ করেছি। এর মধ্যে কাঠের ছাপচিত্র অন্যতম। এভাবে ক্রমান্বয়ে এচিং ও লিথোগ্রাফিও এসেছে। সফিউদ্দিন আহমেদ প্রথমে কাঠের ছাপাচিত্রে একক বা দ্বৈতমূর্তি উদঘাটন করার কৌশল আয়ত্ত করেন, পরে অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রিন্ট শিল্প-প্রক্রিয়ায় সাময়িক ঘটনার লিপিকরণ ঘটেছিল একসময়, কিন্তু বর্তমানে নিছক শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে তা গৃহীত হচ্ছে। অন্যান্য মাধ্যমের মতো, যেমন তেলরং, জলরং, প্রিন্টের ক্ষেত্রেও বাস্তবের প্রচণ্ড

ভঙ্গুরতা এবং বিভাজন ঘটেছে। আমাদের দেশের শিল্পকর্মেও এর প্রতিক্রিয়া এসেছে। সফিউদ্দিনের হাতে যা রৈখিক অলঙ্করণে পরিণত হয়েছিল, মুহম্মদ কিবরিয়ার লিথোগ্রাফ এবং এচিং-এর সুদক্ষ শৈল্পিক কারুকর্মে তাতে নতুন অর্থবহতা এল, কালিদাস কর্মকারের সূক্ষ্ম অভিনিবেশে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচরণের প্রতিবর্নীকরণ ঘটল, মনিরুল ইসলামের কাছে ফর্মের মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি ঘটল এবং সম্প্রতি আবদুস সাত্তারের অনুশীলনে কাঠের স্বভাবের বিদ্যমানতায় অত্যন্ত কুশলী শিল্পব্যঞ্জনার স্ফুরণ ঘটেছে।

শিল্পকর্ম কি নিছক সৌন্দর্য ধ্যান এবং চিত্রপ্রক্রিয়াগত একটি ম্যাজিক্যাল বা যাদুকরি অভিজ্ঞতা? আমি এই প্রশ্নটা করছি এই জন্য যে বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্রকর্ম মুখ্যরূপে শিল্পপ্রকাশ-রূপে বিবেচিত হচ্ছে, যাকে ইংরেজিতে বলি প্লাস্টিক এক্সপ্রেশন (plastic expression)। লুই আরাগঁ একসময় বলেছিলেন, "বাস্তবকে অস্বীকার করে সম্মোহন বা ম্যাজিকের সঙ্গে যা যুক্ত হয় তাকেই আমি নির্বিকল্প সৌন্দর্য বলি।" আরগঁ এ-কথাগুলো বলেছিলেন আধুনিক চিত্রকর্মের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি দেখে। এ সমস্ত কৌশল-প্রক্রিয়ায় মানসলোকের গভীরতা এবং জীবনগত অর্থ যখন সংযোজিত তখনই তা মহৎ শিল্পে পরিণত হয়। পিকাসো নানাবিধ শিল্পপদ্ধতির পরীক্ষার করলেও তাঁর সমকালের পৃথিবীর অভিব্যক্তিকে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। পৃথিবীর বাস্তবতাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং শিল্পকর্মে একটি নতুন বাস্তবতার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সবার জীবনে সকল প্রকার বিষয়ের অস্বীকৃতি এবং যুক্তির বিচলতা সকল শিল্পীদের মধ্যে একটি নতুন ধরনের দম্ভ এবং অহমিকায় সঞ্চার করল যার ফলে তাঁরা নানাবিধ কৌশলকেই শিল্প হিসেবে আখ্যাত করলেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যা নব প্রক্রিয়াগত কৌশল ছিল পরবর্তী পর্যায়ে তাই একটি শিল্পগত যুক্তিতে সমর্থিত হল। মানুষের জীবনে দু'টি সত্য খুব প্রবল। যে সত্য অবস্থার মধ্যে আমরা নিত্য অবস্থিত, তার একটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ এবং অন্যটি হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত। মাধ্যাকর্ষণ এবং পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে বহুকাল পর্যন্ত চিত্রকর্মে একটি যুক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এর ফলে কোনো বস্তুর দণ্ডায়মানতা অথবা সমান্তরালতা মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মে নির্মিত হত। কিন্তু আধুনিক কালে শিল্পীরা এ উভয় সত্যকেই ভেঙে ফেললেন। ক্যানভাসের মধ্যে পৃথিবীর সকল উপাদানগুলোই আবর্তিত হতে লাগল। মার্ক শাগালের হাতে মানুষ মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। ইউরোপীয় শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন বাস্তব জীবনের ভঙ্গুরতাকে নিছক ভঙ্গুরতায় রূপান্তরিত করতে। সুতরাং তিনমাত্রার বস্তু দু'মাত্রায় রূপান্তরিত হল, বহু বস্তুর স্থানবিচ্যুতি ঘটল এবং আলো বিভিন্ন বর্ণ-রূপে প্রবাহিত হতে লাগল।

চিত্রকর্মের একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে প্রকাশময়তা অর্থাৎ শিল্পী যা অনুভব করেছেন তা তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা অর্থাৎ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা। প্রাথমিকভাবে এবং আমি বলব চূড়ান্তভাবে শিল্পকর্ম হচ্ছে শিল্পীর বোধ এবং সিদ্ধান্তের মহত্তম প্রকাশ। দুর্বল শিল্পী হলে তার প্রকাশক্ষমতা থাকবে না এবং সার্থক শিল্পী হলে তা থাকবে। প্রকাশক্ষমতার কারণেই একটি শিল্পকর্ম কালাতীত হয়। তাই আমরা দেখি প্রকাশের সফলতায় কত শিল্পী যুগোত্তীর্ণ ও কালজয়ী। একটি শিল্পকর্ম তখনই শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রাহ্য যখন আমরা অনুভব করব একটি দৃশ্যগ্রাহ্য আকৃতিতে শিল্পী তাঁর চিন্তা, ধারণা ও আবেগকে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই দৃশ্যযোগ্য আকৃতি গড়ে ওঠে দেশ, কাল, সময়, ইতিহাস এবং শিল্পীর সমাজগত চেতনায়। আমাদের দক্ষ শিল্পীরা শিল্পপ্রক্রিয়ার একটি প্রত্যয় দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আবদুর

রাজ্জাক, আবদুল বাসেত এবং মুহম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, প্রায় সকলের সম্পর্কেই এক কথা বলা চলে। আবদুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত এবং মুহম্মদ কিবরিয়া একই কুশলতাকে বিচিত্রভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ছবিতে রেখা এবং রং, প্রধানত রং-এর প্রলেপনগুলো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মূলত এগুলো রং-এর অর্থবহতা এবং সেই অর্থবহতার মধ্যে একটি আবেগের প্রতিষ্ঠা। এই কৌশলগুলো বিদেশে, প্রধানত ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে জাপানে ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়েছে এবং সেসব ক্ষেত্রে শিল্পীদের শিল্পগত সিদ্ধি অনন্যসাধারণ। এই ভঙ্গিটা আমাদের শিল্পীরাও আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশলকে যথার্থভাবে কম্প্রিহেন্ড (Comprehend) অথবা সর্বতোভাবে বোধের আয়ত্তে এনে বিমূর্ত ফর্মের মাধ্যমে আপনাদের কলাকৌশলকে প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ জাহাঙ্গীর রঙের প্রবহমানতাকে সমান্তরাল বিন্যাসে কিন্তু আবর্তিতরূপে একটি মুক্তক কম্পোজিশনে উপস্থিত করেছেন। আমি মুক্তককে বলছি ওপেন কম্পোজিশনের কথা যেখানে ক্যানভাসের সীমারেখার মধ্যে ছবির অনুভূতিটা সম্পূর্ণ হয় না, দু'পাশের প্রবাহগুলো ক্যানভাসের বাইরেও আছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ বিস্তারিত দৃশ্যপটের মাঝখান থেকে একটি অংশ শিল্পী উদ্ধার করেছেন মাত্র কিন্তু যে অংশ উদ্ধৃত হয়নি তাও আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে সাড়া তোলে। এ পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে বিচিত্র রং-এর দৃশ্যপট উন্মোচিত হচ্ছে। একটি দিবসেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রং-এর বিচিত্রতার কত লীলাচাপল্য। কখনও লাল, কখনও কমলা, কখনও হলুদ, কখনও সোনালি, কখনও নীল, কখনও বেগুনি, কখনও সবুজ, কখনও পিঙ্গল, কখনও সাদা এবং এ ভাবে অজস্র প্রতিভাসে রং-এর যে কত নৈমিত্তিক লীলা তা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। রং-এর দ্বারা বস্তুর যেমন পরিচয় তেমনি রং-এর সাহায্যেই আকৃতির গঠন, আবার রং আপন অস্তিত্বে চিরকাল বিদ্যমান। শিল্পীরা কখনও কখনও রংকে বস্তুর পরিচয় সূত্রে ব্যবহার করেন, যেমন ঘাসের রং সবুজ, নির্মেঘ আকাশ নীল, অস্তগামী সূর্য লাল, গাছের ছায়াপাতে নদী কখনও সবুজ অথবা আকাশের নীলাভ ছায়ায় নীল। তাছাড়া আবার কম্পমান প্রবাহিত সূর্যরশ্মিতে আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন স্বরূপ ধারণ করে যার ফলে বস্তুর আকৃতি বিচিত্র বিভাজন ঘটে। আবার রং-এর নিজস্ব সত্তায় শিল্পকর্মে শুধু রং-এর বিন্যাসকেই উপস্থিত করা যায়।

আমাদের দেশে শিল্প-পরীক্ষার ব্যাপকতার কথা চিন্তা করলে আমিনুল ইসলামের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তিনি সকল প্রকার শিল্পমাধ্যমকে কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। প্রথম দিকে জলরং এবং তেল রঙের কাজ করতেন পরে গ্রাফিকসের নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন, অবশেষে মোজাইক এবং বর্তমানে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে এরকম আয়নার বিভিন্ন ডিজাইন তিনি তৈরি করেছেন। আয়না বা মিরর যার মধ্যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার করবার কৌশল আমেরিকার হয়েছে, ইউরোপে হয়েছে। এই কৌশলের বিশিষ্টতা হচ্ছে, এখানে দর্শককে ফর্মের সঙ্গে অথবা ডিজাইনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়। অর্থাৎ যিনি দেখছেন তিনি তাঁর বিচিত্র ভঙ্গুর প্রতিমূর্তির মধ্যে দিয়ে একটি ফর্মকে আবিষ্কার করছেন। আমিনুল ইসলামের সাম্প্রতিক কিছু পরীক্ষা এই আয়না নিয়ে। কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পকর্ম প্রধানত তেল রং-এর এবং সেখানে তিনি একই ক্যানভাসের মধ্যে একই ধরনের রেখার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একটি ডেকোরেটিভ ডিজাইন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, তা সে গ্রাম হোক, রিকশা হোক অথবা বন্যাপ্লাবিত একটি অঞ্চল হোক। তিনি ডিজাইনের কর্মে একজন সার্থক শিল্পী বিভিন্ন পুস্তকের

মলাটে ডিজাইন পুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তিনি নির্মাণ করতে পারেন।

একজন প্রবীণ শিল্পীর কথা আমি এখনও বলিনি। তিনি এস.এম.সুলতান। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের গ্রামের সমাজজীবনকে উপস্থাপিত করা। অত্যন্ত বলিষ্ঠ-দেহী কৃষককুল অথবা কৃষকরমণী, কৃষিকর্মে নিযুক্ত প্রাণী, উর্বরা ভূমি এবং বলিষ্ঠ ধানের মঞ্জরী সবকিছুকে একাকার করে তিনি একটি সজীবতার উত্তরণ খুঁজেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, এ সজীবতা হচ্ছে আমাদের কাম্য সুতরাং তিনি কাম্যের প্রসাদকে আমাদের সামনে উপস্থিত করছেন। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে বাস্তবদৃশ্য আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ সজীবতাকে উদঘাটন করে না। বিপুল আয়তনের ক্যানভাস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এস.এম. সুলতান যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। এ সমস্ত চিত্রের মধ্যে সমাজব্যবস্থার মুখ্য কোনো সমালোচনা নেই, একটি কাম্য অবস্থার উদঘাটন আছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এখানকার আঁকাবাঁকা নদীপথের ছবি, ধানক্ষেত ও বনভূমির সজীব সৌভাগ্য জলরং-এ কত সুন্দরভাবে যে ধরা পড়ে তার পরিচয় জয়নুল আবেদিনের কিছু ছবিতে আছে। তবে বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের মতোই আমাদের দেশেও তেলরং-টি প্রাধান্য পাচ্ছে, তার কারণ যে কোনো রং-এ আভাগত বৈচিত্র্য যাকে ইংরেজিতে টোন (tone) বলি এবং ঘনত্বের বিভিন্ন তারতম্য তেলরং-এ সহজে ফুটিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন স্বভাবের প্রিন্ট-এ বা ছাপ-চিত্রেও আমাদের শিল্পীরা দক্ষতা দেখাচ্ছেন। ছাপচিত্রের মধ্যে এচিং, কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফ এ তিনটি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে বেশি। এ ছাড়া আমাদের কয়েকজন তরুণ শিল্পী সম্প্রতি টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কাজে হাত দিয়েছেন। কেউ কেউ বোল্ডার বা পাথরের টুকরো ভেঙে আকৃতি গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন আবার কেউ কেউ কংক্রিটের ঢালাই ব্যবহার করে কিছু কিছু বিমূর্ত আকৃতি গড়েছেন আবার লোহার এবং তারের বিপর্যস্ত ব্যবহারের আধুনিকতায় কিছু শিল্পকর্ম তৈরি হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশ-ক্ষমতা, প্রবৃদ্ধি, এবং কৌশলগত সার্থকতা এখনও ক্ষীণপ্রাণ। তবে সম্ভাবনার কপাট যে উন্মুক্ত হয়েছে এটাই বড় কথা।

আমাদের দেশে শিল্পচর্চার সূত্রপাতে ১৯৪৮ সালে মরহুম জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্পসম্ভাবনার দ্বার প্রথম উন্মুক্ত করেছিলো। তাঁর সমর্থনে, উৎসাহে, ধৈর্যে এবং ক্ষমতায় এখানকার শিল্পসত্তা শুধু যে উন্মোচিত হল তাই নয় নব নব প্রক্রিয়ার বিচিত্র পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আধুনিকতার মুক্তাঙ্গনে এসে উপনীত হল। তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছিলেন আনওয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, খাজা শফিক আহমদ এবং কামরুল হাসান। 'ঢাকা আর্ট স্কুলের' প্রতিষ্ঠা হল। ক্রমান্বয়ে শিল্পকর্মে অনেক নতুন কুশলী শিল্পী এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম দশকে (১৯৪৮-৫৮) এলেন মুহম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, শফিকুল হোসেন, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুল রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, দেবদাস চক্রবর্তী এবং আবদুল বাসেত। এর পরের দশকে যাঁরা শিল্পচর্চায় উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছেন তাঁরা হলেন হাশেম খান, আবু তাহের, নিতুন কুণ্ডু, রফিকুননবী, রশীদ আহমদ, কালিদাস কর্মকার, আবদুস সাত্তার, শহীদ কবীর, স্বপন চৌধুরী, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুরুল করীম, এ.কে.এম. কাইউম, এ.এফ.এম. আলমগীর, অলক রায় এবং ফরিদা জামান।

আমাদের শিল্পসাধনায় রফিকুননবী একটি নতুন ধারার উন্মোচন করেছেন। সমাজজীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মানুষে মানুষে যে ব্যবধান এবং সে-ব্যবধান থেকে উত্থিত প্রশ্নরাজি

তাঁর কার্টুনের বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ শিল্পপ্রক্রিয়ায় তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং তার মাধ্যমে যে সফলতা পেয়েছেন তা যথাযথই প্রশংসনীয়।

শিল্পীরা সকল প্রকার আবেগকেই গ্রহণ করেন। সে আবেগ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অথবা উপকরণ থেকে আসে। পিকাসো বলেছেন, "The artist is a receptacle for emotions that come from all over the place; from the sky, from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spiders web...... A painter, paints to unload himself of feelings and visions; (conversation, translated by Myfanwy Evans and published in the painter's object"।

আমাদের দেশের শিল্পীরাও শিল্পীসত্তার এ স্বভাব অবহিত আছেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

উৎস: গ্রন্থ: শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য।

[লেখক: পরলোকগত। কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। পরিচালক, বাংলা একাডেমি (১৯৬০-'৬৬)। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬-'৭১)। উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২-'৭৫)। উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫-'৭৭)। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (১৯৮৯-'৯০)।]

আমাদের চিত্রশিল্প: বিকাশ ও পরম্পরা

ফরীদুল আলম

সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার থাকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সৃষ্টিই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পঞ্চভূত থেকেই মানবদেহের উদ্ভব–কিন্তু পঞ্চভূতের কোনো অংশকেই বিচ্ছিন্নরূপে মানবদেহে খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন শিল্পী বহু বিচিত্র উৎসের ধারায় তাঁর ঘট পূর্ণ করেন–শিল্পীর আহরিত সকল তীর্থসলিল অবশেষে একটি অমৃতধারায় রূপান্তরিত হয়ে তাঁর শিল্পকর্মে উঠে আসে। এখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা। সমগ্র শিল্পসৃষ্টিকে মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে শিল্পীর স্বকীয়তায় উত্তরণের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। মানবজীবনে নান্দনিক সৌন্দর্যের বিকাশের সঙ্গে শিল্পরুচির বিকাশের প্রচেষ্টা করে যাওয়াটা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শিল্পঐতিহ্য আছে। কিন্তু প্রাচীন শিল্পকলা ছিল প্রধানত ধর্মাশ্রিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজতান্ত্রিক অভিজাত-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষে শিল্পী নিছক আপন আনন্দের জন্যে বা জনজীবনের প্রতিচ্ছবিকে ধরে রাখার জন্যে শিল্পচর্চা করার সুযোগ পেতেন না। শিল্পীদের সর্বদাই রাজদরবারের কিংবা অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আধুনিক কালের মতো ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার বিশেষায়নের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীরও প্রবেশাধিকার ছিল না। শিক্ষার প্রতিটি শাখা এবং প্রত্যেকটি বৃত্তিই ছিল পরিবারকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। প্রত্যেকটি বিশেষ শিক্ষাধারা বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ নানা প্রকার সংস্কারও সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে এই রীতিই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শিল্পও কালক্রমে ব্যক্তিমানুষের আত্মবিকাশের মাধ্যম না হয়ে পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত শিক্ষা বা বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগ প্রাচীন ভারতবর্ষে নিতান্তই কম ছিল। শিল্পের সহায়তায় কখনোই বৃহত্তর জনসমাজের রুচির প্রকাশ বা রুচি গঠন করা সম্ভব হয়নি, তবুও শিল্পের দ্বারাই পরোক্ষভাবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও সমাজের বাহ্যিক আকৃতির পরিচয় দেয়া আংশিকভাবে সম্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষে এহেন অচলায়তনের ধারাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যে যেমন বহু মহান বস্তু ছিল, তেমনি ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসে অনেক ভাঙাগড়া, উত্থানপতন ও ধ্বংসের ঘটনাও বহুল পরিমাণে ছিল, বিশেষত উত্তর-ভারতে। বহিরাগত আক্রমণকারী, বহু রাজ্যলোলুপ ও ঐশ্বর্যলোলুপ ব্যক্তিদের বারংবার আঘাতে ভারতবর্ষের জনজীবন বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু শতবার। সেইসঙ্গে বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই উপমহাদেশের শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু প্রতিবারই সেই ধ্বংসস্তূপের উপরেই পুনরায় গড়ে উঠেছে নতুন শিল্পকলা, নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এসকল কারণে প্রাচীন শিল্পের অনেক রীতি বা ধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে পারিবারিক ঐতিহ্যের নিভৃত নিরাপদ আশ্রয়কে অবলম্বন করে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং তার কোনো ব্যাপক প্রচারও সম্ভব ছিল না। শিল্পকলা বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ গোষ্ঠী বা পরিবারকে কেন্দ্র করে দীর্ণবিদীর্ণ অবস্থায় তার অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। শিল্পকলার বহু ধারাই অন্তঃসলিলা নদীর মতো আত্মগোপন করেছিল। এই সবগুলো ধারার মধ্যে সমন্বয়ের সুযোগ দীর্ঘদিন উপমহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে পাওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে একসময় শিল্পরসিক মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্পকলা ও পারস্যদেশীয় শিল্পকলার সমন্বয়ের সাহায্যে এই অঞ্চলের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে অধিকতর ঐশ্বর্যশালী করে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে–তবে সেই শিল্পরসিক শাসকবর্গ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহ্যের সবগুলো দিক সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত হবার সুযোগ পাননি।

এই ধরনের সংকীর্ণতার ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় প্রথমে ক্ষীণ ধারায় ও প্রবল বেগে এ অঞ্চলের শিল্পকলা নতুন এক ধারার শিল্পকলার সংস্পর্শে আসে। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। তার প্রভাব পড়েছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও। জনজীবনে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাব ঘটছিল পদে পদে। শিক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, এবং এ ক্ষেত্রগুলোতে অনিবার্য ধ্বংসের অশনিসংকেত দৃশ্যমান হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যগুলো শক্তিশালী হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিদেশি বণিকের মানদণ্ড একদা পরিণত হয়েছিল প্রভুত্বের রাজদণ্ডে।

বিদেশি শাসকেরা তাদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে নিতান্ত কনিষ্ঠ করণিক তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ অঞ্চলে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই সূত্র ধরেই শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের উত্থান সূচিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে নতুন ধরনের যুগচিন্তার উন্মেষ ঘটে। তৎকালীন ইউরোপে প্রচলিত চিন্তাধারার প্রতি ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষিত জনেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপীয় চিন্তাধারার উদার (তৎকালীন মানদণ্ডে), অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ভারতীয় শিক্ষিত জনদের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তিগণ এ অঞ্চলে নব-কর্মোদ্যমের সঞ্চার করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজে সমাজসংস্কারের ধারা প্রবাহিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজোয়ার এনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শেষকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকর্মে এসে এই ধারা পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত মানুষের অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশি মিশনারিদের ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নতুন ধরনের পরিচ্ছন্ন ধর্মাচার আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্রাহ্মসমাজ, এবং রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। দেশীয় সংস্কৃতির সবকটি শাখাতেই একটা পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। আর ঐতিহাসিক কারণে শহর কোলকাতা-ই এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। এই বঙ্গ অঞ্চলেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে পরাজিত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অধিকার দখল করে নিয়েছিল। হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে নবাবি শাসনের সূত্রে মোগল সংস্কৃতি পূর্বেই এখানে কিছুটা প্রসার লাভ করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, গ্রিস ও রোমের দর্শন, পশ্চিমি শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাবও এ অঞ্চলে প্রসার লাভ করল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে ভারতে মধ্যযুগীয় অবস্থার অবসান ঘটতে শুরু করল; শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদী ধারণা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে এই জাতীয়তাবাদের আদর্শ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। আধুনিকতায় বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষিত শিল্পী রবিবর্মা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে উপমহাদেশীয় শিল্পকলার অবক্ষয়ী অবয়বে পরিবর্তন আনতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো নতুন রীতি সৃষ্টি করেননি। তিনি প্রাচ্যের কাহিনী অবলম্বন করে পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কন শুরু করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার ভুবনে তাঁর এই রীতি নব-পথপ্রদর্শকের স্থান অধিকার করতে না পারায় তাঁর আঁকা চিত্রের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। তবু পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে রবিবর্মার চিত্রগুলো অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজের নানাক্ষেত্রে কিছুটা আধুনিক ও তৎকালীন মানদণ্ডে প্রগতিশীল চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হলেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধীর গতিতে আধুনিকতা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ঘটে। এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। অবনীন্দ্রনাথ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিত্রাঙ্কন শুরু করেছিলেন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে নিজস্ব পথের সন্ধানে এগোতে হয়েছে। বিংশ শতকে 'বেঙ্গল স্কুল'- এর সূচনার মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দৃশ্যগ্রাহ্যতা লাভ করে।

ভারতীয় শিল্পকলার ভিত্তিমূলে যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল সেই ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ সচেতন থেকে তাঁর ছাত্রদের শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ, ইতিহাস আর অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। মধ্যযুগীয় গণ্ডিবদ্ধতা ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছাত্রদের চিত্ররচনার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্য তথা ছাত্রদের পরম্পরাগত অনুশীলনে বাধ্য না করে নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের এই স্বাধীনতা দেয়ায় পরিণামেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে নব্য-চিত্রশৈলীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং নন্দলালের মতো প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় শিল্পকলার জগতে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপরে স্থাপিত কিন্তু সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত, বিশ্বমানবতায় অনুপ্রাণিত, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলোর সমন্বয়ে যে নতুন শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটালেন সেই রীতিই পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল স্কুল' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই শিল্পরীতি পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর বিশ দশক থেকে ত্রিশ দশক সময়সীমার মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মগুলোও এই সময়েই অঙ্কিত। নন্দলালসহ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দের অনুশীলনেই 'বেঙ্গল স্কুল' রীতি তার পূর্ণ বৈভব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য নন্দলাল তাঁর গুরু-প্রদর্শিত পথে নব নব পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে 'বেঙ্গল স্কুল' ধারাকে আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সুষমা দানে এগিয়ে এসেছিলেন। আদর্শের ক্ষেত্রে নন্দলাল তাঁর গুরুর অনুসারী হলেও তিনি কোনোদিনই অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কনরীতির অনুকারী ছিলেন না। তাঁর স্বকীয় রীতির বিবর্তনের মধ্যে যে তিনটি ধারা লক্ষণীয় তার প্রথম রীতিটিতে অবনীন্দ্রনাথ- প্রভাবিত 'বেঙ্গল স্কুল'-এর ঐতিহ্যবাহী পুরাণ ও সাহিত্যাশ্রয়ী চিত্রগুলো রচিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে নন্দলাল যদিও অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ওয়াশ-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পদ্ধতির অবশ্যই পার্থক্য ছিল। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রে ব্যবহৃত স্বচ্ছ বর্ণের পরিবর্তে নন্দলালের চিত্রের বর্ণ অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ এবং অবনীন্দ্রনাথের হালকা স্বচ্ছভাবের পরিবর্তে নন্দলালের চিত্রে দৃঢ় গঠনমূলক ভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

নন্দলালের চিত্ররীতির দ্বিতীয় ধারায় তাঁর রেখাধর্মী চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রগুলো ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলো তাঁর বহু পরীক্ষানিরীক্ষার ফসল। অজন্তার গুহাচিত্র নন্দলালকে একদা প্রভূত প্রভাবিত করলেও এই দ্বিতীয় ধারার চিত্রগুলো রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক ও অসাধারণ। এই চিত্রগুলোতে নন্দলালের ব্যবহৃত রেখা একাধারে সরল ও দ্রুত এবং মূর্তিগুলোর পটভূমি সাদাসিধে; অথচ মূর্তিগুলোতে আলঙ্কারিক রূপ এবং বিন্যাসও বিদ্যমান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নন্দলালের 'সরস্বতী' চিত্রটি। নন্দলাল এই দ্বিতীয় ধারার রীতির মধ্যেই বহির্বিশ্বের রীতিরও আত্তীকরণ করেছিলেন। নন্দলালের 'স্বর্ণকুম্ভ' চিত্রটিতে মিশরীয় চিত্ররীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। এই দ্বিতীয় ধারার রেখা-বর্ণসংযুক্ত চিত্রে লোকশিল্পের প্রভাবও যথেষ্ঠ ছিল– যার উদাহরণ– 'হরিপুরার চিত্রমালা'।

তৃতীয় ধারার চিত্রে নন্দলাল দৃঢ় ও নিশ্চিত তুলি চালনার সাহায্যে চিত্ররচনা করছিলেন। এই ধারার চিত্রে নন্দলাল রঙের ছোপের সাহায্যে রূপগুলোকে পরিস্ফুট করলেও বর্ণকে তিনি আলোর সমার্থক হিসেবে কখনোই ব্যবহার করেননি। এই চিত্রগুলোতে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্ররীতির সাদৃশ্য এবং গরমিল উভয়ই লক্ষ করা যায়। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রে রেখার ব্যবহার নেই– রেখা এসেছে পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট যুগে– যদিও রেখার এত দৃঢ়তা সেখানেও পাওয়া যায় না। দৃঢ় রেখার

ব্যবহার নন্দলালের নিজস্ব সৃষ্টি। এই তৃতীয় ধারার কোনো কোনো চিত্রে জাপানি রীতির আত্তীকরণের নজির মেলে। 'গোপালপুর সমুদ্রের জেলে' চিত্রটিতে জাপানি প্রভাব লক্ষণীয়।

নন্দলালের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যচিত্র রচনা। ভারতীয় চিত্রঐতিহ্যের ধারায় এরকম দৃশ্য-চিত্রাঙ্কন পূর্বে ছিল না। নন্দলাল শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহ অবস্থানের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে গ্রামবাংলার রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধিরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নন্দলালের তৎকালীন অঙ্কিত চিত্রগুলোতে। এসকল চিত্রে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন-জাপান ভ্রমণকালে বৃহত্তর এশিয়ার শিল্প ও সাহিত্যের এবং দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি সেগুলোকে ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করে দেখারও বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে নন্দলাল চীনা কালি দ্বারা তাঁর আপন-সৃষ্ট 'টাচ্' রীতিতে চিত্ররচনা শুরু করলেন। এই রীতিটি তিনি চীনা সি-ই রীতির প্রেরণায় উদ্ভাবন করেছিলেন। এই চিত্রশৈলী নন্দলালের নতুন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন। এই ধরনের চিত্রগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনি নেপালি কাগজের উপর আঁকতেন। এই রীতির চিত্রে তিনি কোমল রেখার ব্যবহার করেছেন, যাতে তুলিচালনার কৌশলে চিত্রগুলোকে ঈষৎ সিক্তভাবের বলে মনে হয়।

নন্দলাল বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার রীতি বর্জন করে প্রতীকধর্মী রীতির প্রচলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় মঞ্চসজ্জার পরিবর্তনের ধারার সূচনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নন্দলাল বাটিক শিল্পের জন্য নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন যা ইন্দোনেশিয়ার পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র।

দুই

'বেঙ্গল স্কুল'-এর ধারাকেই অনুসরণ করে এ অঞ্চলের চিত্রশিল্প এবং চিত্রশিল্পীদের পথ পরিক্রমণ,– ক্যালকাটা আর্ট স্কুলের পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষার্থীগণও এই 'বেঙ্গল স্কুল'-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে নিজেদের সঞ্জীবিত করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পরে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ,– যা আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড,– এ অঞ্চলের চিত্রশিল্পীগণ নিজেদের প্রতিভার শিল্পরূপ প্রদান করতে এই 'বেঙ্গল স্কুল'–এর ধারার সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভূ-খণ্ডের স্বকীয়তা তাঁদের শিল্পকর্মে স্থান করে দিতে চাইলেন।

১৯৪৮ সালের আগে এদেশে কোনো চিত্রশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। পরবর্তী ২০টি বছর ধরে এক দুর্বার ঝোঁক এদেশের চিত্রকলাকে উন্নত মানে পৌঁছিয়ে দেবার লক্ষ্যে বেগবান থেকেছে। শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, ১৯৬৮ সালের মধ্যেই তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। এদেশের একাধিক শিল্পী জাতীয় ভিত্তিতে পুরস্কৃত হয়েছেন, এদেশের অসংখ্য চিত্র দেশ-বিদেশে সংগৃহীত হয়েছে, অনেক শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উল্লিখিত সময়কালে এ ভূখণ্ডের চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক ধারাটি হচ্ছে সমবিমূর্ত ধারা– এই ধারার বিষয়বস্তু নিসর্গ, জীবন ও জড়-জীবন। ইউরোপীয় ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিল্পধারা থেকে আঙ্গিকগত ও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য ও কৌশল ধার করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পী এদেশের গ্রাম বা নগরের জীবনধারাকে প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন, বাংলাদেশের নিসর্গকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুপরিচিত পশ্চিমা শিল্পধারা 'কিউবিজম' কিংবা আধা-জ্যামিতিক প্রকাশবাদী ধারাসমূহ থেকে কিছু

বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, আবদুর রউফ, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীগণ। নিসর্গ এবং জীবন উভয়ই এই ধারার চিত্রগুলোতে অত্যন্ত জড় প্রকৃতি নিয়ে কিংবা কাব্যিকভাবে উপস্থিত হয়েছে। অন্যদিকে পরাবাস্তববাদী ধারা অনুসরণ করে রশীদ চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন শিল্পী এদেশের গ্রাম্যজীবন এবং পৌরাণিক কাহিনী, কুসংস্কার ও ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের প্রতীকী ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন।

এ অঞ্চলের চিত্রকলার আরেকটি ধারা হচ্ছে লোকজ ঐতিহ্যের অন্বেষা বা লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা, যা কিনা এদেশের অধিবাসীদের জাতীয় ঐতিহ্যের অন্বেষারই প্রতীক। লোকজ শিল্পকলার গুণগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা করার চাইতে এর বাহ্যিক দিকটাই এই ধারার শিল্পকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ধারার শিল্পকর্মে লোকজ শিল্প পুনর্নির্মিত হল উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক শহুরে বাঙালি শিল্পীর হাতে। কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী এবং অনেকে এই ধারায় তাঁদের শিল্পকর্ম সৃজন করেছেন। জয়নুল আবেদিন সাময়িকভাবে লোকজ শিল্পের আঙ্গিকে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন, কিন্তু মূলত তিনি বাস্তবধর্মী এবং প্রকাশবাদী পাশ্চাত্যরীতিরই শিল্পী। তাই কামরুল হাসানকেই লোকজ ধারার নেতৃস্থানীয় শিল্পী বলা যেতে পারে। লোকশিল্পের সামগ্রিক সহজতা, কয়েকটি বিশেষ রং-এর প্রাধান্য, তলের দ্বি-মাত্রিকতা ও রেখার সজীবতা কামরুল হাসানের ছবিতে প্রতীয়মান হয়। কামরুল হাসান ১৯৭০-এর পূর্ব পর্যন্ত যে কয়টি আঞ্চলিক শিল্পধারা সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলোর চিত্র-বৈশিষ্ট্য আকর্ষণীয়।

এ দেশের সে সময়ের বাস্তবধর্মী চিত্রধারায় তথা রিয়ালিস্টিক ইমপ্রেশনিস্ট ধারায় চিত্রিত হয়েছে প্রকৃতি, জীবন, জীবনাংশ ও জড়-জীবন। জয়নুল আবেদিন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা এই ধারায় শিল্পকর্ম রচনা করলেও তরুণ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা রিয়েলিস্টিক ধাঁচে জীবন বা নিসর্গকে আঁকতে চাইতেন না। একাডেমিক ধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধুনিক শিল্পীগণ রূপান্তরবাদী বা বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনের রীতি পরিহার করে চলতেন।

স্বাধীনতাপূর্ব এ অঞ্চলের চিত্রকলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও শিল্পীদের পছন্দসই চিত্রধারা ছিল বিমূর্ত চিত্রকলা। এ অঞ্চলের চিত্রকলার সর্ব-সাম্প্রতিক পরিণতি ছিল বিমূর্ত চিত্রকলা। বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারাটি হচ্ছে এক্সপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদী চিত্রকলা। জার্মানিতে জার্মান এক্সপ্রেশনিজম-এর আওতায় প্রকাশবাদের সমবিমূর্ত ধারাটি গড়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণ বিমূর্ত চিত্রকলার অপর একটি ধারা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম বা বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারার আওতায় রঙভিত্তিক ফর্ম নির্মাণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পী এবং রাশিয়ার ভ্যাসিলি ক্যান্ডিনস্কি-র হাত ধরে এই ধারাটি অগ্রগতি লাভ করে। এই বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারা এবং জ্যামিতিকতা এ অঞ্চলের শিল্পীরা অনুসরণ করেছেন। তবে জ্যামিতিকতার চর্চা এ অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ অঞ্চলের শিল্পীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিবিড় প্রশিক্ষণের অভাবই সম্ভবত এই ব্যর্থতার পেছনে কাজ করেছে। আঙ্গিকনির্ভর ও রঙ-ফর্মভিত্তিক বিমূর্ত চিত্রশিল্প এ অঞ্চলে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শিল্পীরা রঙের চরিত্র নিরীক্ষা, টেকচার নিয়ে গবেষণা এবং নানা শিল্প-বহির্ভূত উপকরণ চিত্রকলার নির্মাণে ব্যবহার করেছেন, তাঁদের অনুসরণ করে একইরকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন এ অঞ্চলের শিল্পীগণ।

তিন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এদেশের চিত্রকলায় এক প্রচণ্ড উদ্যম লক্ষ করা যায়। সেসময় প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রচণ্ড অভাব থাকা সত্ত্বেও শিল্পীরা ছবি আঁকলেন, ভাস্কর্য নির্মাণ করলেন– একের পর এক প্রদর্শনী হতে লাগল। সেসময় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু এত প্রতিকূলতা ও অনুকূল পরিবেশের অভাব বিদ্যমান থাকলেও ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমার সংক্ষিপ্ত সময়কালে পনেরটি শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই ধারা ১৯৭৩ সালেও অব্যাহত থাকে। আরও পরে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়, – তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রদর্শনীর পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও প্রচুর শিল্পকলা প্রদর্শনী হতে থাকে। এ সময়ে এই অঞ্চলে তথা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে জয়নুল আবেদিন, এস.এম.সুলতান, কামরুল হাসান এবং আনোয়ারুল হকের একক চিত্র প্রদর্শনী। আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর এবং বহুসংখ্যক তরুণ শিল্পীর সামগ্রিক ও সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে এই সময়ে।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক চিন্তাধারার আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হওয়ার ফলে আজকের বাংলাদেশের চিত্রকলার যাত্রা শুরু করা গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের কারণে এদেশের চিত্রশিল্পীগণ বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের শিল্পকর্মে এর সুস্পষ্ট ছাপ দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের পূর্ববর্তী দশকটি জুড়েই এদেশের চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল বিমূর্ত ধারার শিল্পকর্ম। সেসময় সম্ভাবনাময় ও প্রতিষ্ঠিত তরুণ চিত্রশিল্পীগণ বেশিরভাগই বিমূর্ত ধারায় ছবি আঁকতেই আগ্রহ প্রদর্শন করতেন। নিসর্গ, অবয়ব, বস্তু অথবা কোনো ঘটনার প্রতিরূপ নির্মাণ করার চাইতে এ সময়ের শিল্পীগণ তাঁদের নিজস্ব ব্যথা, বেদনা, আনন্দ ইত্যাদি অনুভূতির বিমূর্ত রূপায়ণে অধিকতর মনোযোগী হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে এদেশে গণআন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়– এর ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি আমাদের শিল্পীগণ ১৯৭০ সালে অনুষ্টিত করেছেন 'নবান্ন' শীর্ষক ব্যাপক শিল্পকলা প্রদর্শনী। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এ প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার চেতনাই এই প্রদর্শনীর আয়োজনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বিজয়ের আনন্দ, মুক্তির তৃপ্তি ও বিভিন্ন হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের প্রধান শিল্পীদের শিল্পকর্মে অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠে এসেছে। পরিণত মধ্যবয়সী শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিবান তরুণ শিল্পীরাও তাঁদের ক্যানভাসে একই বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটালেন। বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতাও অনেকের শিল্পকর্মে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া নৃশংসতা, যুদ্ধপরবর্তী সময়ের সামাজিক অনাচার ও হতাশা এবং জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামকে ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম রচনা করেছেন কামরুল হাসান, এস.এম.সুলতান, আমিনুল ইসলাম, হাশেম খানদের পাশাপাশি স্বপন চৌধুরী, শেখর দে প্রমুখদের মতো নবীন চিত্রশিল্পীগণ।

স্বাধীনতার স্বাদে উদ্দীপ্ত শিল্পীগণের রোমান্টিক মানসিকতা প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে চিত্রকর্মের আঙ্গিকে, বিষয়-উপস্থাপনে এবং রঙের ব্যবহারে। কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবদুর রাজ্জাক হচ্ছেন

রোমান্টিক ধারার নিসর্গনির্ভর প্রধান দুই শিল্পী। এঁরা ব্যতীত রোমান্টিক ধারায় শিল্পকর্ম নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন আরও বহুসংখ্যক চিত্রশিল্পী। হাসি চক্রবর্তী, মাহবুব আখন্দ প্রমুখ শিল্পীগণ এই ধারার অনুগামী। তবে পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী কাইউম চৌধুরীর শিল্পকর্ম রচনার স্টাইলে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশ কিছু তরুণ শিল্পী কাজ করে গেছেন।

চার

এদেশের শিল্পকলার পুরোধা ব্যক্তিত্ব জয়নুল আবেদিন তাঁর ২৯ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বিশ্বনন্দিত স্কেচগুলো এঁকেছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় রসদ রিজার্ভ রাখার কারণে ব্রিটিশ সরকার লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে শোচনীয় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ জয়নুল আবেদিন এইসকল মানুষের মৃত্যুকেও করেছেন মহিমান্বিত। তাঁর দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলোতে মানুষের অসহায়ত্বের চাইতে অনেক বেশি জোরালো ও প্রস্ফুটিত হয়েছে অত্যাচারীর প্রতি ভ্রূকুটি ও ধিক্কার।

জয়নুল আবেদিনের শিল্পীসত্তা ধীরে ধীরে এদেশের শিল্পকলার রূপরেখা তৈরি করে যাচ্ছিল। তিনি ইউরোপীয় শিল্পধারায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করলেও নিজেকে সে ধারার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। জয়নুল আবেদিন তাঁর নিজস্ব ও মৌলিক অসাধারণ গতির সঙ্গে ইউরোপীয় ধারার সমন্বয় ঘটিয়ে এদেশের শিল্পকলার রূপরেখায় যুক্ত করেছেন নতুন মাত্রা। কালো, মেটে-হলুদ, বাদামি-জলপাই-সবুজ ইত্যাদি কয়েকটি রঙের সমন্বয়; তুলির মোটা আঁচড়, বিষয়ের অনুপুঙ্খতায় না গিয়েও রেখার বলিষ্ঠতা দিয়ে বিষয়কে বাঙ্ময় করার নিজস্ব কৌশল; কম্পোজিশনের যাথার্থ্য– এসবকিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম একান্তভাবেই মৌলিক ও বহিঃপ্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে।

প্রকৃতি আর প্রকৃতির সন্তানের জন্য অগাধ ভালোবাসার কারণে এই উভয়বিধ বিষয় তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হয়েছে। গণমানুষের জন্য আঁকা জয়নুলের ছবি কোনো মহলের কাছেই দুর্বোধ্য বলে প্রতিভাত হয়নি। তাঁর ছবির আড়ালে তাঁর অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল– মানুষের জন্যই মানুষের ছবি, যে ছবি সবাই বুঝবে আর অনুপ্রাণিত করবে আপামর জনগণকে। তাঁর মানসে এদেশের শিল্পকলার যে রূপাকৃতিটি দানা বেঁধেছিল সেটি ছিল এরকম– শিল্পকলা হবে সমকালীন, অথচ তা সোঁদা মাটির গন্ধ ছড়াবে; মাটির সন্তানদের কথা বলবে– যে শিল্পকলা দেখে সবাই চিনে নেবে এদেশের আবহমানের জনজীবন ও প্রকৃতিকে।

বিভক্ত উপমহাদেশের পাকিস্তানের পূর্ব অংশে ফিরে এলেন জয়নুল আবেদিন কোলকাতা থেকে। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে,– এবার নতুন বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল মানুষের রুচির দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি চাইলেন এমন কিছু শিক্ষার্থী, যারা ছবি আঁকাকে মহৎ কাজ হিসেবে গ্রহণ করে, সুন্দরের পূজারি হিসেবে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এদেশের মানুষের রুচির দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটাবে।

তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধুমাত্র একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রুচির দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যাবে না; এজন্য প্রয়োজন হবে একটি আর্ট কাউন্সিলের– যা পরবর্তীতে শিল্পকলা একাডেমির রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি নিজস্ব সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন ময়মনসিংহে আর অন্যতম সহায়ক হয়েছেন চট্টগ্রামে আঁদ্রে মালরো আর্ট গ্যালারি স্থাপনকর্মে।

বর্তমানের ন্যাশনাল মেডিক্যাল হসপিটাল, যা তৎকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল নামে পরিচিত ছিল, সেই ভবনের দুটি ছোট্ট কামরায় 'গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অফ আর্টস'- এর শিক্ষাক্রম শুরু হলেও ১৯৫১ সালে তা স্থানান্তরিত হয় সেগুনবাগিচায় এবং শেষে বর্তমানের চারুকলা ইন্সটিটিউট-এর অবস্থানে চলে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথমদিকের শিক্ষার্থীরা জলরঙ এবং রেখায় পারদর্শিতা অর্জন করলেও পাশ্চাত্য শিল্পধারার প্রতি তাঁরা প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শিল্পকলার তৎকালীন পাশ্চাত্য ঘরানাকে অনুসরণ করায় সে সময়ের চিত্রশিল্পীগণ এবং তাঁদের শিল্পকর্ম জনসাধারণের সম্পৃক্তি প্রায় হারিয়ে বসেছিল। এদেশের জনগণের কাছে বিমূর্ত চিত্রকর্ম একেবারেই দুর্বোধ্য। এদেশে বাস্তববাদী শিল্পকলার ধারা থেকে বিমূর্ত ধারার শিল্পকর্মে উত্তরণে কোনো ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা ছিল না– এ উত্তরণকে উল্লম্ফন বললে হয়তো ভুল বলা হবে না কেননা তা ছিল যেমন আচমকা, তেমনই দ্রুত-গতিসম্পন্ন। এমন একটা উত্তরণকে গ্রহণ করার মানসিক জমিন আমাদের জনগণের ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের তৎকালীন শিল্পকলার ভুবনে আমাদের শিল্পীদের খ্যাতি বাড়লেও তাঁদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের গ্রহণযোগ্যতার পরিসর হ্রাস পেতে থাকে। ছোট্ট অথচ অভিজাত একটি শ্রেণি শিল্পকলা আস্বাদনকে তাদের স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে গ্রহণ করে শিল্পকলার পৃষ্টপোষকতা করা শুরু করে দেয়। এতে করে কিছু শিল্পী হয়তো বেঁচে গেছেন (জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়ে) কিন্তু শিল্পকর্ম খুব একটা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেনি। বোধগম্যতার দিক দিয়ে আর মূল্য বিবেচনায়–উভয়তই এদেশের শিল্পকর্ম চলে যায় সাধারণের আওতার বাইরে।

এদেশের শিল্পকলা জনসম্পৃক্তি হারিয়ে ক্ষুদ্রতম একটি জনগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের উপাদানে পরিণত হোক– জয়নুল আবেদিনের চিন্তাভাবনায় তা ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে জয়নুল আবেদিন তাঁর আজীবনের অনুরাগ ও আনুগত্যের বিষয় লোকশিল্পকলার প্রসারে সচেষ্ট হলেন। ঢাকার অনতিদূরে সোনারগাঁও-এ লোকশিল্পকলার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন তিনি– যেখানে লোকশিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা গৃহীত হবে, বাংলার সম্পদকে নিজের করে গ্রহণ করবার মানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করবে সে কেন্দ্র।

বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের রূপকার এবং নির্মাতা জয়নুল আবেদিন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, তাঁর কাছে এদেশের শিল্পকলা ঋণী হয়ে থাকবে বহুকাল।

আমাদের শিল্পকলার অন্যতম পথিকৃৎ ও বলবান প্রতিনিধি সফিউদ্দিন আহমেদ ভারতবিভক্তির পূর্ব থেকে আরম্ভ করে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলা ও বর্তমানের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

এদেশের শিল্পকলা চর্চার সূচনা, নির্মাণ ও বিকাশের পর্যায়গুলোতে সফিউদ্দিন আহমেদ সক্রিয় থেকেছেন; শিল্পের নান্দনিক বোধকে সমুন্নত রেখে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌক্তিক ঔচিত্যবোধকে স্মরণে রেখে এক পরিশুদ্ধ শিল্পী হিসেবে তাঁর শিল্পপ্রয়াস নিবেদিত থেকেছে। ১৯৪৬ সালে সাঁওতালদের জীবনভিত্তিক 'দুমকা' পর্বের শিল্পকর্ম অভিভূত করেছিল শিল্পরসিক ও শিল্পসমালোচকদের। পঞ্চাশের দশকে 'বন্যার কবলে' পর্যায়ের চিত্রমালা কিংবা পরের দিকের 'জাল', 'ক্রুদ্ধ মৎস্য', 'ক্রন্দন' ও 'একাত্তরের স্মৃতি'– এসব চিত্রে তিনি ক্রমাগত উত্তরণের দিকে এগিয়েছেন। 'কপার এচিং' বা তাম্রতক্ষণ পদ্ধতির শিল্পকর্মে সফিউদ্দিন আহমেদ অসাধারণ কুশলতা দেখিয়েছেন। কল্পনাপ্রসূত মায়াময় অধ্যাত্মবাদী কোনো বিষয় নয়, কিংবা অতীন্দ্রিয়লোক নয়– তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হয়েছে বাস্তব জীবন। অভিব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক চিত্রনের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রতীক, রূপকল্পের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে সফিউদ্দিন আহমেদের শিল্পকর্ম।

[লেখক: প্রাবন্ধিক ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প: শিল্পী ও শিল্পরূপ

স ন্তো ষ গু প্ত

আমাদের শিল্পকলায় জীবন দর্শনের ভূমিকা

চিত্রশিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে শিল্পসমালোচক আর কলারসিকগণ কতগুলো আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তার মধ্যে ঘুরেফিরে যে কয়টা শব্দ সর্বদাই বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে সৌন্দর্য, সত্য, ভালোবাসা, ধর্ম এবং এদের সবটাকে ধরে রেখেছে "বিস্ময়" নামক অদৃশ্য অমোঘ একটা সূত্র। গুহাশিল্পের আবিষ্কারের পরও এ ধরনের কলারসিকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি, বরং আদিম শিল্পীর কলাকুশলতায়, রৈখিক বলিষ্ঠতায় ও ছন্দের সুষ্ঠুতায় দেখেছেন চিন্ময় সত্তার প্রকাশ। "অতৃপ্তির দোলায় মন দুলছে" আর তার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যই সৌন্দর্য উৎসরণের রূপ পেয়েছে তুলি আর রেখায় কিংবা গানে আর কবিতায়। অন্তত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের

এটা বোঝাতে চেয়েছেন। স্যার উইলিয়ম অরপেন সম্পাদিত "The outline of Art" এই সুবৃহৎ পুস্তকখানিতে "ম্যাজিক রুট" নামক অধ্যায়ে "প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শিল্পকলা" আলোচনার ক্ষেত্রে গুহামানবের শিল্পসৃষ্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন "The important thing to notice about this is that it is materially useless, it serves no biological purpose neither hunger nor sex. It does not make the shelter more secure to keep the body warmer or safe from harm."

কিন্তু আদিম মানুষ সেদিন সব ফেলে কেন বাইসন, হরিণ, ষাঁড় ইত্যাদি শিকারের জন্তু গুহাগাত্রে এঁকেছেন, তার জবাব দেননি। এরকম একটা ধারণা নিয়ে, আসলে তার বিচারে নামেন যে, সৌন্দর্যবোধ ও শাশ্বত সত্য ও ধর্মভাব শিল্পকলার প্রেরণা দিয়েছে।

ভারতীয় শিল্পকলার পুরোধা ব্যক্তি এবং সমালোচকরাও চিত্রশিল্পের বিচারে আরও কলাকৈবল্যবাদের আশ্রয় করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সুক্তকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করেন তারা, যেখানে বলা হয়েছে, 'শিল্পীই আত্ম-সংস্কৃতি, শিল্পই ছন্দোময় করে আত্মাকে।'

শিল্পের অন্যান্য শাখার বিচারে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণভঙ্গি যতটা সোচ্চার এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। তার কারণ, সামাজিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত যতটা সহজে গল্পে, উপন্যাসে, ব্যঙ্গরচনা ও কবিতায় রূপ দেয়া হয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াটা চলে অলক্ষে, দীর্ঘকালীন পরিশীলনে এবং প্রায়শই রূপকাশ্রয়ী হয়ে থাকে সুতরাং তা দর্শককে আশুকর্মে উদ্বুদ্ধ করে না। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। চিত্রের ভাষা সার্বজনীন হওয়া জনজীবনের প্রতিটি স্তরে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। বইয়ের মতো বুর্জোয়া যুগের প্রচুর উৎপাদকের পণ্য হিসেবে একে এখনো ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনের ধারাটির ক্রমপ্রসারের দিকে দৃষ্টি রেখেও এ কথা অকুতোভয়ে বলা চলে। এছাড়া রয়েছে তৃতীয় ও প্রধান একটি সমস্যা তা হল অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীর কাছে রঙ ও আলোছায়ার সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলন। সুতরাং খুব সচেতন না থাকলে উদ্দেশ্যটা গৌণ হয়ে ওঠে, রূপসৃষ্টির খুঁটিনাটি শিল্পীকে ব্যাপৃত রাখে বেশি। আর তাই পরবর্তী সময়ে সমাজবিচ্ছিন্ন স্থান ও কালের সমস্যা শিল্পীকে পীড়িত করে। শিল্পকলার বক্তব্য প্রকাশ করতে যেয়ে বর্ণসংহতি ও রুচি সর্বাগ্রে ভিড় করে। দর্শক আর শিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই উৎসারিত।

চিত্রশিল্পের প্রয়োজন কোথায় এক্ষেত্রে স্যার উইলিয়াম অরপেনের নেতিবাচক মন্তব্য আগেই তুলে ধরেছি। অপরদিকে আর্নস্ট ফিশার প্রশ্ন করেছেন, কেন লক্ষ লক্ষ লোক বই পড়ে, থিয়েটারে যায়, সিনেমা দেখে এবং জবাবে বলেছেন, মানুষ যা আছে বা যেভাবে আছে তাতে সন্তুষ্ট নয়, আরো পূর্ণতা তার লক্ষ্য। বাস্তব জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতা, অভাববোধ, আর প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াগুলো পর্দায়, মঞ্চে দেখে, চরিত্র চিত্রণে ফুটিয়ে তুলতে দেখে ব্যক্তিজীবনের চারিদিকে যে প্রতিকূলতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে 'আমিত্ব'-কে প্রকাশ করতে চায় সে।

শিল্প কাজের একটা রূপগত প্রকাশ, আর তাই তার আবির্ভাব মানুষের সমসাময়িক। গুহাশিল্প তার সাক্ষ্য। একথা এখানে মনে রাখতে হবে কাজটা মানবজাতির একটা বৈশিষ্ট্য। এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ যুক্তি-আশ্রয়ী জন্তু। আরও ভালো ভাবে সংজ্ঞা দেয়া চলে যে, মানুষ কর্মশীল জন্তু। মানুষ প্রকৃতির রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা বিজ্ঞান বলব এবং পরিণতিতে পেলাম শিল্পকলা, ব্যাপক অর্থে।

শিল্পের এই ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত থাকলে আমাদের দেশে শিল্প-আন্দোলনের সামান্য কয়েক বছরের ইতিহাস আর তার গতিধারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের শিল্প সৃষ্টির ধারা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা চলে। একটা আধুনিক অপরটি বহিরঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও আধেয়টি একান্ত দেশজ। শেষোক্ত ধারার অনুসারীগণ লোকশিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ওপর জোর দেন যতটা ঠিক ততটাই প্রথমোক্তগণ তার প্রতি আপাতনিস্পৃহ মনোভাব দেখান। আপাত বললাম এই জন্য যে, আধুনিক ধারার উগ্র অনুসারীগণও প্রাথমিক ভিত্তিকে কখনও অস্বীকার করেননি। বিমূর্ত ভাবধারার সোচ্চার সমর্থক ও মুখপাত্র শিল্পী হামিদুর রহমানের অঙ্কনরীতিতে পাটিশিল্পের আভাষ রয়েছে। আর একথা অনস্বীকার্য, আমাদের দেশে উপরোক্ত ধারা দুটির মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে আজও প্রশস্ত নয়। একটা অদৃশ্য ফগুধারার মতো সাদৃশ্য রয়েছে কোথাও। আর পূর্ববাংলার শিল্প আন্দোলনের জনক জয়নুল আবেদিনের শিল্পকলা যা আজও উচ্চকিত রেখেছে আমাদের চেতনার আয়োজনে তা ছিল প্রথমাবধিই মাটির কাছাকাছি। তার সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে এদেশের কর্মরত মানুষের প্রতি ভালোবাসা। স্বভাবতই রঙ ও আলো ছায়া পরীক্ষা-নিরীক্ষারত তাঁর উত্তর-সাধকদের মধ্যে তা অলক্ষে প্রবাহিত। এছাড়াই ইউরোপীয় বিভিন্ন রীতিবাদ শুধুমাত্র নতুন কিছু একটা করার বিদ্রোহাত্মকামনোভাব থেকে উৎসারিত। সমাজের কোনো অংশের প্রতিবাদকে ভাষা দেয়ার জন্য নয়।

এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় বিভিন্ন রীতিবাদ সম্পর্কে একজন সমালোচকের উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি, "তা সত্ত্বেও চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে আধুনিক চরমপন্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একান্তভাবেই মূল্যহীন এটা প্রমাণ করতে যাওয়া অন্যায়। কলাকৌশলগত ভাবে তারা চিত্রাঙ্কনের দিগন্তবিস্তৃত করেছেন এবং এক নয়া বাস্তবতার পথ খুলে দিয়েছেন; যেখানে কিউবিকবাদী শিল্পীদের দৃঢ় কাঠামো আর বাঁধাধরা অঙ্কনের পদ্ধতি সত্ত্বেও ইম্প্রেশনবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া বর্ণিল সৌন্দর্যের সাথে সম্মিলিত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাদের শিল্পকর্ম ইতিহাসের সকল ছাত্রের নিকট একান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। শিল্পের ক্ষেত্রে অনাগত ঘটনাবলি তাদের ছায়া ফেলেছে। ধৈর্যশীল পাঠক এই ইতিহাস গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পাবেন যে, শিল্পীদের পক্ষ থেকে সামাজিক শক্তিকে রূপদানের জন্য একটা প্রচেষ্টা আগাগোড়া ছিল। তাদের শিল্পকর্ম পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাদের উদ্দেশ্য অঙ্কনশৈলীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকলেও প্রায় সবটার মধ্যেই অন্তর্নিহিত ভাবে সংঘর্ষের বীজ ছিল। এইসকল ভোগবাদী, কিউবিকবাদী ও ফিউচারবাদী শিল্পীরা আমাদের শান্ত হতে দেয় না; তাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের কর্মে উদ্দীপ্ত করা। তাদের সকল ভাবধারাই শিল্পের প্রকাশমাধ্যমে এক অস্থিরতা, উত্তেজনা ও অবদমিত হিংস্রতাকে দেখিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার পূর্বে ইউরোপে তলে তলে তা ফুঁসে উঠেছিল।"

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে, ইউরোপে বিভিন্ন রীতিবাদের পিছনে সামাজিক শক্তি অলক্ষে হলেও সক্রিয় ছিল। আর আমাদের দেশের দ্বন্দ্বটা ছিল এবং এখনও রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি আর মুক্তবুদ্ধির মধ্যে। সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবাদ কিংবা জনজীবনের বিভিন্ন ধারাকে সাধারণভাবে দেখা হচ্ছে এক পর্যটকের মনোভাব নিয়ে। সুতরাং শিল্পীর নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাটাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রে কিংবা বাস্তব চিত্র হিসেবে যা উপস্থিত করা হচ্ছে– যথা শ্রমজীবী, মানুষ, ভিক্ষুক কিংবা নকশিকাঁথার, এসব পুনরাবৃত্তির চক্র। কিন্তু উপরে বর্ণিত শিল্পীদের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার অনুসরণে শৈল্পিক

নিষ্ঠার অভাব ঘটেনি কখনও। আর এই নিষ্ঠাই চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো শিল্পীর জনজীবনের সাথে সংযোগকে কখনও একেবারে ছিন্ন হতে দেয়নি। প্রসঙ্গ হিসেবে হামিদুর রহমানে "পুনর্জাগরণ", দেবদাস চক্রবর্তীর "হাসপাতালের সম্মুখে মৃত্যুর সারি", মুর্তজা বশিরের "প্রাচীর", মহসীনের "পুরাতন প্রেমপত্র", কামরুল হাসানের 'বিশ্রম্ভালাপ', 'স্নান' ইত্যাদি উল্লেখ করা চলে।

আবার পরোক্ষ প্রতিবাদও রয়েছে অনেক চিত্রে। আপাতভাবে তাকে শিল্পীর বর্ণরুচি কিংবা আলোছায়া নিয়ে কাব্য রচনার সমপর্যায়ে ফেলা চলে। গোলাম কিবরিয়ার কয়েকটি কম্পোজিশন এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে যেমন রাখে শিল্পী আমিনুল ইসলামের 'জ্বলন্ত সূর্য'। নিজেকে চারিপাশের মত্ততা, নীচতা, হীনতা থেকে দূরে সরে এক অনুচ্চ আশাকে রূপ দিয়েছেন।

জীবনের সৌন্দর্য খোঁজের উদ্দেশ্যে ক্রমেই আমাদের শিল্পীরা জীবনের প্রদাহমান প্রবাহ থেকে দূরে সরে আসছেন– একথা তাদের নিষ্ঠা ও সততার প্রতি আস্থা রেখে বলা চলে। শিল্পীকে অবশ্যই একথা আজ উপলব্ধি করতে হবে এবং তার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে যে, There is no reason in logic or morals why color and vitality at present found in their purest and most intense form in fine arts, should be confined to them while the reminder of life routine, slavish colorless and dull.

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের ধারা ও জনগণ

জনগণের দরবারে হাজির হবার স্পর্ধিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে আধুনিক চিত্রকলার সূচনা হয়েছিল বিপ্ল-বের যুগে। জনসাধারণের সম্মুখে চিত্রকলা উপস্থিত করার স্বাধীনতা ফরাসি বিপ্লবই প্রথম এনে দিয়েছিল। আর রাজদরবারের স্থানে চিত্রকলার জগতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার শিল্পীকে পুরনো মূল্যবোধ, একটা নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা রীতি আর সৌন্দর্যচেতনাকে মুক্ত করেছিল।

আধুনিক চিত্রকলার এই জন্মবৃত্তান্ত আজকের দিনে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখানেই যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন রীতিনীতি, শিল্পের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে বহু মতবাদের উদ্ভব ও প্রাবল্য মূলত পণ-গঙ্গোত্রীয় অফুরন্ত উৎসসঞ্জাত। ক্রমে কালের প্রবাহে উৎসমুখ থেকে দূরে চলে-আসা শিল্পীরা মগ্ন হলেন আপন চৈতন্য-সত্তার আলোকে। মনোমুখিতা আর অরূপলোকের সোনার হরিণ সন্ধানের সর্বব্যাপিতায় এল বিমূর্তরীতির বিভিন্নমুখি ধারা। শিল্পীর এই ব্যক্তিকতা-মণ্ডিত অন্তর্মুখিতার যুগে জনজীবনে চিত্রকলার স্থান ও সার্থকতা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় যেভাবে শিল্পীরা আপন আপন ধ্যনধারণাকে একটি নির্দিষ্ট দর্শনের মধ্যে অঙ্গীভূত করেন, চিত্রশিল্পীর বক্তব্য সেখানে বিচ্ছুরিত রবিরশ্মির মতো। তার ধারা, ধ্যান-ধারণার প্রকাশরীতি আলাদা-আলাদা সত্তা সমাজের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

সুতরাং এই রামধনু সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীর ভূমিকা জনজীবনের মিছিলের মুখই একমাত্র উপজীব্য করবে এমন ভাবনা অসঙ্গত। কিন্তু শিল্পীর সাথে সমাজের সম্পর্ক কী হবে, তা নিয়ে বিচারের মাপকাঠিকে সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত করার অস্বাভাবিক ঝোঁক থেকে এসেছে চিত্রশিল্পের সার্থকতার ও তার অর্থ বিচারের অন্বিষ্ট।

কিন্তু শিল্পীকে অবহিত হতে হবে যে, সুন্দর জীবনের তথা কোনো একটি মুহূর্তের সৌন্দর্যকে রূপময়তায় ব্যক্ত করার আগে জীবনকে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেন তা সুন্দরভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

আমাদের দেশে চিত্রশিল্প বিশ্বের দরবারে যেখানে ঠাঁই নিয়েছে, সেখানকার গবাক্ষ পথে ইউরোপীয় রীতির ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ণাভ মিছিল চোখে পড়ে। আমাদের চিত্রকলা একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক। পুরাতন ঐতিহ্যের পতাকাবাহী শিল্পীর তুলিও ব্যতিক্রম নয়। এটা কতখানি জনজীবনে তথা আমাদের পরিবেশপ্রসূত জীবনে অঙ্গীভূত, তা নিয়ে ভাববার আগে এই প্রবণতার কারণকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্ত আলোকের আয়োজন শিল্পের অন্যান্য শাখায় যে মাধ্যম নিয়েছে, তার সাথে মানুষের প্রতিদিনকার সম্পর্ক রয়েছে। যেমন সাহিত্যের ভাষা ও নাটকের ভাব প্রতিটি মানুষের ভাষা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত কিন্তু শিল্পীর তুলি-রং যখন তাকে প্রকাশের ভঙ্গিমায় টেনে আনে, তার সাথে দৈনন্দিন মানুষের বড় বেশি সম্পর্ক নেই। এখানেই ছবির বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই রঙের জগতে নিরঞ্জনা রাত্রির রূপ আর অসিত অমাবস্যার নিরূপা আলেখ্য তুলির টানে নিরবয়ব সৌকর্যের উদ্ভাসেই পরিতৃপ্ত। তার বর্ণনায় মানুষের বাচনভঙ্গির নির্বাচন নেই; তার ভাব একান্তই মানসলোকের অনুভূতিবহ।

চিত্রশিল্পের এই অনুভবনীয় স্বরূপটি মনে রেখেই আমাদের দেশের চিত্রকলার বিকাশ ও ব্যাপ্তির আন্দোলন বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমাদের মর্মমূলে যখন ভূমিকম্পের মতো নাড়া লাগে, তার বহিঃপ্রকাশে যন্ত্রণা, ঘৃণা, অজেয় আশা কিংবা দৃঢ়তার যে ছাপ ফুটে ওঠে, তার দৈহিক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়; কিন্তু অনুভবের আলোকে তাকে রূপ দেওয়ার ক্রিয়াটি সম্পূর্ণই ব্যক্তিকতাশ্রয়ী। চিত্রশিল্পীর চেতনায় তাই ধরা পড়ে, আর তার প্রকাশরীতি হয় রঙের সাশ্রয়ে সাংকেতিক ভাববহ। এজন্য তাকে প্রতীক খুঁজে নিতে হয়। নিঃসন্দেহেই এই প্রতীক কবিতার মতো কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে নিষ্পিষ্ট নয়। সুতরাং ভাষা আন্দোলন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির সকল শাখায় যেমন বরফগলা নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে জনপদকে সমৃদ্ধ করে চলেছে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রকাশমান নজির চোখে পড়ে না। বস্তুত রঙের আয়োজন এই নদীকে করেছে অন্তঃশীলা ফল্গুধারা। তার মানে এই নয় যে, আমাদের শিল্পীরা ভাষা আন্দোলন থেকে তাদের রসদ আহরণ করেছেন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা সবাই আহরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিষয়টি মোটেই এভাবে দেখা সঙ্গত হবে না। কারণ ভাষা আন্দোলনের ওপর যদি কোনো ছবি এঁকে বা একটা মিছিলের মুখ বলিষ্ঠ তুলির টানে পরিস্ফুট করে কোনো শিল্পী উপহার দিতেন, তবেই সেটা স্বীকৃতির একমাত্র অমোচ্য স্বাক্ষর হয়ে উঠতে পারে না। আসল কথা, চিত্রশিল্পীদের সাড়া আমাদের জীবনের রূপায়ণে এত ক্ষীণ কেন? কেন তারা মনোজগতের বাসিন্দাদের গভীর তমিস্র থেকে তুলে আনেন, যেন ঘুমিয়ে ভুলে যাওয়া কোনো স্বপ্ন– যার রূপ মনে পড়ছে না– বিষয়টিও এলোমেলো অর্থহীন, অথচ মিষ্টি করে রেখেছিল স্বপ্ন দেখার লক্ষণগুলো। অন্তত ঘুম ভাঙার পর তা মনে হয়। এর একমাত্র জবাব হল– চিত্রশিল্পীরা আসলে রঙের, আলোছায়ার সমস্যার নিরিখে জীবনটা দেখতে চান অনেক ক্ষেত্রে। জীবনচর্চাকে রঙে ও নিষ্পিষ্ট, দলিত-ক্রন্দিত অনুভূতিকে আলোছায়ার আঙিনায় টেনে আনেন না? কেন রক্ত রঙ হয়ে ঝরে পড়ে না? অথচ শিল্পীরা উদাসীন নন। দু'একটা উদাহরণ দিয়ে এটা পরিষ্কার করেছি।

শিল্পী হামিদুর রহমানের 'রি-জেনারেশন' ধ্বস্ত মানবতার আলেখ্য, দেবদাস চক্রবর্তীর 'হাসপাতালের সম্মুখে মৃত্যুর সারি' কিংবা 'নিঃসঙ্গ জেলের ভাবনা' এদেশের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। অবশ্যই তাদের বহু ছবি রয়েছে যার ভাব ও প্রকাশরীতি নির্বাক, প্রতিরূপ লজ্জী সম্পদে সমৃদ্ধ। অপর একজন শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন তার সাম্প্রতিক নির্বস্তুক চিত্র প্রদর্শনীতে:

Tender colour,
no violent reaction
for happiness of life.
Forget and forgive
time to love
to look and feel
to endure and forgive

অর্থাৎ জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উর্ধ্বে মানুষের মৌল মহৎ আবেগগুলোর রূপায়ণ তার লক্ষ্য।

নিঃসন্দেহে চিত্রশিল্পের ধারা এদেশে প্রবাহিত হচ্ছে অরূপ অবাঙমানস অগোচর রূপাতীতের সন্ধানে। এদের সমাজ থেকে এই বিচ্ছিন্নতার মূলে দুটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত এক নেতিবাচক প্রতিবাদকে তারা সম্বল করেছে দৈনন্দিন জীবনের অসঙ্গতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়ত যেখানে শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার পৃষ্ঠপোষক এদেশের ব্যাপ্ত জনসাধারণ; সেখানে চিত্রশিল্পের কোনোরূপ আর্থিক দিকটি এদেশের মাটিতে প্রশ্রয়ে পোষিত হয়নি। তার ক্রেতা বিদেশের 'কলারসিকরা' সুতরাং অচেতনভাবে হলেও শিল্পীর প্রতিভা লোকরঞ্জিনী হতে পারেনি একটি বাস্তব কারণে। কথাটা স্থুল মনে হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পকর্মের ক্রেতা এদেশের আপামর জনসাধারণ অথচ চিত্রশিল্পীদের কাছে সে সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। আমাদের চিত্রশিল্পের আন্দোলনকে আরও বেশি গণমুখীন করার ক্ষেত্রে এদিকটির প্রতি নজর দেওয়ার সময় এসেছে। চিত্রশিল্পীদেরও তাদের দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বেশি অবহিত হতে হবে। শিল্পের কোনো শাখাই জীবনকে অস্বীকার করে সৃষ্ট, পুষ্ট ও ব্যাপ্ত হয়নি। গুহাচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে যেমন সেদিনের প্রয়োজনবোধ তাকে জন্ম দিয়েছে। রূপ-ব্যাখ্যাতাদের কাছে তা শুধু 'ম্যাজিক আর্ট' হয়েই বাহবা কুড়িয়েছে, কিন্তু তার উৎস হল শ্রম। আজকের রূপদৃষ্টিও যেন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, রূপস্রষ্টারা যেন মেক্সিকোর শিল্পী সেকেরগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেছিলেন, "যৌবনে রঙের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন মেক্সিকোতে রেল ধর্মঘটের সমর্থনে আমরা একটা প্রস্তাব নিয়েছিলাম। দুয়ের মধ্যে আপাতত আদৌ কোনো যোগসূত্র ছিল না, কিন্তু একটা ঘটনা থেকে সেদিন চোখ ফেরাতে পারিনি।" কথাটা প্রত্যেক মহৎ শিল্পীরই অনুধাবনযোগ্য।

বাংলাদেশের চিত্রকলার সামাজিক ভিত্তি ও আধুনিকতার সমস্যা

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাস এদেশের গত ২৫ বছরের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারার সাথে সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার এর এখানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চিত্রশিল্পের গোড়া পত্তনের পিছনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং তৎকালীন তাঁর সহকর্মীদের অবদান আমরা বারংবার অকুণ্ঠভাবে উচ্চারণ করি। কিন্তু যে কথাটা কখনো বলা হয়

না, তা হল এখানে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তাকে জনজীবনে মূর্ত করার জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম। ব্যক্তিগতভাবে যে খ্যাতি জয়নুল আবেদিন অর্জন করেছিলেন দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো এঁকে এবং তৎকালীন তাঁর সহকর্মীদের যে ঐতিহ্য ও নিষ্ঠা নিবিড় হয়েছিল এগুলোকে সরাসরি লঙ্ঘনের দুঃসাহস ছিল না তৎকালীন শাসকদের। বস্তুত তাদের কাছে যা ছিল ড্রইং–এর স্কুল, তাই শিল্পকলার পীঠস্থান হিসেবে কালক্রমে গড়ে উঠেছে। তৎকালীন শাসকশ্রেণির এর পিছনে যদি কোনো অবদান থাকে, তবে তা নেহাতই অচেতন এবং বাণিজ্যিক পণ্যের তাগিদ। এছাড়াও মধ্যযুগের মোগল আর্টের প্রতি শাসকশ্রেণির যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তা মোগল আর্ট বলে নয়, মুসলিম বাদশাহি আমলের কীর্তির প্রতি সাজুয্যগত চেতনার পশ্চাৎমুখীনতার দ্বারা আক্রান্ত। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাবলির আঙ্গিক ও শিল্পীরীতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। এখানে বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণজাত প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বস্তরে নাড়া দিয়েছিল। চেতনায় দাগ কেটেছিল অনপনেয়। কিন্তু সেকথা থাক। শিল্পী জয়নুল আবেদিন এবং বিভাগপূর্বকালে কলকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যে চিত্রশিল্পীগণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন, যেমন শিল্পী কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল হক প্রমুখ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বাংলার নিজস্ব জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যে তাঁরা লালিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জীবনের মূল্যবোধের ভাঙচুরের পূর্ব পর্যন্ত যে ভিত্তি তাঁদের জীবনে প্রবণতা এনেছিল, তার দ্বন্দ্ব ছিল ঘরোয়া, আন্তর্জাতিক নয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির সাথে বিশ্বজীবনের তরঙ্গকে মিলানোর তাগিদ তখনও তেমন তীব্র নয়। অন্তত চিত্রশিল্পীদের ব্যক্তিক চেতনার ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) চিত্রশিল্পের বিকাশের প্রথম পর্বটি ছিল তাই একান্ত নিজস্ব সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ঘরের কোণ, ঝড় উঠেছে, নিভু নিভু দীপে অন্ধকার প্রবল হয়েছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব কখনো আপন গণ্ডির বাইরে যায়নি। এমনকি, ভাষা আন্দোলন সত্ত্বেও নয়। কিন্তু এদেশের শাসকশ্রেণি বৈদেশিক সাহায্যের নামে একান্ত অনুষদ হিসেবে সে উচ্ছল জীবনযাত্রাকে নিয়ে এল উপরতলার কোঠায়, ধর্মীয় অনুশাসনের বিধিতে নিচের তলাকে বেঁধে তাকে সীমিত করতে পারেনি। সুতরাং নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টির প্রসারও ঘটেছে। অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে আমরা এযুগের পারানি নৌকায় পা দিলাম। ঢাকা যেমন আর মফস্বল শহর রইল না, কলকাতায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একান্ত প্রেক্ষিত ছিল, এখানে তা অনুপস্থিত। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে গ্রামীণ সমাজের সংযোগ নিবিড়, কারণ তার পিছনে ২০০ বছরের নিজস্ব গণ্ডির সীমাবদ্ধতা নেই, ব্রিটিশ শাসন শোষণ সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতো। আমাদের চিত্রশিল্পেও তাই দেখা গেল নৌকা, শহরের গলি, রাঙামাটির বন্ধুর পথকে আঁকড়ে উঠে এলেও সাথে সাথে আন্তর্জাতিক শিল্পরীতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আক্রান্ত হচ্ছে শিল্পীর মনন ও ক্যানভাস। মুক্তি পেল কল্পনার ঐশ্বর্য। বিষয়বস্তুর ঘরানা রীতি মিতালি করল নির্বস্তুক আঙ্গিকে।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন যে মানুষ আর প্রকৃতির বিমুগ্ধ সহচর, তুলি যেখানে স্থূল বাস্তবের কাছ থেকে আহরণ করে রোমান্টিক আত্মগত হয়ে ওঠে, সেখানের লোকজ রীতিও কিন্তু ঠিক তার উপজীব্য নয়। তার মানুষ এবং নিসর্গ যেন শিল্পী সেজান-এর শিল্পকর্মের মতোই প্রতিনিধিত্বশীল। আবহমানতা নয়, প্রবহমানতা তার ধর্ম। এখানে শিল্পী কামরুল হাসানের সাথে তাঁর পার্থক্য। এদিকে কামরুল হাসান উজ্জীবন করে চলেছেন লোকজ রীতি ও ধারাকে এবং তার সাথে আধুনিক শিল্পীরীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এভাবেই গতিশীলতা এসেছে তাঁর চিত্রে। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের

পিছনে ধারাবাহিকতা বিভাগপূর্বকাল থেকে চিহ্নিত করার প্রয়াস, তা ছিল মগ্ন মৈনাকের মতো। কারণ, শিল্পকলার অন্যান্য ধারার মতো এর প্রবহমানতা জনজীবনে সামনে আসেনি এবং চিত্রশিল্পের ধারাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা যেহেতু ইতিপূর্বে ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক, তাই বিভাগোত্তর কালে চিত্রশালার অনুপস্থিতি এর ইতিহাসক্রমতা সাধারণ্যে অনুপস্থিত বলেই এমনটি হয়েছে।

তরুণ শিল্পীদের আবির্ভাবকে তাঁদের শিল্পধর্মকে তাদের আঙ্গিকে, ইউরোপীয় রীতি ও ভাবধারায় আন্তর্জাতিকতার প্রাবল্যকে শুধুমাত্র আধুনিকতার প্রবল স্রোতের প্রচণ্ড আক্রমণ বলে মনে হয়। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে এ আলোড়নকে গ্রহণ করার মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই দেশের জনজীবনে বৈষয়িক ক্ষেত্রে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু এ সত্যটিকে আমরা প্রায়শই বিস্মৃত হই যে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাচ্যরীতির ধারা যেখানে পৌনঃপৌনিক সেখানে ইউরোপীয় রীতির ক্ষেত্রে তার বিচরণক্ষেত্র বিজ্ঞান ও দর্শনের আন্তর্জাতিক চরিত্র, আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রাচীন ধারায় ভাঙ্গন এবং নতুন জীবনযাত্রা-পদ্ধতির তাগিদে আমাদের শিল্পীমনন আক্রান্ত হতে বাধ্য।

আমাদের দেশের আধুনিক চিত্রশিল্পীদের আয়োজনে যে আন্তর্জাতিক তা মননে যে দেশকাল অতিক্রমের আকুতি তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের আপন সমাজে। একদিকে তা যেমন খণ্ডিত বোধের জন্ম দিয়েছে, তেমনি জনজীবনের একান্ত সমীপবর্তী বলে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সংগ্রামের ছাপ পড়েছে তাদরে তুলির টানে রঙের নির্বাচনে। সুতরাং যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ শিল্পীকে প্রভাবিত করে, তাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া চলে না। বড়জোর ক্লান্তির পর্যায়ে আদিম শিল্পরীতির কাছ থেকে পুনরুজ্জীবনের তাগিদ অনুভব করেন শিল্পী। কিন্তু তার জন্য চাই শিল্পোন্নত একটি সমাজব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের পীড়ন। ইউরোপের কিছু শিল্পীরা তাই আফ্রিকান বুশম্যান আর্ট কিংবা তাহিতির আদিম সরলতায় মুক্তি খুঁজেছেন, চেয়েছেন প্রসারতা। কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতার যুগে তা সেই গণ্ডিতে সীমিত থাকেনি। তদৃশ্য সমস্যাপীড়িত না হয়েও আমাদের শিল্পীরা এই সমৃদ্ধির দ্বারস্থ হতে বাধাগ্রস্ত হন না, মনে কিংবা নিষ্ঠায়। সুতরাং আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের জটিলতা জ্যামিতিক রীতির সারল্যকে গ্রহণ করে জটিলতা অপসারণে প্রয়াসী সেই শিল্প-রীতিকে আমরা সেই মানসিকতায় গ্রহণ করিনি। গ্রহণের পশ্চাতে ছিল একটি নতুন আয়ত্ত শিল্পরীতির প্রতি আগ্রহ ও ফর্ম ভেঙে তাকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের সাথে সম্পর্কের ধারার সংকটকে তুলে ধরা। আধুনিক শিল্পকলার যে ধারাটা বৌদ্ধিক গ্রাহ্যতাকে উচ্চাসনে সমাসীন করে সেখানে শিল্পীর সাথে সমাজের ভাব বিনিময়ের যোগাযোগ মুখ্য নয়, মুখ্য তার আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি। এখানে রং, ক্যানভাসে স্থান ও অবস্থান প্রকট হয়ে ওঠে, বিষয়বস্তু নয়, এভাবে নির্বস্তুক এবং বিমূর্ত রীতি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। হামিদুর রহমান, দেবদাস চক্রবর্তী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং আরও অনেকে এবং কিছুটা হলেও রশিদ চৌধুরী তাঁর কার্পেট বুনন–এর ডিজাইনকে মুখ্য করেও একই লক্ষ্যাভিসারী।

অন্তত যেখানে তাঁরা বিমূর্ত শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিতে সমুৎসুক।

এ প্রসঙ্গে আগের কথায় ফিরে যেতে হয়, জয়নুল আবেদিন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও তাঁর কোনো শিল্পধারার অনুসারী শিল্পীগোষ্ঠী কেন বেরিয়ে এলেন না? এর মূলে নিহিত রয়েছে বুর্জোয়া দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিটা দীর্ঘদিন ধরে যে শাসক-শাসিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যার ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা এক আধুনিক অর্থনীতির-বুর্জোয়া অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের রাস্তায় অগ্রসর হয়নি। একটি প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা অধ্যুষিত দেশ উপনিবেশবাদের কবলগ্রস্ত হলে যে জটিল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে, এখানেই তার প্রতি কাজ করেছে আমাদের শিল্পকলার লোকজ ধারার অন্বেষণে, পরিপুষ্টি সাধনে এক নেতিবাচক প্রতিবাদে।

চিত্রশিল্পের বিকাশের যে ঐতিহাসিক ধারা রয়েছে, বিভিন্ন শিল্পরীতির উদ্ভব ও পুষ্টির যে কারণসমূহ রয়েছে ইউরোপের শিল্পবিকাশ ও সংকটের আন্তর্জাতিক চরিত্রে আমরা তার বাইরের দর্শক নই। তারই একটি দূরবর্তী অংশ। শিল্পকলার এই আন্তর্জাতিক চরিত্রের অবিভাজ্যতা নিয়ে হার্বাট রিড তাঁর শিল্পকলার বিশুদ্ধতাবাদের সপক্ষে ভ্রান্ত উপসংহার টেনেছেন: The quality of art is fairly constant, like the quality of all human products: That is why it is such a vulgar error to imagine the art in any essential sesee is economically determined.

কিন্তু মানুষকে আমরা যদি "Tool making animal" হিসেবে দেখি অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এক প্রাণী, যে সমাজ গড়ছে তার অর্থনীতির ওপর এবং গোড়ার কথায় শ্রমের ভিত্তিতে তবে একথা উপলব্ধি করতে কি খুব বিতর্কে নামতে হয় যে, অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর যে শিল্পকলার উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে তার ওপর অর্থনীতির প্রভাব এবং অপরপক্ষে, অর্থনীতির ওপর শিল্পকলার প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্কটি অনস্বীকার্য নয়। সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশ কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিকশিত নয়? শিল্পকলার এই আধুনিকতার বিচিত্র গতি-প্রকৃতি আদিম আফ্রিকান দিনকা গোষ্ঠী কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মাওরিদের মধ্যেও সম্ভবপর। যদি তা নয়, তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচার "স্থুল ভ্রান্তি" কেন?

[দৈনিক সংবাদ: ১৬.১০.১৯৭৪]

[লেখক: মৃত। সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক। সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ।]

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পচর্চা: একটি পর্যালোচনা

ম ত লু ব আ লী

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আবহমান বাংলার পুণ্যভূমিতে একদিন ছিল লোক-শিল্প-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যমণ্ডিত সমারোহ। সেই ঐতিহ্যেই লালিত হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল বংশ-পরম্পরায় লোকশিল্পীদের নিপুণ কারিগরিতাসমৃদ্ধ লোকায়ত শিল্পাধার। আজ আমরা যে বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনের বিগত অর্ধ-শতাব্দী সময়কালের খতিয়ান নিতে যাচ্ছি, তা সন্দেহ নেই সেই গৌরবময় ফেলে আসা অতীতেরই ধারাবাহিকতার ইতিবৃত্ত ব্যতিরেকে নয়। আজ আমরা আমাদের শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে যখন ভাবি, তখন বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, শস্য-শ্যামল এ স্বদেশভূমি অযুত সম্ভাবনাময় সৃজনশিল্পীদেরও চারণভূমি– চারুশিল্পের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান এখন সুদৃঢ়। প্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন আর জামদানির ঐতিহ্যখ্যাত দক্ষিণ এশিয়ার এককালের পর্যটক ও সংগ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণীয় এই ভূ-কেন্দ্রটি যেহেতু গ্লোবাল-ভিলেজেরই আওতাভুক্ত, ঠিক সম-প্রেক্ষিতেই আধুনিকোত্তর এই শিল্পযুগে এশিয়ার একটি সক্রিয় চারুকলা কেন্দ্র হিসেবে ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে নতুন করে।

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের শিল্পাঙ্গনের সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্পীরা নিজেদের যুক্ত করেছেন নানাভাবে, চীন-জাপান-ভারতসহ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাস্থানে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা গ্রহণ ও দীর্ঘদিন অবস্থান করেও শিল্পকর্মীরা এই সম্প্রসারণ ও সংযোগ ঘটাচ্ছেন– তাছাড়া এতদঞ্চলে শিল্পকলার বিকাশের লক্ষ্যেও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক চারুশিল্প প্রদর্শনী-প্রতিযোগিতায় এদেশের সৃজনশিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং পুরস্কারের গৌরব অর্জনের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই একটি ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে। আর ইদানীংকালে তার মাত্রাধিক্যও লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব মিলিয়ে চারুশিল্প বিশেষত দৃশ্যশিল্প তথা চিত্রকলা, ছাপচিত্র ও ভাস্কর্যকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিকাশ ও উত্তরণের শুভ লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিদিনে।

এর মধ্যেই রয়েছে প্রতিবন্ধকতা ও বন্ধুর পথ অতিক্রমণের অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ সময়ের কষ্ট-সহিষ্ণু যাত্রার চড়াই-উৎড়াই পেরোনোর ইতিবৃত্ত এবং চারুশিল্পকর্মীদের ইতিবাচক প্রয়াসের পাশাপাশি নেতিবাচকতার ইঙ্গিতও রয়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়– তথাপি অগ্রযাত্রা থামেনি, বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গন অক্ষুণ্ন কর্মতৎপরতায় অব্যাহত গতিতে মোক্ষলাভের পথ-সন্ধান করে চলেছে নিতুই। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনের পঞ্চাশ বছরের ইতিবৃত্ত প্রদানের ক্ষেত্রে খুব ভালো হত যদি চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে শুরু করে চলতি সময়কাল পর্যন্ত একটা দশকওয়ারি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আলোকপাত করা যেত। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষত এ জাতীয় কাজের জন্যে একান্ত জরুরি যে দিকটি সেই লিপিবদ্ধ তথ্যাদি'র অভাব রয়ে গেছে– তাছাড়া CONCERNED ব্যক্তিবর্গের অনেকেই লোকান্তরিত হয়েছেন, আবার প্রবীণ যাঁরা এখনও আমাদের শিল্প-পরিবেশে বিচরণ

করেন, ইতিবাচকই হোক আর নেতিবাচক বিষয়ই হোক তাঁদের অনেকেই কোনো বিষয়েই মুখ খুলতে অভ্যস্ত নন। আর দশকওয়ারি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আরেকটি বড় সমস্যা এই যে, যাঁরা সক্রিয় সৃজনশিল্পী, তাঁদের উদ্ভব যে কোনো একটি দশকে হলেও বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পর্যায় অনেক দীর্ঘায়িত; আর এমনও দেখা যায় যে একাধিক শিল্পীই আছেন যাঁরা চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে শুরু করলেও সত্তর-আশির দশক এমনকি বর্তমানেও সক্রিয়– কর্মিষ্ঠ প্রবীণ শিল্পীগণ অনেকেই অনায়াসে বিভিন্ন প্রজন্মের উদীয়মান নবীন-তরুণ চারুকর্মীদের পাশাপাশি নিজেদের অক্ষুণ্ন কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

তাই আমার মনে হয় এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনায় সাধারণভাবে মূল বিষয়াবলির দিকে দৃষ্টি দেয়াই সঙ্গত হবে। তবু চেষ্টা করব মোটামুটিভাবে এই পঞ্চাশ বছরের আমাদের শিল্পচর্চা ও সাধনার ক্ষেত্রে অর্জনের দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাতের এবং সেইসঙ্গে দুয়েকটি নেতিপ্রবণতা ও ব্যর্থতার দিকও উত্থাপিত হবে। চারুকলা শিল্পাঙ্গনের সাফল্য-সম্ভাবনা ও সমস্যা-সংকটের নানা দিক রয়েছে, এসব কিছু মিলিয়েই আন্তর্জাতিক শিল্পভুবনের সদরদরজা পেরিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশাধিকার পেয়েছি আমরা– সুতরাং চারুশিল্পের বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। এই অগ্রগামিতার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এখন যে কোনও প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে, সেটাই আমার মনে হয় মোদ্দা কথা। এবং তা-ই হওয়া উচিত মূল প্রতিপাদ্য।

বাংলাদেশের শিল্পকলা সম্পর্কিত আলোচনায় সবচেয়ে আগে যে দিকটি আলোকপাতের প্রয়োজন তা হল তার ঐতিহাসিক ভিত্তির দিক। সেই ভিত্তি রচনার ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক দিক চিহ্নিত করার প্রয়োজন যেমন রয়েছে, তেমনি জাতি ও গোষ্ঠীগত এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েরও প্রচেষ্টা ও অবদানের লক্ষণ পটভূমিতে থাকলে তারও উল্লেখ করা দরকার। বাংলাদেশের চারুশিল্পচর্চার পরিচয় তুলে ধরার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাটির প্রয়োজন হল এই কারণে যে এদেশীয় শিল্পকলার বিচিত্র ঐতিহ্য-ইতিহাস রয়েছে– উপরন্তু তার জাতীয় ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিবিশেষের পদক্ষেপ ও সাফল্যজনিত ভিত্তিপ্রমাণও রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের বিচিত্র-গতিধারা এবং বিভিন্ন পর্যায় স্বাভাবিক কারণেই আমাদের শিল্পকলা তথা চারুশিল্প প্রসঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোত। এ-কথার তাৎপর্য এই যে, এদেশের শিল্পকলার ভিত্তিভূমি যে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রতিভূ এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পস্রষ্টা তথা পথিকৃৎ পর্যায়ের যাঁদের কথা আমাদের শিল্প-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁদের প্রত্যেকেই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তরকালের কর্মিষ্ঠ সৃজনশিল্পী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ লোকান্তরিত এবং যাঁরা এখনও আমাদের মাঝে রয়েছেন তাঁদের প্রায় সবাই সমকালেও তাঁদের কর্মপ্রবাহ কমবেশি অটুট রেখেছেন।

বাংলাদেশের সমকালীন শিল্প-ভুবনের কর্মকা- নিঃসন্দেহে বিপুলতায়ন এবং প্রায় পাঁচটি দশকের বিভিন্ন প্রজন্মের অসংখ্য শিল্পস্রষ্টার কর্মনিষ্ঠার বৈচিত্র্যময় শিল্প-প্রতিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার তা পক্ষপাতী। ধারাবাহিকভাবে অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পকর্মীদের সৃজন-সাফল্য উত্তরোত্তর এদেশের দৃশ্যশিল্প [VISUAL ART] তথা সৃজনশিল্পের পরিমণ্ডল সম্প্রসারণে এবং উপকরণ ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়নে সহায়তা করলেও প্রবীণ ও অগ্রজ শিল্পস্রষ্টাদের সামগ্রিক সাফল্যেরই তা প্রতিধ্বনি। প্রথম সারির তথা পূর্বসূরি শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজন্মের চারুশিল্পী এবং সমকালের অপেক্ষাকৃত নবীন শিল্পকর্মীরা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পকলায় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে এসে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে নব-নব মাত্রা যোগ করে অগ্রজ শিল্প-স্রষ্টাদের

সাফল্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলা যায় যে, বিগত পাঁচ দশকের শিল্প-সাধনায় নিসর্গ-প্রকৃতি, বস্তু ও অবয়বভিত্তিক বাস্তববাদী রচনারীতির সাথে যুগোপযোগী আধুনিক শিল্পরীতিসমূহের বিশেষত সমবিমূর্ত ও বিমূর্ত এবং প্রকাশবাদী ধারা প্রভৃতির সম্মিলন ঘটেছে প্রায় সূচনা থেকেই। অর্থাৎ আমাদের আজকের চিত্রকলা ও অন্যান্য শাখার শিল্পচর্চায় যে আধুনিকতাবাদ তথা জ্যামিতিকতা, বিমূর্তনবাদ, খানিক পরাবাস্তববাদী প্রবণতা এবং নির্বস্তুকতা প্রভৃতির প্রতিফলন– প্রকৃত অর্থে তার প্রাথমিক লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখনই। আর একথাটিও বলা যাবে যে, আমাদের অধিকাংশ শিল্পকর্মীই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুশীলনধর্মী 'একাডেমিক স্টাইলে' কাজ শুরু করলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন আঙ্গিকের আধুনিক শিল্পধারার পথ পরিক্রমা করেছেন। এখন বর্তমানের এই উত্তর-আধুনিক পর্যায়ের সঙ্গেও তাঁদের কর্মকা- সংহতি রচনা করেছে।

অতিক্রান্ত হচ্ছে সৃজনশীল চারুশিল্প চর্চার পঞ্চাশ বছর। এই পঞ্চাশটি বছরের একেবারে সূচনাপর্বের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি ফেরাই তাহলে একসঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়বে– বলাবাহুল্য যে-ইতিহাস সংশ্লিষ্ট মহলের প্রায় সবারই কমবেশি অজানা নয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে একটুখানি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন মনে করছি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার প্রাক্কালে সেই ত্রিশ-চল্লিশের দশকের কথা বলছি– সে আমলেই মূলত ভিত্তি রচিত হয় বাংলাদেশে সৃজনশীল শিল্পচর্চার। কারণ তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় যে সরকারি আর্ট স্কুল ছিল সেখানেই শিল্পদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন আমাদের শিল্পাঙ্গনের প্রথম প্রজন্মের শিল্পী-শিক্ষকগণ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, যিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম চারুকলা শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, তিনি ১৯৩২ থেকে '৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই শিক্ষকতাও শুরু করেছিলেন। দেশ-বিভাগের পর সাতচল্লিশ সালে জয়নুল আবেদিন সহ অন্যান্য অনেকেই চলে আসেন ঢাকায় এবং আবেদিনের নেতৃত্বে এতদঞ্চলের প্রথম চারুকলা শিল্পায়তনটির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমীন ও হাবিবুর রহমান প্রমুখ। তাঁদেরই সমসাময়িক ছিলেন শিল্পী এস.এম. সুলতান– তবে তিনি ঢাকার তৎকালীন শিল্পাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এবং আর্ট কলেজের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন না। যাহোক "দেশ-বিভাগের পর এঁরা সবাই এলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে– সঙ্গে আনলেন [ক] কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রাপ্ত ইউরোপীয় আঙ্গিক-ধারায় লব্ধ শিল্প-শিক্ষা, [খ] প্রাচ্য ঐতিহ্য এবং সেই সাথে লোকজ-কলা শিল্পধরন অনুসৃত শিল্পের জ্ঞান-গরিমা ও দক্ষতা। বলাবাহুল্য, আমাদের চারুকলার প্রত্যুষকালে এই ছিল আমাদের পুঁজি।"

এগিয়ে চলার প্রথম সোপানে তাই পদক্ষেপ যথেষ্ট সাবলীল ছিল বলতে হবে। আমাদের শিল্পযাত্রায় দুর্বার গতির স্ফুরণ প্রকৃতপক্ষে সেই শুরু থেকেই।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমাদের দেশের পথিকৃৎ সৃজনশিল্পীগণ এবং সে সময়ের ছাত্রশিল্পীরা মিলে এতদঞ্চলে শিল্পচর্চার এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন যা তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে করেছিল কর্মমুখর। সেই যুগের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ও শিল্প-স্রষ্টাদের সৃজনকর্ম ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের প্রচণ্ড প্রভাব পরবর্তী দশকগুলোতেও বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে– আর তার ছাপ এখনও বর্তমান। একথা অনস্বীকার্য যে সৃজনশীল শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের সবার সমান ভূমিকা হয়তো ছিল না, কিন্তু যেখানে শিল্পকাজ করাটা ছিল

নিতান্তই গর্হিত অপরাধের সামিল সেই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থায় সুষ্ঠ শিল্প-প্রতিবেশ আর একটি শিল্পী-সমাজ গড়ে তোলার জন্যে সবাই সচেষ্ট ছিলেন। তাই তাঁদের সমষ্টিগত দানে-অবদানে আমাদের শিল্পাঙ্গন যথার্থ অর্থেই ঋণী।

পঞ্চাশের দশকই হচ্ছে সেই উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল-উচ্ছল দশক, যে-সময়ে আমাদের শিল্পাঙ্গনের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে– ওই ভিত্তির উপরই পরবর্তী দশকগুলোর শিল্প-কর্মকাণ্ডের সমুদয় স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল। আধুনিকতার সূত্রপাত এবং বিভিন্ন মাধ্যমের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিপথের ঠিকানাও আবিষ্কৃত হয় ওই সময়ে। কারণ জয়নুল আবেদিন সহ অন্যান্য অনেকেই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করে আসেন : যেমন জয়নুল আবেদিন [১৯৫১-৫২] ও সফিউদ্দীন আহমেদ [১৯৫৮] ইংল্যান্ড, মোহাম্মদ কিবরিয়া [১৯৫৯-৬২] জাপান, আমিনুল ইসলাম [১৯৫৩-৫৬] ও মুর্তজা বশীর [১৯৫৬-৫৮] ফ্লোরেন্স, রশিদ চৌধুরী [১৯৪৯-৫৪] স্পেন ও [১৯৫৬-৫৭] ফ্রান্স এবং আব্দুর রাজ্জাক [১৯৫৫-৫৭] যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করে আসেন সরকারি বৃত্তির অধীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ষাটের দশকেও কলকাতায় এবং ঢাকার তৎকালীন চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপনকারী প্রথম দিকের ব্যাচের অনেকেই বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আসেন শিল্পকলা ও টিচারশিপ কোর্সের অধীন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য : শফিকুল আমীন [১৯৬১-৬১] ইংল্যান্ডে টিচারশিপ কোর্স সম্পন্ন করেন এবং কাজী আব্দুল বাসেত [১৯৬২-৬৩] শিকাগো, জুনাবুল ইসলাম [১৯৬৬] যুক্তরাজ্য ও মীর মোস্তফা আলী [১৯৬৭] লন্ডনে যথাক্রমে পেইন্টিং, কারুকলা ও মৃৎশিল্পে দীক্ষা নেন। যতদূর জানি এইভাবে আরও একাধিক চারুশিল্পী বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমিয়েছিলেন [যাঁরা এদেশের চারুকলা শিক্ষাঙ্গনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পী-পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে এগিয়ে এসে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযাত্রীদের চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন]। প্রসঙ্গত আরও বেশ কিছু শিল্পকর্মীর নামোল্লেখ প্রয়োজন যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ ছিল এদেশের শিল্পাঙ্গন গড়ে ওঠার প্রাথমিক বা তৎপরবর্তী নিকটকালে। কাজী আবুল কাশেম, হামিদুর রহমান, মোস্তফা মনোয়ার ও নভেরা আহেমদ প্রমুখ ছাড়াও আরও অনেকের কথাই এ পর্যায়ে স্মরণযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বায়ান্নোর ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন পঞ্চাশের দশকের শিক্ষার্থী-শিল্পীদের বিশেষ আলোড়িত করেছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহান ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন– আর তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টায় অমর একুশে উৎসারিত প্রেরণার তথা রাজনৈতিক ও বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন আমাদের শিল্পাঙ্গনে এক নতুন মোড় এনে দেয়।

এভাবেই বিষয়বস্তু গ্রহণ এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়কালে কিছুটা হলেও সংযোজন ঘটেছে আমাদের দেশের বিগত শেষ দু'টি যুগের অধিক কালের রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষত একাত্তরের গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিফলনে এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলি ও সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাব প্রতিফলনেও। এক্ষেত্রে অবশ্য কৃতিত্বের সিংহভাগ বর্তায় প্রধানত আমাদের চারুশিল্পাঙ্গনের পথিকৃৎ শিল্পীদের উপর এবং প্রবীণ ও মধ্যবয়সী সহ বর্তমানের কর্মিষ্ঠ নবীন-তরুণ চারুকলা কর্মীদের ভূমিকাও কম নয়। সেইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনুসৃত শিল্প-মাধ্যমের ক্ষেত্রে এখন আমাদের বৈচিত্র্যময় শিল্প-পরিবেশ এবং বিগত দু'টি দশকের মধ্যেই ছাপাইছবি [বিশেষত কাঠখোদাই ও আধুনিক প্রিন্ট-মেকিং পদ্ধতির বিভিন্ন ধারা-আঙ্গিক], ভাস্কর্য [যেমন কাঠ-মাটি-সিমেন্ট ও ঢালাইকর্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাতব-বস্তুর সরাসরি ব্যবহার] এবং টেরাকোটা ও অন্যান্য সৃজনশীল মৃৎশিল্পকর্ম, দেয়ালচিত্র ও অলঙ্করণ,

ট্যাপেস্ট্রি, বাটিকচিত্র, কোলাজ ও মিশ্র মাধ্যম প্রভৃতির চর্চায় বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রসার লাভ করেছে।

একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের অগ্রজ সৃজনশিল্পীদের নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী সৃজনপ্রচেষ্টা কখনো কখনো বিশিষ্ট শিল্পীর কৃতকর্মের গুণ-বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা এবং শিল্পক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতিকে যে গতিতে এগিয়ে নিয়েছে– ঠিক সমানভাবেই, সমকালের অপেক্ষাকৃত তরুণ উদীয়মান শিল্পকর্মীদেরও তা প্রভাবিত করেছে বরাবর। এজন্যে দেখা গেছে, চিত্রকর্মের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বা অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির বেলায় একজনের পরিবর্তন হয়তো অন্যান্য সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের শিল্পীর উপরেও বেশ প্রভাব ফেলেছে। এভাবেই এগিয়ে গেছে আমাদের চারুশিল্পের অঙ্গন।

প্রসঙ্গত বলি, আমাদের শিল্পকলা চর্চার প্রত্যুষকালে সাধারণভাবে যে শিল্প-আঙ্গিক লক্ষ করা গিয়েছিল তা ছিল প্রধানত বাস্তববাদী ধাঁচের, তবুও একই সাথে ইম্প্রেশনিস্ট এবং এক্সপ্রেশনিস্ট ধারা ও সেইসঙ্গে ছিল ঐতিহ্যময় দেশজ শিল্পরীতির প্রতিভূ। কারণ একদিকে পাশ্চাত্য ধারা আঙ্গিকের শিল্প-শিক্ষা, অন্যদিকে প্রাচ্য ঐতিহ্য ও আবহমান বাংলার লোকজ শিল্পরীতির অনুসরণে আমাদের শিল্পযাত্রার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও ওই প্রবণতার মূল ধারাটি উন্নততর 'ফর্মে' প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তবে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তার সাথে অতি আধুনিক শিল্প-রীতিগুলোরও সংযোজন ঘটে।

যে-সমস্ত শিল্পী-শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী-শিল্পীদের মাধ্যমে এদেশে শিল্পচর্চার আরম্ভ হয়েছিল, তাঁদের প্রথম যুগের শক্তিময় সৃজনশীল কর্মসমূহ আমাদের অনন্য সম্পদ সন্দেহ নেই। আর বলাবাহুল্য তাঁদের শিল্পকাজের সম্ভার নিয়েই আমাদের শিল্প-ভাণ্ডার ঐশ্বর্যমণ্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল অগ্রগণ্য প্রথম সারির শিল্পীদের কাজ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ শিল্পীদের কর্মপ্রবাহ আজও তরুণদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে সক্ষম। আর দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করে নেয়া যায় যে এতদিন ধরে যে বিপুল পরিমাণ শিল্পকর্ম এখানে হয়েছে তার বহুলাংশই যেন কমবেশি তাঁদেরই অনুসৃত রীতি-পদ্ধতি এবং শিল্প-আঙ্গিকের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা। কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। তবে বিষয়টি নিতান্তই উপলব্ধি সাপেক্ষ।

ইতোমধ্যে আমাদের শিল্পচর্চার অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, অর্ধশত বছর– কম তো নয়। সেই সময়কালকে বড় দু'টো অংশে ভাগ করলে দাঁড়ায় স্বাধীনতার আগের কর্মতৎপর বিশ-বাইশ বছর, আর স্বাধীনতা-উত্তর, আড়াই দশকের বেশি সময়। যথার্থ অর্থে *শিল্প-আন্দোলন* হওয়ার মতো বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের কখনো ছিল না, বর্তমানেও নেই– তো সমকালের সামাজিক পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় তার সম্ভাবনা নেহাত অলীক-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। একারণে দেশের করিৎকর্মা শিল্পীকুল ব্যাপক অর্থে যতটা না শিল্পচর্চার উদ্ভাবনী দিকের গবেষণা-নিরীক্ষায় আত্ম-নিবেদিত, তার চেয়ে বেশি *প্রফেশনাল-অ্যাটিচুডের প্রভাব* কার্যকর তাঁদের মধ্যে– তাই তাঁদের অধিকাংশই নিয়োজিত পেশাদারিত্বের অনুকূল একান্তই রিপিটিশনধর্মী ব্যক্তিগত সৃজনচর্চায়। তবু চারুকলার চর্চা বাংলাদেশে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রিক-বিকাশের লক্ষণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেকথা অস্বীকার করবার জো নেই। আর হয়তো সেজন্যেই আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদীও।

একথা ঠিক যে প্রাক-স্বাধীনতা আমলে দেশে শিল্পকলার *'উল্লেখযোগ্য-নিদর্শন'* বলতে যাকিছু আমরা পেয়েছি বর্তমানেও সেই সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হারে বড় একটা বাড়েনি। এক্ষেত্রে আমি বলছি

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ‘Remarkable Art-work’ বিষয়ে– সেই অভাবটা কিন্তু রয়ে গেছে, যদিও কাজের পরিমাণ অজস্র এবং নবাগত ও উদীয়মান তরুণ শিল্পকর্মীদের অনেকেই আজকাল নতুন উদ্যমে নতুন মাত্রার সৃষ্টিধর্মী কাজের প্রয়াস নিচ্ছেন। তবে সব মিলিয়ে তাঁদের সে প্রচেষ্টা মূলত ব্যাপক অর্থে ‘শিল্প-সাধনা’র পর্যায়ভুক্ত হতে পারছে না– কেননা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যথার্থ অর্থে সাধনা-জনিত নেশা না হয়ে আমাদের শিল্পকলা এখন আক্ষরিক অর্থেই বাজার বা দেশি-বিদেশি খদ্দেরদের কিংবা শিল্পীদের যারা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তাদের অনুকূলে পেশাগত প্রাধান্য পেয়েছে। আর তাইতো শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ কিংবা এস. এম. সুলতান ও মোহাম্মদ কিবরিয়া সহ মুষ্টিমেয় আর কয়েকজন শিল্পী এবং তাঁদের সাড়া জাগানো আগের কাজগুলো ছাড়া তুখোড় সৃজন-ক্ষমতার অধিকারী বলিষ্ঠ চারুশিল্পী যেমন হাতে গোনা, উল্লেখযোগ্য নতুন কাজের নমুনাও তেমনই বিরল না হলেও একেবারেই সীমিত। তবু সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের শিল্পকলা ইদানীংকালে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে ক্ষেত্রবিশেষে। আর অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের মাধ্যমেই সেই গুরুদায়িত্বটি সম্পাদিত হচ্ছে। সেটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা।

এদেশের শিল্প-ভুবনের বিস্তৃতি এবং শিল্পীদের সংখ্যা-তালিকা ও তাঁদের সমষ্টিগত কাজের পরিমাণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাত্রা অনেক বাড়লেও সামগ্রিকভাবে গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে তা আরও ব্যাপকতার মুখাপেক্ষী। তবু অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের শিল্পকলা সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই জাতীয় পর্যায়ে দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আজ অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশের শিল্পকলা তার রূপচারিত্র্যে সৃজনশীল গুণমান ও মর্যাদা-বৈভব নিয়ে ঊর্ধ্বগতিপ্রবাহে ক্রম-অগ্রসরমান।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-প্রতিযোগিতায় আমাদের কর্মিষ্ঠ প্রবীণ ও নবীন শিল্পকর্মীদের অনেকেই নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। অনেকেই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের গৌরব অর্জন করে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, দেশের বেশ ক’জন শিল্পী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে প্রবাসী জীবন যাপন করছেন। এবং তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতির অধিকারী হয়ে দেশের সম্মান বাড়িয়ে চলেছেন। এদিকে পেশাগতভাবেও বিশেষত ব্যবহারিক শিল্পকর্মের স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমাদের সৃজনশিল্পীদের প্রভূত সাফল্য আর অবদান রয়েছে। তাই অনায়াসেই তা আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অলঙ্কৃত, প্রসারিত তথা সারবান করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, আমাদের শিল্পকর্মীদের মধ্যে সবাই কিন্তু সমান গতিতে বা সমমাত্রায় সৃজনকর্মের চর্চা এবং শিল্পকলার আঙ্গিক-উপকরণ তথা প্রকরণ ও ধারা-আঙ্গিক নিয়ে এবং এর সামগ্রিক সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা বা সাধনা করেননি, এমনকি বিশুদ্ধ ও সৃজনশীল নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও হয়তো সবাই শেষ পর্যন্ত অবস্থান করেননি। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের প্রতিভাবান, বিদগ্ধ শিল্পকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে CONTRIBUTE করেছেন অকাতরে, সন্দেহাতীতভাবেই। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, আমাদের সৃজনকর্মীরা নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস শ্রমে এবং এভাবে আমাদের শিল্পকর্মের জগৎকে কুশলী যাথার্থ্য ও শৈলীর দিক থেকে আপেক্ষিকভাবে, তুলনামূলক একটি উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তাই সার্বিক বিচারে

এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে আমাদের চারুশিল্পাঙ্গন এখন যথার্থ অর্থে একটি কংক্রিট স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এ পর্যায়ে একটি স্বীকারোক্তির প্রয়োজন রয়েছে যে, উপর্যুক্ত আলোচনা-সূত্রপাতে শুধুমাত্র সাধারণভাবে আমাদের শিল্পকলার অগ্রগতি ও অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়াবলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। শিল্পীদের নাম-পরিচিতি ও তাঁদের কাজের খতিয়ান যতটা সম্ভব যথাস্থানে দেয়া যাবে। এইসঙ্গে একটি কথা এখানে বলে রাখছি যে, ব্যাপকভাবে শিল্পীদের সমাবেশ বাড়লেও এবং সার্বিক বিচারে দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও বিগত অর্ধশতাব্দী সময়কালে উঁচুমাত্রার শিল্পমানসম্পন্ন মহৎ সৃষ্টি যা শাশ্বত ও সার্বজনীনতার পরিপূরক হতে পারে তেমন শিল্পকাজের পরিমাণ অতি সীমিত যে, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিষয়টি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে সাহিত্য-সংগীত-নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ জোরালো একটি সৃজনশীল ধারা লক্ষ করা গিয়েছিল। যদিও তা ঠিক সুসংগঠিতভাবে বা সুপরিকল্পিতভাবে টিকে থাকেনি, অথবা সেই জোয়ারের জলের মতো সাংস্কৃতিক গতিধারাটিকে আমরা সামগ্রিকভাবে ধরে রাখতে পারিনি– কারণ তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ; খানিকটা আবেগ আর খানিকটা উচ্ছ্বাসের সেই তোড়জোড় খুব অল্পদিনেই ভাঁটার পিছুটানে খেই হারিয়ে ফেলেছিল। ঠিক সুসংগঠিত সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা উৎসারিত হয়নি, তাই সেই প্রবণতা পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকতা ও অপেক্ষাকৃত ফরমায়েশি চরিত্র পেয়েছে এবং সেই প্রবাহ দুয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমসহ এখন ক্ষীণস্রোতা নদীর মতো মৃদু গতিতে প্রবহমান। অবশ্য নানান পারিপার্শ্বিক কারণেই স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় পড়েছে ছেদ, আর কিছুটা প্রচ্ছন্নতার আবরণে ঢাকা পড়ে চেতনার অন্তঃস্রোত প্রকা- একটা সৃজনশীলতার ঢেউ তুলতে এখনও পারছে না। এক্ষেত্রে ঠিক সেই প্রগতিশীল গতিধারার কথা বলা হচ্ছে, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রাক-স্বাধীনতা আমলের আন্দোলনগুলোর তথা অন্যতম গণতান্ত্রিক আন্দোলন বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রগতিবাদী চেতনার সাথে সম্পর্কিত। আর পাকিস্তানি আমলে শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবেষ্টনীটা ছিল একেবারেই অন্য চেহারার; সেদিক থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যে ধারা তা অনায়াসেই একটা নবতর স্বরূপ পায়, যদিও সেই রূপটি ছিল তাৎক্ষণিক। উল্লেখ্য যে, দৃশ্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে দু'য়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তেমন কোনো বড় আকারের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে দীর্ঘদিন থেকে শিল্পকলার যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, পরবর্তীকালেও তাকে অনেকটা সেভাবেই পরিচালিত হতে দেখা যায়। একথা বলা যেতে পারে যে, দ্রুত কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং চিন্তা ও ভাবগত দিকের ক্ষেত্রে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে না। শিরোনামের ক্ষেত্রে একধরনের চমক লক্ষ করা যায়, সেই লক্ষণটিকে হয়তো অনেক সময় পরিবর্তন ও সচেতন অগ্রগতি মনে করা হয়েছে। আসলে তা ছিল একটা আপাতলক্ষণযুক্ত ব্যাপার মাত্র। বিষয়গতভাবে আগে যা হয়েছে এখনও মূলত প্রায় তাই করছেন শিল্পীরা। কেবল পার্থক্য এখানেই যে, অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ এসেছে টেকনিক বা কলাকৌশল আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে; ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপ্রসূত তীব্র প্রত্যক্ষ আবেগ সাধারণভাবে দেখা যায় না আমাদের শিল্পকলায়– অর্থাৎ একটা জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠা যাকে বলে, তেমনটি ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে করা হোক– অবশ্যই বিষয়টি বিতর্কিত।

কাজের মাধ্যমের দিক থেকে দেশের শিল্পীরা অধুনা বহুধা শাখায় বিচরণ করছেন। এবং প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বিভিন্ন বিষয়ে যেক্ষেত্রে সামান্যসংখ্যক শিল্পীর সমাবেশ ছিল এমনকি কোনো কোনো দিকে একাধিক শিল্পীর সন্নিবেশ ছিল না– আজ সেখানে আরও অনেকেই এগিয়ে এসেছেন এবং পারদর্শিতা প্রদর্শনে উদ্যোগী হচ্ছেন। এর কারণ স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রথম দশকেই আগের তুলনায় অনেক বেশিসংখ্যক শিল্পকর্মী বিদেশে [পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে] প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ কৃতিত্বের সাথে কোর্স সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এসেছেন এবং কেউ কেউ প্রবাসেই থেকে গেছেন। আর পরবর্তী দশকগুলোতেও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়ে গেছে।

এদিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাংবাৎসরিক কার্যক্রম-ভিত্তিক পদক্ষেপগুলোও আমাদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ১৯৮০ সাল থেকে এশিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্যোগ গ্রহণ করেও একাডেমি বিশেষ সাফল্যের নাগাল ছুঁয়েছে। আর এই উপলক্ষে আমাদের বিশেষত ঢাকার দর্শক-সাধারণ তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে শিল্পকর্ম উপভোগ করার বিস্তর সুযোগ পেয়েছেন। এক সময় মফস্বলের দর্শকদের জন্যেও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী করা হয়েছে। তাছাড়া ‘এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী’ উপলক্ষে প্রতি দু’বছর অন্তর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারগুলোতে এশিয়ার তথা বিশ্বের দু’চারজন নামকরা শিল্পী ও শিল্পরসিক এবং কলা-সমালোচকসহ সমঝদারদের উপস্থিতি আর অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীমহলে নতুন উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিল্পে অগ্রগতির পথ সুপ্রশস্ত হয়। আর এই কথাটিও স্বীকার করে নিতে হবে যে এশীয় চারুকলা দ্বি-বার্ষিকের কল্যাণে আমাদের শিল্পাঙ্গনের প্রায় ‘স্টেরিও-টাইপ’ এককেন্দ্রিক চর্চা-প্রবণতা বিচিত্রপথে ধাবিত হওয়ার আনুকূল্য পায়। যেন একটা নতুন দিনের আলোক-সন্ধান মেলে। শিল্পধারা-আঙ্গিক এবং মাধ্যম-প্রকরণ সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হতে দেখা যায়। রাজধানী ঢাকায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজ সহ প্রথমে চট্টগ্রামে এবং পরে রাজশাহী এবং খুলনায় মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের শিল্পকলা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতালাভের অল্প কিছুকালের মধ্যেই। আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা এইসমস্ত জায়গায় অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস্ ফ্যাকাল্টির অধীন সুকুমার কলায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ঢাকার আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে মাস্টার্স [এম.এফ.এ] ডিগ্রি চালু হয়েছে ১৯৭৮ সনে এবং বিগত ১৯৮৩ সাল থেকে চারুকলা ইনস্টিটিউট নামে এই শিক্ষায়তন পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেখানে এখন সাধারণ পাস-কোর্স বা সনাতন পদ্ধতির শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে অনার্স-কোর্স চালু করা হয়েছে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। তাই বলা যাবে শিল্পকর্ম বিষয়টির প্রতি সার্বিক আগ্রহের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একদা ড্রইং, স্কেচ, জলরঙ-এর চর্চা এবং অর্জিত দক্ষতায় বাংলাদেশের অগ্রগণ্য শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য সৃজনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন, আর আমাদের শিল্পের ভাণ্ডারে তার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই। কিন্তু সময়োপযোগিতার দিক থেকে প্রতিকূল বলেই হোক আর যে কোনো কারণেই হোক এই মাধ্যমগুলো এখনও জনপ্রিয় হলেও শিল্পীদের কাছে যেন আর তেমন প্রিয় নয়। সেদিক থেকে যদিও ব্যয়সাপেক্ষ, আমাদের চিত্রশিল্পীদের অধিকাংশই এখন তেলরঙে বা অ্যাক্রিলিক কিংবা মিশ্রমাধ্যমে কাজ করতে আগ্রহী। ওইজাতীয় মাধ্যমের কর্ম-সমাবেশ

ব্যাপকভাবেই দেখা যায় আয়োজিত প্রদর্শনীগুলোতে। আর বিদেশ-প্রত্যাগত নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের নমুনাও প্রত্যক্ষ করা যায় বিশেষভাবে।

শিল্পকলার উন্নততম ক্ষেত্র ভাস্কর্য মূলত বরাবরই একটি অবহেলিত বিষয় ছিল আমাদের দেশে। সামাজিক প্রতিকূলতার কারণেও দীর্ঘদিন এর প্রসার ঘটেনি। আজ আগ্রহী শিল্পী-ভাস্কর ও পৃষ্ঠপোষকদের ঐকান্তিকতায় তার জাগরণ ঘটেছে। তাছাড়া বিদেশ থেকেও এই বিষয়ে উন্নততর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ভাস্করেরা কাজ করে যাচ্ছেন। এই মাধ্যমটি আসলেই অত্যধিক ব্যয়বহুল, দেশের ভাস্কর্যকর্মীরা এর প্রসারের জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবং কিছু কিছু কমিশন ওয়ার্কও তাঁদের উৎসাহ জুগিয়েছে বলতে হবে। 'টেরাকোটা' মাধ্যমটিও স্বাধীনতা-উত্তর বিগত দু'টি দশকের মধ্যে চমৎকার এগিয়ে গেছে, আর এর মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

সরাসরি অথবা স্থায়ী কোনো জোরালো প্রভাব না রাখলেও শিক্ষাদীক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যরীতির শিল্পকর্মেও আমাদের শিল্পীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে ছাপাইছবি বা প্রিন্ট-মেকিং-এর ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আজকের জগতে এই মাধ্যমটি সঙ্গত কারণেই সর্বাধিক সমাদৃত। আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রধান শিল্পী কমবেশি এই মাধ্যমটিতে কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে সুদক্ষ শিল্পীদের সাড়াজাড়ানো কাজগুলো এখনও উদীয়মান চারুশিল্পকর্মীদের প্রেরণা যোগাতে সক্ষম। ইদানীং নানা ধরনের নিরীক্ষাধর্মী ছাপচিত্রের বহুল প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে এচিং, ইনট্যাগলিও, ড্রাইপয়েন্ট, কাঠখোদাইসহ তাবৎ আধুনিক ছাপচিত্র পদ্ধতি-প্রকরণ ব্যাপকতা পাচ্ছে। আর এই মাধ্যমে, আমাদের চারুশিল্পীরা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের গৌরবও অর্জন করেছেন। সৃজনশীল কর্মীদের সুচারু সহযোগিতা আমাদের মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রটিকে আরও সারবান করে তুলেছে। নানা প্রকৃতির সৃজনশীল কারুশিল্প, কোলাজ, ট্যাপিস্ট্রি, মিশ্র-মাধ্যম, টেম্পারা এবং বিচিত্র ধাতব বস্তু-কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করে আমাদের বিভিন্ন শাখার শিল্পীরা বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে– এখন কাজ চলেছে উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করার লক্ষ্য নিয়ে।

এসমস্ত ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেলায় জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন আবাসিক বিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু কিছু ভবন ও তার অভ্যন্তরস্থ মিলনায়তন প্রভৃতি কেন্দ্র করে আমাদের দেশের উৎসাহী বিদগ্ধ শিল্পীরা এই কয়েকটি দশকে স্থায়ী সাজসজ্জা তথা কমিশন ওয়ার্ক হিসেবে যা করেছেন সেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকেই এই দিকটিতে সংশিষ্ট মহলের দৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত হওয়ায় সরাসরি তার ফল পাওয়া গেছে এভাবে। মোজাইকের কাজ একসময় খুব একটা উল্লেখ করার মতো হয়নি– ইদানিং বেশ বিস্তৃত পরিসরেই লক্ষ করা যাচ্ছে। মোজাইকের পাশাপাশি টেরাকোটার ব্যবহারিক সম্প্রসারণ লক্ষণীয়– দেয়াল-বিন্যাসে বেশ শিল্পিত-রূপে এই মাধ্যমটি এখন অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে আদি মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ফ্রেস্কো বা ম্যূরাল খুব একটা ব্যাপকতা আমাদের দেশে পায়নি।

পঞ্চাশ থেকে ষাট এবং ষাট থেকে সত্তর– দু'টি দশকের বিশটি বছর আমরা শিল্পকলাক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গেই অতিবাহিত করেছি বাংলাদেশের প্রাক-স্বাধীনতা আমলে। আর আমাদের শিল্পাঙ্গনের পাকাপোক্ত ভিত্তির আয়োজনটাও ওই প্রায় দু'টি যুগ কেন্দ্র করে। যেহেতু আলোকপাতের প্রশ্ন কর্মমুখর বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনের পঞ্চাশ বছরের শিল্পস্রষ্টা, চর্চাবিদ ও তাঁদের

কাজের ভুবন নিয়ে, সুতরাং আমি পটভূমি ও ইতিহাস ঘাঁটতে আর উৎসাহী নই। মোটামুটি এটুকু তথ্য হিসেবে রাখলেই চলবে এবং আলোচনার গোড়ার দিকে ইতিপূর্বে তা বিবৃতও হয়েছে যে, আমাদের শিল্পীসমাজ ও শিল্পপরিবেশ গড়ে তুলতে যাঁরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তাঁদের সবাইকে অন্তত একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়েছিল যে, এখানে অন্ধত্বজনিত সামাজিক প্রতিকূলতা আছে এবং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েই শিল্পরুচির বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁদের– শুধুমাত্র মনোবলের দৃঢ়তা আর শিল্পকর্মের প্রতি, শিল্পজগতের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিকতাপূর্ণ সমমর্মিতাকে পুঁজি করেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। আর পরিপূর্ণভাবে সফলকামও হয়েছিলেন।

অদ্ভুত ব্যাপারটি হচ্ছে এই এবং বিস্ময়করও বটে যে, পার্টিশন-পরবর্তী দিনগুলোর একবারে সূচনা থেকেই এই শিল্পাঙ্গনের জয়যাত্রার দিকটি সেই সদ্য-স্বাধীন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্যে হুঁশিয়ারি পরোয়ানা [Warning at the same time a Threat]। আসলে অবস্থাটি হয়েছিল এমনই যে, আমাদের শান্তির নীড় সবুজ সজীব মৃত্তিকাভূমিতে দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অবসান ঘটলেও নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রের আওতায় ভিনদেশি সাংস্কৃতিক-শোষণ-যাঁতাকলের নিস্পেষণের পাঁয়তারা চলছিল তখন পুরোপুরি। তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আটচল্লিশ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শুভ সূচনা একদিকে, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশাপাশি অন্যদিকে জয়নুল আবেদনিরে নেতৃত্বে ও তাঁর সহযোগী শিল্পীদের উদ্যোগ-তৎপরতায় আর্ট ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা ছিল ওই আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়ানোর প্রাথমিক প্রস্তুতি। তার ইতিবাচক পরিণতির বিষয়টি আজ সর্বজনবিদিত– এবং বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সংগ্রামী ঊনসত্তর পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান একাত্তরে দেশের চারুশিল্পকর্মীদের সাহসী ভূমিকার কথা সংশ্লিষ্ট মহলের কারুরই অজানা থাকবার কথা নয়। সুতারাং দেশের শিল্পী সম্প্রদায়কে শুরু করে শেষাবধি আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও জয়নুল আবেদিন চিহ্নিত রুচির দুর্ভিক্ষ থেকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তৎপর থাকতে হয়েছে, এমনকি আজ পাঁচটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিল্পী-ভাস্করদের সামাজিক-অবস্থানের গ্যারান্টি নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্যে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে, নেতির সঙ্গে, এ সত্যটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেই তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে অশুভ বাধার পাহাড়, অন্যদিকে সৃজন-চেতনা উৎসাহিত দৃষ্টির জোয়ার– যা ডিঙিয়ে চলেছে সকল বাধা প্রতিনিয়ত। শিল্প যে শুধু সুন্দরের আরাধনা তা-ই নয়, শিল্প হচ্ছে সত্য, আর সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী– বাংলাদেশের শিল্পকলার জয়যাত্রা তারই প্রমাণ।

প্রজন্ম পরম্পরায় অসংখ্য অগণিত চারুকর্মী তৈরি হয়েছে এখানে। একেবারে সূচনালগ্নে প্রথম সারিতে ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটিশ আমলে জন্মগ্রহণকারী হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন শিল্পী-শিক্ষক। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত– আপন সৃজনক্ষমতার বদৌলতে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তরুণ বয়সেই। জয়নুল আবেদিনের 'তেতাল্লিশের স্কেচ্‌মালা' তাঁকে স্বীকৃতির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, এছাড়াও অঙ্কনবিদ্ ও জলরঙবিদ্ হিসেবে তাঁর শক্তিমত্তার তুলনা তিনি নিজেই। টেম্পারা-তেলচিত্র-ছাপাইছবি [কাঠখোদাই] ও মিশ্রমাধ্যমের কাজেও তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। পঞ্চাশের দশকে আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী সমবিমূর্ত-প্রকাশবাদী কাজেও চমৎকার সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর *বিদ্রোহ, সংগ্রাম, মনপুরা-'৭০ ও আবহমান বাংলা* প্রভৃতি ছবি আমাদের পঞ্চাশ বছরের শিল্পতালিকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত বলিষ্ঠ শিল্পকর্ম। কামরুল হাসান লোকজ শিল্প-ধারা অনুসৃত বর্ণ-প্রকরণ, রেখা ও ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী চেতনার সম্মিলনে তাঁর শিল্পভুবন

গড়ে তুলেছিলেন। মাধ্যম-প্রকরণও ছিল বিচিত্র। তাঁর *উঁকি, নাইওর, তিনকন্যা* প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির পাশাপাশি 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শীর্ষক অসাধারণ ব্যঙ্গচিত্র তাঁকে অমর করে রাখবে। আমাদের শিল্পাঙ্গনে সমকালেও সক্রিয় প্রবীণ শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন চল্লিশের দশকে। তেলচিত্রে জড়জীবন ধাঁচের ছবির জন্যে ছাত্রজীবনে পুরস্কৃত হলেও ছাপাইছবি মাধ্যমেও তাঁর সাফল্য গগনচুম্বী। তাঁর *সাঁওতাল রমণী, বাড়ির পথে, ময়ূরাক্ষী, বিক্ষুব্ধ মৎস্য* এবং মহান একুশ ও একাত্তরের স্মরণে সিরিজ চিত্রসহ অজস্র তেলচিত্র, ড্রইং ও ছাপচিত্র এখনও নবীন-তরুণদের অনুপ্রাণিত করে। শিল্পী আনোয়ারুল হক ছিলেন ব্রিটিশ পদ্ধতির জলরঙের সুদক্ষ সৃজনশিল্পী– যাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশের দশক ও তৎপরবর্তীকালেও জলরঙের প্রথাগত শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিল অনেকদিন। তেলরঙে একাডেমিক স্টাইলে প্রতিকৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং শেষজীবনে নিরীক্ষাধর্মী তেলচিত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। এস.এম. সুলতান সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিমণ্ডলের বাসিন্দা হিসেবে কাটিয়ে গেছেন তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পীজীবন। বিশাল ক্যানভাসে, দেশি শিল্প-উপকরণে, স্বদেশের প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজজীবনের চিত্রাঙ্গন ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। চিরকুমার সাধু-সন্ত শ্রেণির মানবতাবাদী আদর্শের মানুষ সুলতান এক ভিন্নধর্মী শিল্পাদর্শ স্থাপন করে গেছেন এদেশের শিল্পাঙ্গনে। তাঁর 'প্রথম চারা রোপণ' সহ অজস্র উজ্জ্বল ড্রইং ও তেলচিত্রের জন্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এদেশের দর্শক-সাধারণের অন্তরে, মানুষের অন্তরে। ১৯৫০-এর কলকাতা আর্ট স্কুলের স্নাতক শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া [যিনি প্রথম প্রজন্মের শিক্ষকবর্গের কিছুকাল পরে যোগদান করেছিলেন শিক্ষক হিসেবে ঢাকাস্থ তৎকালীন চারুকলা শিক্ষায়তনে] এদেশের শিল্পাঙ্গনের অন্তত প্রথম তিনটি দশকের সবচেয়ে প্রভাবশালী সৃজনশিল্পী। বলা যায় এদেশের আর কোনো শিল্পধারা-আঙ্গিকের এমন অনুসরণ দেখা যায়নি– যা কিবরিয়া ও তাঁর কাজকে কেন্দ্র করে হয়েছে। অত্যন্ত সৃজনশীল পরিশীলিত রুচিবান নির্বস্তুক চিত্রশিল্পী ও ছাপচিত্রী মোহাম্মদ কিবরিয়া এখনও উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের অনুপ্রেরণা। তাঁর প্রথম দিকের নিরীক্ষাধর্মী তথা সমবিমূর্ত চিত্রকর্ম 'চন্দ্রালোকে সাদা ঘোড়া' একখণ্ড আমাদের আধুনিক শিল্পযাত্রার 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত।

পঞ্চাশের দশকের যাঁরা শিল্পকলার শিক্ষার্থী হিসেবে তৎকালীন চারুকলা শিক্ষায়তনে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নাম-যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা চারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায়, বিভিন্ন মাধ্যম-প্রকরণ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এদেশের চারুকলা চর্চার সম্প্রসারণ ঘটান ও প্রকৃত অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনেন। নিরীক্ষাধর্মী আধুনিক শিল্পচর্চাতেও তাঁদের ব্যুৎপত্তি একইসঙ্গে অগ্রজদের সৃজন-সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং সমকালের উদীয়মান নবীন-তরুণ শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে। বলাবাহুল্য সেই সম্মিলিত শিল্পপ্রয়াসের সামগ্রিকতা চারুকলা চর্চার পাকা ভিত্তি গড়ে তোলে। স্বাধীনতা পূর্বকালের সেই দু'টি দশকের চারুশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হচ্ছেন: আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, ইমদাদ হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, জুনাবুল ইসলাম, প্রাণেশ মণ্ডল, নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, কাজী আব্দুল বাসেত, গোপেশ মালাকার, আবু তাহের, হাশেম খান, রমেন কুমার সাহা, শামসুল ইসলাম নিজামী, আব্দুস সামাদ, আনোয়ার হোসেন, কেরামত মওলা, মইনুদ্দিন, ফিরোজ মাহমুদ, মুন্‌শী মহিউদ্দিন, রফিকুন নবী, মাহমুদুল হক, কাজী শামসুল বাসেত, আব্দুল কাদের, হামিদুজ্জামান খান, আনসার আলী, বজলুল করিম,

আমিরুল ইসলাম, শাহাদাত চৌধুরী, রেজাউল করিম, আব্দুল মান্নান, এস.এম. খালেদ, রণজিৎ নিয়োগী, এড্লিন মালাকার, মনজুরুল হাই, মতলুব আলী, বীরেন সোম, শহীদ কবির, শিরিন সুলতানা, ফরিদা ইউসুফ, আখতারুন্নাহার, আহ্মদ উল্লাহ, রমজান আলী, মোকসেদ আলী, আবুল বারক আল্ভী, আব্দুস সাত্তার, হুসনে জামাল, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, খুশরুখ কবীর, সিতারা ইব্রাহীম, মধু মোল্লা, আহসানুল আমিন, এস.এস.এ. শফি, মতিউর, আশফাক ওসমান, বিজয় সেন, সুরঞ্জন, সুনীল পাল, আব্দুল হাই, কিশোয়ার জাহান, আব্দুস সবুর, মীর মোস্তফা আলী, নূরুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, হুমায়ুন আহমেদ, এ.কে.এম.এ. রউফ, কাজী আব্দুর রউফ, শামসুল আহসান, মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ মোহসীন, মবিনুল আজিম, হামিদুর রহমান, নভেরা আহমেদ, শাহতাব, দেলোয়ার হোসেন, আনোয়ারুল হক পিয়ারু, গোলাম সারোয়ার, মনসুর-উল-করিম, স্বপন চৌধুরী, হাসি চক্রবর্তী, বনিজুল হক, মাহবুবুল আমিন, আব্দুস শাকুর, মিজানুর রহিম, শামসুল ইসলাম, আব্দুল মুক্তাদির, রফিকুল আলম, কালিদাস কর্মকার, কাজী গিয়াসউদ্দিন, আনোয়ার জাহান, মাসুদা মনসুর, মাহমুদা খাতুন, নজরুল ইসলাম, মনোজ বাবু মিশ্র, তাজুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মারুফ আহমেদ, ইব্রাহিম, সুবীর চৌধুরী, নাসির বিশ্বাস, আলী হুমায়ুন, কাজী হাসান হাবিব, আসেম আনসারী, সৈয়দ লুৎফুল হক, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, আবুল মনসুর, কাজী মতিউর রহমান ও এ.কে.এম.এ কাইয়ুম প্রমুখ। এ তালিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় অবশ্যই। তবু ষাটের দশকের শেষপাদে এসে সক্রিয় শিল্পী তালিকায় এখানে উল্লেখকৃত চারুকর্মীদের বাইরে হয়তো খুব বেশি নাম পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে ফিরিস্তি দেয়া সম্ভব হল না স্বল্প পরিসরের কারণে। তবে এটুকু না বললেই নয় যে, উপর্যুক্ত শিল্পীরা সবাই শেষ পর্যন্ত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে থাকেননি– এবং অনেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, বলিষ্ঠ সৃজনকর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, স্বনামধন্যও হয়েছেন। দেশের চারুশিল্পের অঙ্গন তাঁদের কল্যাণে বহির্বিশ্বেও মর্যাদার আসন পেয়েছে।

সত্তর থেকে আশির দশক এবং তারপর এই চলতি নব্বই-এর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের চারুশিল্পী তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও অজস্র উজ্জ্বল নাম এবং শিল্পধারা-আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এসেছে এই পর্যায়ের শিল্পকর্মীদের দ্বারা। বাংলাদেশের সৃজনশিল্পের অঙ্গনে তাঁরা অনেকেই স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং প্রভাবশীল অস্তিত্বেই কর্ম-স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামঃ চন্দ্র শেখর দে, এ.কে.এম. আলমগীর, রফিক হোসেন, শামীম সিকদার, মোমিনুল রেজা, ফরিদা জামান, নাইমা হক, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, রতন মজুমদার, রাসা, অলক রায়, অলকেশ ঘোষ, তরুণ রায়, নূরুন নাহার পাপা, আইভী জামান, এনামুল হক এনাম, জি.এস. কবির, রণজিৎ দাস, তন্দ্রা দাস, সুলতানুল ইসলাম, মৃণাল হক, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, মাহবুব আকন্দ, অশোক কর্মকার, নুজহাত জামাল, হাবিবুর রহমান, কাজী রফিক, বুলবন ওসমান, প্রশান্ত কর্মকার, মাহবুবুর রহমান, দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চামান, আলাউদ্দিন, বুলবুল, শওকাতুজ্জামান, মেজর হারুনুর রশীদ চৌধুরী, এ.এন. ডাবলু নায়লা, ঢালী আল মামুন, নিসার হোসেন, আজিজ শরাফী, শিশির ভট্টাচার্য, মুর্শিদা আরজু, আবু সাইদ তালুকদার, আব্দুস সালাম, আজাদী পারভীন, আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার, আমিনুল হাসান, আহমেদ নাজির, আতিয়া ইসলাম এ্যানি, ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ, ফজলে আলী কচি, উম্মে সালমা, এজাজ এ. কবীর, ওসমান পাশা, ওয়াকিলুর রহমান, কাজী হাসিবুল আহমেদ, কাজী রকীব, কনকচাঁপা চাক্মা, খুরশীদ আলম সেলিম, জামিরুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, রুহুল

আমিন কাজল, খালিদ মাহমুদ মিঠু, গুলশান হোসেন, গৌতম চক্রবর্তী, গোলাম রব্বানী শামীম, গৌতম পাল, জাকির খান চন্দনা, ঝুনু আকতার, টি. এ. কামাল কবির, টিনা আহমেদ, শাহরিয়ার তালুকদার, তৌফিকুর রহমান, দীপা হক, নাজলী লায়লা মনসুর, নাসিমা হক মিতু, নাহিদা শরমিন, নাসিম আহমেদ নাদভী, প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, প্রণব মিত্র চৌধুরী, ফয়েজুল আজিম (জেকব), বিপুল সাহা, বাদল চক্রবর্তী, বেবী সুলতানা, মনিরা সুলতানা, মো. ফয়েজী আলী, মোজাম্মেল খান শাহীন, মো. নজীব, মো. মুসলিম মিয়া, এম.আর. দিদার, মো. ফারুক আহমেদ, মো. রাশেদ মজিদ, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইফুল ইসলাম, মাসুদা কাজী, মো. আব্দুস সালাম, সাইদুল হক জুইস, ফারেহা জেবা, মো. ফজলুল করিম, মোস্তাফিজুল হক, মো. আমিরুল মোমেন চৌধুরী, মো. ইকবাল, মনিরুল ইসলাম (২), মো. ফখরুল ইসলাম, মো. জসীমউদ্দিন, মামুন কায়সার, মোরশেদ চৌধুরী, মহসীন কবীর, মুকুল কুমার বাড়ৈ, মোখলেসুর রহমান, মো. মাহবুবুল ইসলাম, মোবাশ্বির আলম মজুমদার, ময়নুল ইসলাম, মো. শেখ সাদী ভুঞা, মো. দরদী আজম, মাহমুদা আখতার মণি, মুকুল মুকসুদ্দীন, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মো. তরিকত ইসলাম, মো. রাজিউদ্দিন চৌধুরী, মো. জহিরউদ্দিন, মো. বজলুর রহমান টিপু, রফি হক, রয়েল চৌধুরী, আনছারুল রহমান, রাশেদুল হুদা, রেজাউন নবী, লালারুখ সেলিম, লায়লা শার্মিন, শামসুদ্দোহা, শফিকুল কবীর, শরীফ মো. মোস্তাফিজ বাদশা, শামছুল সালেহীন আখন্দ (সুমন), শেখ আফজাল হোসেন, শ্যামল চৌধুরী, শহীদুল ইসলাম নিজামী, সজল বসাক, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী পাপ্পু, শাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দ শাহাদত হোসেন মিন্টু, সেলিনা চৌধুরী মিলি, সিদ্ধার্থ তালুকদার, সৈয়দ সাইফুল, কবীর, সমীর চৌধুরী, সমীরণ দত্ত, সৌমেন দাশ, সঞ্জীব কুমার দত্ত, সুফিয়া বেগম, সারিনা সুলতানা রিমা, সুভাষ আচার্য ও হাবিবা সুলতানা (বেলী সরকার) প্রমুখ। অনিবার্য সঙ্গত কারণে এ তালিকাও অসম্পূর্ণই থেকে গেল। আর, পৃথকভাবে শিল্পীদের কর্মপরিচিতিও প্রদান করা সম্ভব হল না ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে এই পর্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তা হল স্বাধীনতা-উত্তরকালে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই স্বনামে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রবীণ শিল্পীদের কাজ থেকে শুরু করে উদীয়মান নবীন শিল্পীদের বহু কাজ আমরা পেয়েছি। সেগুলোতে সুনিপুণ কলাকৌশল আর কারিগরিতা-দক্ষতার সুষ্ঠু সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ কাঠামোগত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে জোরালো সেইসমস্ত কাজ আমাদের দেশের গুণবান শিল্পকর্মীদের বিস্ময়কর প্রতিভা ও সৃজনশক্তির পরিচয় বহন করেছে। কিন্তু সেইসমস্ত নন্দিত শিল্পকর্মের অধিকাংশের ভিতর যতখানি পরিকল্পিত আবেষ্টনীর প্রকাশ লক্ষ করা যায়, ঠিক ততোখানি গভীরতাসম্পন্ন সুচিন্তিত চেতনার প্রতিফলন তাতে সচরাচর থাকে না। আমাদের আশা– শিল্পকাজের চিরায়ত চিন্তা ও মননের সর্বাঙ্গীণ স্বাক্ষর বুকে নিয়ে আমাদের চারুশিল্পের মুক্তাঙ্গন মুখরিত হোক। ভরিয়ে তুলুক অতীতের মতোই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আমাদের কর্মচঞ্চল শিল্প-সাংস্কৃতিক নিজস্ব ভুবনখানি। চারুশিল্পীদের দানে-অবদানে স্বদেশের শৈল্পিক সাফল্য বিশ্বশিল্পকলাকেও করুক আলোড়িত। বিদগ্ধ গুণী-শিল্পকর্মীদের কর্মিষ্ঠ হাতের কুশলী দক্ষতা এবং সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত প্রয়াসে তা আরও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা করুক এবং আমাদের শিল্পকর্মের মাহাত্ম্যে শনৈঃ শনৈঃ আমাদের মাতৃভূমি গৌরবান্বিত হোক তাই কাম্য।

আমাদের শিল্পাঙ্গনে পেশাদারিত্বের দিকটি যেমন অধুনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, ঠিক একইভাবে ব্যবহারিক শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সৃজনশীল গুণমানের পরিচয়টা বেড়েছে। গৃহাভ্যন্তরের স্থায়ী

দেয়ালসজ্জা, কিংবা সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্যে তোরণ, মঞ্চ কিংবা উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে এদেশের চারুকর্মীরা চমৎকার ঐতিহ্য দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। পঞ্চাশ-ষাট দশকের শক্ত বুনিয়াদের উপরই তার ভিত্তি রচিত হলেও স্বাধীনতা-উত্তর এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে তা প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেছে। এছাড়া সৃজনশীল হস্তশিল্প যেমন মুখোশ, পুতুল বা মাটি ও বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র, অথবা সৃজনশীল বাটিক প্রভৃতি চমৎকার 'এক্সপোর্ট কোয়ালিটি'তেই তৈরি হচ্ছে। ইদানিং আমাদের স্বর্ণালঙ্কারও বাইরে পাঠানোর বাস্তব পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তরকালে গ্যালারি বিকশিত হয়েছে এখানে দু'ভাবে। একেবারে সাধারণ অর্থে শিল্পসম্ভার বা অ্যান্টিকের বিক্রয়স্থল, যেখানে, সাধারণ মানের বা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন ল্যান্ডস্কেপ, প্রতিকৃতি কিংবা বাস্তববাদী ও সমবাস্তববাদী কাজ বিক্রির সুযোগ রয়েছে, আবার উচ্চমানসম্পন্ন সৃজনকর্ম প্রদর্শিত হতে পারে এমন ব্যবস্থাও হয়েছে অল্পবিস্তর। আর সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও এই দিকটি ক্রমবিকশিত হচ্ছে।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে প্রদর্শনীর আয়োজন ঘন ঘন খুব ব্যাপকভাবে কমই হত। তবু সক্রিয় শিল্পীরা প্রদর্শনী করতেন, একক বা গোষ্ঠীগত। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সংগঠিত সত্তর সালে 'নবান্ন' প্রদর্শনী এবং 'কালবৈশাখী' চিত্র প্রদর্শনী দু'টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার পর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীর আয়োজন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়ার্কশপ, আর্ট অ্যাপ্রেসিয়েশন কোর্সেও হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন আর্ট গ্রুপ গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে এবং তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনের সক্রিয়তা সুনিশ্চিত হয়েছে। তবে সুস্পষ্ট জোরদার বা প্রভাবশালী কোনো শিল্প-আন্দোলন এ থেকে এখনও হয়নি– যদিও শিল্পীসমাজের কোনো কোনো অংশ এ ব্যাপারে উদ্যোগ একাধিকবার নিয়েছেন।

শিল্পকলা বিষয়ক প্রকাশনা কিছু কিছু হচ্ছে। আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মোটামুটি একটা ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এ বিষয়ে। কিন্তু সেগুলোর মুদ্রণমান বা প্রোডাকশন-মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'টেক্সট্' বা তথ্যাদি পরিবেশন সচরাচর হচ্ছে না। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম থাকলেও এ-সংক্রান্ত অসম্পূর্ণতা অবশ্যই নজর এড়ায় না।

বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের শিল্পচর্চার ইতিহাসে শিশু চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয়ের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। বহু পাশ করা শিল্পী ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে নিজেদের শিল্পচর্চার পাশাপাশি এরকম প্রতিষ্ঠান খুলে খানিকটা আয়-রোজগারের সুরাহা করলেও শিশুদের শিল্পমনস্ক করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া শিশু সংগঠনগুলো এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে বরাবর। আর আমাদের শিশু চিত্রশিল্পীরা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের গৌরব অর্জন করছে ফি-বছরই।

বাংলাদেশ টেলিভিশন, ডিজাইন সেন্টার প্রভৃতি সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাড-ফার্ম, মুদ্রক-প্রকাশক বা অন্য ধরনের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিল্পীদের সমাবেশ বেশি। ওইসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের চারুশিল্পীরা ব্যবহারিক নকশি-কাজে কিংবা প্রডাকশন-ডিজাইনের ক্ষেত্রে শিল্পিত রুচি গড়ে তোলার প্রেক্ষিতে অবদান রাখছেন। বর্তমানে এর সম্প্রসারণ ঘটেছে। ব্যঙ্গচিত্রের ক্ষেত্রটিও প্রসার লাভ করেছে।

বাংলাদেশে শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও ক্যালিগ্রাফিক ছবির অগ্রগতি খুবই সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে। প্রতিকৃতি-চর্চাও আগের মতো ব্যাপক নয়। পেশাদারি শিল্পী সাইফুল

ইসলামের মাধ্যমে এ দিকগুলো মোটামুটি চর্চিত হচ্ছে। ব্যবহারিক গুণ-মানের প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একাধিক সৃজনশিল্পী তথা 'ক্রিয়েটিভ পেইন্টার' সক্রিয় রয়েছেন।

আমাদের দেশে প্রচলিত চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রম সাধারণ অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, হতে পারছে না নানান কারণেই। আর তা ত্রুটিমুক্ত নয় বলে শিল্প-শিক্ষার ধারা যথাযথ হতে পারছে না। ফলে আমাদের উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসম্পূর্ণ শিক্ষা হেতু নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। বিশেষত হাতে-কলমে শিল্প-শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি (যা হয়তো আমাদের প্রবীণ শিল্পীরা বিভিন্নভাবে কমবেশি আত্মস্থ করেছিলেন) এবং শিল্পকলা উপভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে এসব ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থা আরোপ করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। বলা যায় এক্ষেত্রে বর্তমানের সামাজিক-পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল রেখেই যেন খানিকটা 'মেকানিকাল' অবস্থা বিরাজ করছে। আমাদের প্রবীণ শিল্পীরা এবং অনেক নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে সুদক্ষ এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য থেকে নানান শিল্প- অভিজ্ঞতা ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তাঁরা বাস্তব কারণেই আপন আপন ক্ষেত্রে হয়তোবা আশানুরূপ অবদান রাখতে যেমন পারছেন না, ঠিক তেমনই তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পীদের তথা শিল্পাঙ্গনের মঙ্গল-প্রশ্নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের প্রমাণও তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটি হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই।

পাশ্চাত্যের আধুনিক বিমূর্ত ও নির্বস্তুক রীতি-নীতির অনুসরণ এদেশের শিল্পীদের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল, এখন আরও ব্যাপকতা পেয়েছে। আর প্রাধান্য-হেতু তা দর্শক-সাধারণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়, এবং সাধারণ দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই একটি শ্রেণির সৌখিন বিলাসিতা বলে মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গটি সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে তুলে ধরা হল। ব্যতিক্রমধর্মী নিদর্শন যে নেই, তেমন নয়। কিন্তু তার উপস্থিতি একেবারেই সীমিত পর্যায়ে, অবশ্যই চোখে পড়বার মতো প্রভাবশালী নয়।

অবশ্য এখনও এই চর্চার ফসল সার্বিকভাবে সাধারণের মধ্যে বা আমাদের লোক-সমাজে ভিত্তি গাড়তে পারেনি, কেবল একটা উপরতলার ব্যাপারই রয়ে গেছে মাত্র। জীবিকার প্রাধান্য পড়াতে আমাদের দেশের শিল্পীসমাজ স্বাভাবিকভাবে একটা নিজস্ব পেশাগত পরিমণ্ডলের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট, এবং বাইরের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সাথে অবিচ্ছিন্ন নন– তাছাড়া মানসিকতার দিক থেকে শিল্পীরা একটুখানি নির্লিপ্ত থাকতে ভালোবাসেন। এই কারণে শিল্পকর্মীদের স্বভাবসুলভ আত্মকেন্দ্রিকতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতার দিক্‌টি আমাদের সামনে বড় হয়ে ওঠে। তাই নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলনও তাঁদের সৃজনশীল কর্মে কম পাওয়া যায়। কোনো একটা সমবেত প্রদর্শনীর প্রতি দৃক্‌পাত করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যাবে।

আমাদের শিল্পীরা বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করছেন। আর এর মধ্যেই নতুন প্রজন্মের মাঝবয়সী ও তরুণ সৃজনশীল কর্মীদের অনেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা স্থানা থেকে অধুনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছেন। ইদানীং ড্রইং, জলরঙ, স্কেচ্‌ প্রভৃতি মাধ্যমে প্রতি আমাদের শিল্পীদের এমনকি উদীয়মান শিল্পীদেরও তেমন একটা মনোযোগ দেখা যায় না যতটা তাঁদের দেখা যায় নিরীক্ষাধর্মী মিশ্র-মাধ্যমের প্রতি যত্নবান হতে। অবশ্য বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটি স্বাভাবিক প্রবণতা।

তেলরঙ ছাড়াও, মিশ্র মাধ্যম, অ্যাক্রিলিক ও টেম্পারা আধুনিক সময়োপযোগী মাধ্যম শিল্পীরা ব্যবহার করছেন। এগুলো ছাড়াও বাটিক ছাপচিত্রের মতো বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করছেন আমাদের

অনেক শিল্পী। এছাড়া আমাদের দেশের মৃৎশিল্প/সৃজনশীল মৃৎশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সৃজনশীল কর্মীদের প্রচেষ্টায় তা আজ বৈচিত্র্যময়। সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী অলক রায়ের 'টেরাকোটা' মাধ্যমে বিশেষ পারদর্শিতার সাথে সম্পন্ন সৃজনকর্মগুলো আমাদের শিল্পাঙ্গনে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। চীনে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আবু সাঈদ তালুকদার সৃজনশীল মৃৎশিল্পে নতুন মাত্রা এনেছেন। ভাস্কর্য বিষয়টি আমাদের দেশে খানিকটা ব্যাপকতা পেয়েছে। শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, আনোয়ার জাহান, হামিদুজ্জামান খান, এস.এ. খালিদ, রাসা, শামীম সিক্দার ও আরও কিছুসংখ্যক ভাস্কর এর প্রসারের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। নবীন-তরুণ ভাস্করদের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পপ্রয়াস ইদানীং সাড়া জাগাচ্ছে। রাজধানী ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের কাজের নিদর্শন লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের ভাস্কর্যে বাস্তববাদী নির্মাণশৈলীর সাথে আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী ধারার সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছেন আমাদের ভাস্করেরা। আর দেখা যাচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তাতে স্থান পাচ্ছে প্রত্যক্ষভাবেই। শিল্পী আব্দুর রাজ্জাকের 'মুক্তিযোদ্ধা', হামিদুজ্জামান খানের 'গণহত্যা সিরিজ' এবং এস.এ. খালিদের 'আবহমান বাংলা' কাজগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শামীম সিকদার রচিত একুশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভাস্কর্যগুলোর কথাও স্মরণযোগ্য। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত নিতুন কুণ্ডুর 'সাবাস বাংলাদেশ' নবতর ভাস্কর্য সংযোজন।

আমাদের দেশের শিল্পাঙ্গনের বিস্তৃতি ঘটলেও সেই তুলনায় শিল্পসমালোচনার দিকটি প্রসার লাভ করেনি। মোটামুটিভাবে শিল্পকলা-বিষয়ক লেখকের সংখ্যা পঞ্চাশ বছরে খুব একটা কম নয়, কিন্তু তবু প্রকৃত অর্থে শিল্প-সমালোচনার স্ট্যান্ডার্ড খুব আশাপ্রদ নয়। যাঁরা লিখছেন তো শিল্পকর্মীকে উৎসাহ ও পক্ষপাত জোগানোর জন্যে মূলত প্রশংসাসূচক বক্তব্য প্রদানই প্রাধান্য পাচ্ছে তাঁদের লেখায়– সেদিক থেকে হয়তো লেখাগুলো রচনা হিসেবে ভালোভাবেই উৎরে যাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় কম– ব্যক্তিগত মত প্রকাশ, আবার একইসঙ্গে যাঁর উপর লেখা হচ্ছে তাঁর কাছ থেকেই বক্তব্য শুনে এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঋণ নিয়েই দায়সারা গোছের রচনা তৈরি করা হচ্ছে। পত্রপত্রিকার সম্পাদক অর্থাৎ যাঁদের মাধ্যমে লেখাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে অথবা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তা ছাপছেন কিংবা বই আকারে বের করছেন– তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি যে, সমালোচনা-প্রেক্ষিত কেন্দ্রিক লেখার গুণমানগত ভালোমন্দের বিষয়টিকে তাঁরা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। ভাবটা যেন একটা কিছু লিখলেই হল বক্তব্য, অথবা ভাষায় দখল ও লেখার অভ্যেস থাকলেই তিনি সমালোচকও হবেন এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তাঁদের মনে ঠাঁই করে নিয়েছে। তাছাড়া সাহিত্যিক কিংবা সাংবাদিক হলেই তাকে শিল্পকলা বিষয়ক রচনার, উপরন্তু শিল্প-সমালোচনা করবার অধিকার প্রদানের বিষয়টি মনে হয় আমাদের মতো অনুন্নত মানস-পরিবেশেই সম্ভব। এই অনগ্রসরতার পেছনে অবশ্য শিল্পকর্মীদেরও নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, কারণ তাঁরাই তাঁদের কাজের সমালোচনা-নিরপেক্ষ লেখার জন্যে তাঁদের কাছেই ধরনা দিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁদের ভালো দিকগুলোকে একতরফা তুলে ধরবেন, দুর্বলতার বা পশ্চাদ্পদতার দিকে পিঠ্ ফিরিয়ে। এ সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি, তাই সংশ্লিষ্ট সচেতন ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা দরকার। বিভিন্ন গণআন্দোলনের ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের চারুশিল্পীদের দেশাত্মবোধক মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে। শিল্পীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন,

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পসম্ভারেও কিছুটা হলেও স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের এই সচেতনতার।

হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদের যৌথ নক্শা পরিকল্পনায় নির্মিত শহীদ মিনার এদেশের সকল গণআন্দোলনের শীর্ষস্থান। এই মিনারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্য সমতুল শিল্পনিদর্শন সন্দেহ নেই। মহান একুশকে উপজীব্য করে চারুশিল্পীরা ছবি এঁকেছেন বিস্তর, আর একাত্তরের স্মৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাভিত্তিক শিল্পকর্মও হয়েছে অজস্র, এখনও হচ্ছে– এগুলো অবশ্য সাধারণ অর্থে ফরমায়েশি ধাঁচটাই বেশি পেয়েছে। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, আবহমান বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে নবমাত্রা যোগ করেছিল তার মধ্য দিয়ে এদেশের শিল্পযাত্রাতেও প্রাণসঞ্চার হয়েছে। শুধু মাধ্যম-প্রকরণ বা আঙ্গিক-বৈচিত্র্যে নয়, চারুশিল্পকর্মীরা সৃষ্টির আনুকূল্য পেয়েছেন সর্বতোভাবেই। তাই এই পঞ্চাশ বছরে এগিয়ে চলার গানই শিল্পীরা গেয়েছেন সমবেতভাবে, পিছুটানের কোনো ইঙ্গিত সেখানে ঠাঁই পায়নি।

মাধ্যমের দিক থেকে, শিল্প-উপকরণের দিক থেকে সামগ্রিক অর্থে এবং বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পকলার পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। আর আমাদের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করেরা দেশের বিচিত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন কাজের ভেতর ছড়িয়েও আছেন। লক্ষণীয়, আজকাল শিল্পীদের কাজের পেশাগত দিকের সাফল্যের বিষয়টি বেশ আশাপ্রদ। তাঁদের সৃজনশীল কাজের মূল্যায়ন যথার্থভাবে না হলেও শিল্পীরা মোটামটি জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেকে বেশি সুযোগ পাচ্ছেন নানাভাবে। এ সমস্তই আশার কথা, সুউজ্জ্বল বাস্তব সম্ভাবনার কথা। দিনে দিনে চারুশিল্পচর্চার প্রসার এবং অসংখ্য শিল্পকর্মীর সমাবেশে আমাদের শিল্পাঙ্গন আজ কর্মমুখর। স্বাধীনতা-উত্তর নিকট সময়কালেও বেশ কিছুদিন এই ব্যাপ্তি এমন প্রত্যক্ষ ছিল না– আস্তে আস্তে বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভারত-শিল্প, নির্মলকুমার ঘোষ
২. জয়নুল আবেদিন, আবদুল মতিন,
৩. The story of Art., E.H. Gombrich.
৪. The Guinness Book of Art FACTS AND FEAT, John Fitz Maurice Mills.
৫. A Dictionary of Art & Artists, Peter & Linda Murray.
৬. Sociology & Introduction to the science of society, Semuel Koeing.Ph.D
৭. A Modern Book of Aesthetic, Melvin Rader
৮. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯. শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, সৈয়দ আলী আহসান
১০.শিল্পায়ন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১.চিত্রশিল্প: বাংলাদেশের, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
১২.শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব, মৃণাল ঘোষ
১৩. উপমহাদেশের শিল্পকলা, রফিকুল আলম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
১৪. Enciclopaedia of World Art.
১৫. Syed Mahmudul Hassan, Islamic Art

১৬. Santi Swarup, 5000 years of arts and Crafts of India & Pakistan
১৭. The meaning of Art. H. Read
১৮. Philosophy of Modern Art. H. Read
১৯. পালযুগের চিত্রকলা, সরসী কুমার সরস্বতী
২০. বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ওয়াকিল আহমদ
২১. আমাদের প্রাচীন শিল্প, তোফায়েল আহমেদ
২২. বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩. Folk Art of Bengal, Ajit Mukerjee
২৪. Art Through the Ages. Helen Gardner,
২৫. A Concise History of Modern Painting, Herbert Read
২৬. Arts & Ideas, William Fleming
২৭. শিল্প, শিল্পী ও সমাজ, বুলবন ওসমান
২৮. সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতি, বুলবন ওসমান
২৯. শিল্পপ্রকরণ ও করণকৌশল, ড. আবদুস সাত্তার
৩০. জয়নুলের জলরঙ, মতলুব আলী

[লেখক: অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।]

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

মলয় বালা

ভৌগোলিক অবস্থান আর দর্শনগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশিল্পকলায় প্রধানত দুটি ভিন্ন চিত্রধারা প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান। যার একটি পাশ্চাত্য, অন্যটি প্রাচ্য। মূলত ইউরোপ ও এশীয় চিত্রকলার ধরন ও চরিত্রের পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতাকে ঘিরেই এর সারাৎসার। যা মিশে আছে দুই সমাজের মানুষের জীবন-জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি ও সৃষ্টির গতিপ্রকৃতির মধ্যে। সেক্ষেত্রে জীবন-জগৎ প্রত্যক্ষণবোধের সাথে জড়িয়ে আছে বাণিজ্য, অর্থনীতি, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা ও সমাজসংসার নির্বাহের বৈচিত্র্য।

বৃহৎ বঙ্গের অতীত শিল্প-ঐতিহ্য সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী সময়ে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান ও মোগল শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিই বাংলার শিল্পকলার উত্তরাধিকার। এই সুদীর্ঘ সময়ের চিত্রকলায় একই সুরের ঐকতান লক্ষণীয়। যে সুরটিতে মিশ্রিত হয়েছে বৃহৎ প্রাচ্যশিল্পের নানান অনুষঙ্গ। চিত্রকলার এই সুরটিকে মূলত প্রাচ্যচিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যা দুটি ধারায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিকশিত হয়েছে। একটি শাসক-শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় *দরবারি চিত্রকলা*, অন্যটি গ্রামীণ জীবনের চাহিদা, স্বপ্ন আর অভিজ্ঞতাপুষ্ট *লোকজ চিত্রকলা*। এ দুই প্রকার চিত্রকলায় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে চিত্রকলার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে এবং বলা যায়, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রাচ্যচিত্রকলার রূপ নিয়ামকের ভূমিকা রেখেছে। এর অন্যতম কারণ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের বহু পরিবর্তন। রাজ্যশাসক যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, চিত্রকলা সে আদর্শেই রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চিত্রকলাকে প্রভাবিত করলেও শিল্পীরা নিজের সামগ্রিক সত্তা দিয়ে, স্বভাব দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ ও আনন্দকে খুঁজেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে।

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের বিচিত্র জনগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও আঞ্চলিক পরিবেশের লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যভাণ্ডার রঙিন। প্রকৃত শেকড়ের সন্ধান এবং প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবর্তন লোকশিল্পীদের কাজের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ জনপদের এসকল শিল্পী 'পটুয়া' নামেই পরিচিত। 'আমাদের দেশে এবং বলা যায় বিশ্বের সর্বত্র এখনকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না, যা ছিল কালানুপাতিক পরম্পরা শিক্ষা। তা কখনো গুরু কখনো বংশধারা।'[১] ফলে এ সময় শিল্পীদের কাজে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পটচিত্র, লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি, আলপনাসহ নানাবিধ উৎসব-পার্বণের চিত্রবিদ্যার সম্ভারে পরিপুষ্ট বাংলার লোকচিত্রকলায়, ঐতিহ্যকে লালন করার প্রতি শিল্পীদের বিশেষ আগ্রহই পরিলক্ষিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে

প্রাক-ঔপনিবেশিক দরবারি ও লোকজ চিত্রকলায় অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশ যুগলবদ্ধ হয়ে রূপের অন্তরালে অরূপের প্রকাশে মননের উদ্বোধন হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিকতা ও রেখার ব্যঞ্জনাময় বিন্যাস পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী (Three Dimentional) গুণকে হার মানিয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চার গোড়াপত্তন

ভারতীয় উপমহাদেশে চিত্রকলায় ঔপনিবেশিক শিল্পকলার প্রভাব পড়েছিল প্রায় ২০০ বছরের (১৭৫৭–১৯৪৭) ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের ফলে। বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে আগত পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের শিল্প-সংস্কৃতির আগমন ঘটে এ উপমহাদেশে। ফলে পরম্পরার ঐতিহ্যে লালিত চিত্রকলার নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্যসূত্রের ধারাবাহিকতার পথ রূদ্ধ হয়। 'উপনিবেশের রক্তচক্ষু আমাদের শাসিয়েছে, আমরা মানুষের চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট। আমরা বর্ণে হীন। আমাদের বিশ্বাস সংস্কার ভাবনার সর্বত্র মূঢ়তা, আমাদের জন্য যা কিছু স্বাভাবিক তাই বর্জনীয়। কারণ প্রভুর সংস্কৃতি উচ্চ সংস্কৃতি।[২]

কোম্পানি আমলে ইংরেজ পেশাদার শিল্পীদের স্টুডিয়ো (Studio) করে স্বাধীন চিত্রকলা অঙ্কন ও রোজগারের পথ ধরে এ দেশে বাস্তবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন। প্রথম এসব স্কুল কারিগরি বিদ্যা শেখানোর জন্য চালু হলেও ধীরে ধীরে আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষিত অধ্যক্ষদের পরিচর্যায় উচ্চাঙ্গের আর্ট স্কুলে পরিণত হয়েছে।[৩]

তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার শিল্পশিক্ষা। দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ ও ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। অর্থাৎ 'নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা technology-র শক্তিতেই পাশ্চাত্যশিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, আদর্শ দ্বারা নয়।'[৪] স্বচ্ছ জলরং, এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা আমাদের দেশে ছিল না, সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় এসব মাধ্যমের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় নতুন শিক্ষা ও নতুন আলোর আস্বাদ পেয়ে দেশীয় চিত্ররীতিকে অবজ্ঞা করতে শেখেন। 'শিল্প যে বিলাসিতার অনুষঙ্গ নয়, জাতীয়-জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর্ট স্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই.বি হ্যাবেল।[৫]

প্রাচ্যচিত্র ধারার পুনর্জাগরণ

১৮৯৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন হ্যাভেল। ই.বি হ্যাভেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ কয়েকজন শিষ্য ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা থেকে চিত্রকলাকে মুক্ত করার জন্য চিত্রে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার চর্চা শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে চীন-জাপানের চিত্রশৈলী, অন্যদিকে অজন্তা ও মোগল ভারতের চিত্রশৈলী আর কিছুটা হলেও পশ্চিমের একাডেমিক রীতির ব্যাকরণ মিলিয়ে এক নতুন চিত্রশৈলী গড়ে তুললেন, যা পরবর্তীকালে 'নব্য-বেঙ্গল স্কুল বা নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতি' নামে পরিচিত। প্রাচ্যরীতির পুনর্জাগরণ হিসেবে খ্যাত নব্য-বেঙ্গল স্কুল গড়ে ওঠার নেপথ্যে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামজিক প্রেক্ষাপটের স্বদেশি আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে পরিতোষ সেন যথার্থই লিখেছেন:

শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়রা এই সত্যটি তখন উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে পুনরুদ্ধার করে স্বদেশি শিল্প ও চারুকলার পুষ্টিসাধনে গভীরভাবে লিপ্ত না হতে পারেন, তা হলে আরোপিত প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না ।[৬]

এই মনোবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়, চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্বদেশ- চেতনা ও আত্মপরিচয়ের নবজাগরণ ঘটালেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, ঐতিহ্যের পরম্পরা এবং মৌলিকতার শেকড় সন্ধানে তাঁর আবিষ্কৃত চিত্রচর্চায় ফিরে আসে প্রাচ্যের হাজার হাজার বছরে অস্থি-মজ্জায় প্রবহমান দর্শন ও রুচিবোধের ভাবনির্ভর রূপনির্মাণ । অজন্তা ও মোগল চিত্রের প্রাণী ও মানব-মানবীয় ইন্ডিয়ান বাস্তবধর্মী আবেদনের সমাহারে তাঁর চিত্রকলা ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা হয়ে ওঠে । এ সময়ে জাপানের শিল্পপ্রবক্তা ওকাকুরা তেন্‌শিনের আগমন এবং স্বদেশি চেতনা জাগানো বক্তৃতা (Asia is One) নব্য-বঙ্গীয় চিত্র আন্দোলনের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছে ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ হয়ে যোগদান করার পর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্যরীতির চিত্রধারা চর্চার সূচনা ঘটে । এরপর 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' প্রতিষ্ঠা এবং এ সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নব্য-বেঙ্গল রীতি বা বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্ররীতি খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয় । বলা যায়, বিশ্ববাসীর কাছে Oriental Art বা প্রাচ্যশিল্প শব্দটি তৎকালীন সময় থেকেই প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে আসছে । পরবর্তী সময়ে ১৯১৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চায় এই প্রাচ্যরীতির আদর্শের চিত্রচর্চাকে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' এবং ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে Oriental Art বা প্রাচ্যকলা বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়ে আসছে । উভয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার নামকরণ (Indian Art, Oriental Art) যা-ই হোক না কেন, আদর্শগত জায়গা সম্পূর্ণ এক । উভয় পাঠ্যক্রমে Art শব্দটি যুক্ত থাকলেও বিষয়টিতে শুধু চিত্রকলা চর্চা করা হয় । ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় প্রাচ্যচিত্রকলা বিনির্মাণে প্রধান ভূমিকা রেখেছে । যা কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষার নতুন একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে । বলা যায়, এখান থেকেই বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার যাত্রা শুরু ।

প্রতিষ্ঠাননির্ভর চিত্রচর্চা ও প্রাচ্যকলা বিভাগ

অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠাননির্ভর চিত্রকলা চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে । সে সময় শিল্পী শশীভূষণ পাল খুলনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্ট' । এই স্কুলটি পশ্চিমা সাদৃশ্যবাদী পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধ ছিল । ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় স্থাপিত হয় 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' । চিত্রকলা প্রশিক্ষণে কলকাতা আর্ট স্কুলের ব্রিটিশ একাডেমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান শুরু হয় ।

এর কারণ হল আর্ট স্কুলের প্রথম পর্বের শিক্ষক জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পী কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন । তাঁরা যখন বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তখন স্বাভাবিক নিয়মেই কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমকেই অনুবর্তন করেছেন । তবে

তাঁরা পশ্চিমা একাডেমিক রীতির নির্মাণগুণে সিদ্ধহস্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে দেশজ ঐতিহ্য ও নব্য-বাঙালি ধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ কলকাতা আর্ট স্কুলের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় শিল্পরীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলেও প্রাথমিক পর্বে দেশজ বিষয় ও প্রেক্ষাপটের কথা মনে রেখেছেন।[৭] ফলে আর্ট স্কুলকে যখন কলেবরে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন জয়নুল আবেদিন দেশীয় চিত্রকলা চর্চার ঐতিহ্য বিকাশের জন্য প্রাচ্যকলা বিভাগ সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৮] যেহেতু বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষায় প্রত্যেক বিভাগ কলকাতা আর্ট স্কুলের অনুরূপ আদলে গঠন করেছিলেন সেহেতু দেশীয় চিত্রকলা চর্চার প্রয়োজনীয়তায় কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির আদলে প্রাচ্যকলা বিভাগ গঠন করা হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত চিত্ররীতি কলকাতা আর্ট স্কুলের তাঁর প্রথম পর্বের ছাত্রদের চর্চায়, নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির আদলে গড়ে ওঠে। এ ধারাটিই কলকাতা আর্ট স্কুলের চর্চায় 'ইন্ডিয়ান আর্ট' হিসেবে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু হয়েছিল ১৯১৬ সালে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চায় ১৯৫৫ সালে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বিভাগের অনুরূপ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নামের পরিবর্তন হওয়ায় প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ দেশবিভাগের পর বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা। রাজনৈতিক কারণে 'ইন্ডিয়ান আর্ট' শব্দটি ব্যবহার করাও ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ফলে বিভাগ হিসেবে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারা বা ইন্ডিয়ান আর্টের অনুরূপ শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এল। নতুন নামকরণ হল Oriental Art বা প্রাচ্যকলা। এই বিভাগে পাঠ্যক্রমে শিল্পের অন্যান্য শাখাও যুক্ত হয়। তবু আর্ট বা কলা শব্দটি যুক্ত হয়ে Oriental Art হিসেবে পরিচিত হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ২০০৮ সালে আরেক ধাপে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ২০০৮ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ অনুষদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। 'চারুকলা ইনস্টিটিউট' নামটি 'চারুকলা অনুষদ' নামকরণ হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা

১৯৪৮ সালে ঢাকায় 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' নামে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল, এরই ধারাবাহিকতা ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম শহরে চারুকলা কলেজ নামক একটি চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যরীতির চারুকলা চর্চার কোনো বিভাগ চালু হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৮ সালে রাজশাহী মহানগরীতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে পরিণত হওয়ায় শিক্ষা পাঠ্যক্রমসহ অন্যান্য নিয়মাবলি সমৃদ্ধ মহাবিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের। এ সময় ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে দুই বছরের প্রাক-ডিগ্রি এবং তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি পর্যায়ের লেখাপড়া করানো হত। স্নাতক পর্যায়ে ব্যবহারিক বিষয়ের পড়াশোনা ছিল—চিত্রকলা, গ্রাফিক ডিজাইন, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুকলা, মৃৎশিল্প ও প্রাচ্যকলা। শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত বিষয়ের যেকোনো একটিকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে অন্য যেকোনো একটি বিষয়কে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন।[৯]

প্রাচ্যকলা চালু থাকলেও শিক্ষকের অভাবে এ বিষয় নিয়ে কেউ পড়াশোনা করেননি। এরপর মহাবিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে অন্তর্ভুক্ত চারুকলা বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চারুকলা বিভাগে পাঠ্যসূচি হিসেবে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চিত্রকলা, গ্রাফিক ডিজাইন, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুকলা, মৃৎশিল্প ও প্রাচ্যকলার মতো পূর্ণাঙ্গ বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখেই সেগুলোকে গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা গ্রুপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের চার বছরমেয়াদি অনার্স কোর্স চালু হয় সিলেবাসকে অক্ষুণ্ন রেখে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যকলা গ্রুপে কোনো শিক্ষক না থাকায় প্রথম শিক্ষাবর্ষগুলোতে কোনো ছাত্র ভর্তি হননি। এরপর ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষে শংকর মজুমদার ও মামুন নামে দুজন ছাত্র ভর্তি হন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকশূন্য অবস্থায় তাঁদের পড়াশোনা চলতে থাকে। এরপর ২০০১ সালে শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে রাজশাহী চারুকলা বিভাগের প্রাচ্যকলা বিভাগের হাল ধরেন। পরবর্তী ব্যাচগুলোতে নিয়মিত ছাত্র ভর্তি হয়েছেন এবং সুশান্ত কুমার অধিকারীর নির্দেশনায় রাজশাহী চারুকলায় প্রাচ্যরীতির চিত্র ঘরানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রাচ্যকলা গ্রুপে সহকর্মী হয়েছেন।

শিল্পী সুশান্ত কুমার যোগদান করার পর প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার ওয়াশ পদ্ধতি ও টেম্পারা পদ্ধতির চিত্রকলায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বিশেষত, প্রাচ্যরীতির ওয়াশ পদ্ধতির কাজে সমসাময়িক বাস্তবতার বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে উঠে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের টেম্পারা (ওয়াশ টেম্পারা, অ্যাক্রেলিক টেম্পারা) পদ্ধতির কাজে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যাকে রাজশাহী চারুকলার কাজ হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ এক ধরনের স্বতন্ত্র ঘরানার ছাপ লক্ষ করা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে।

খুলনা আর্ট কলেজ ও অন্যান্য আর্ট কলেজের প্রাচ্যকলা

রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের পর 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট' ১৯৮৩ সালে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরিত হয়। মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্নে কলকাতা আর্ট স্কুলের সিলেবাস/পাঠ্যক্রম অনুসরণে করা হয়েছিল। কলেজটি ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। এ সময় ডিগ্রি পর্যায়ে ভাস্কর্য, পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট বিষয়গুলো পড়ানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মতো প্রাক-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী এখানের প্রাচ্যকলা বিষয়ের পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল।[১০]

বিমানেশ বিশ্বাস ১৯৮৪ সালে খুলনা আর্ট কলেজে প্রভাষক পদে যোগ দেন। তিনি ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যরীতির কাজের প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। জলরং-প্রধান কাজে প্রাচ্যরীতির ওয়াশ ও রেখার ব্যবহার তাঁর কাজে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া তিনি ছাত্রজীবনে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলার অন্যতম শিক্ষক আব্দুস সাত্তারের সান্নিধ্যে প্রাচ্যরীতির কাজ অনুশীলন করেছেন। আব্দুস সাত্তারের সাথে অনেক কাজ করেছেন। ফলে শিল্পী বিমানেশ বিশ্বাস প্রাচ্যরীতির ফ্রেসকো, ক্যালিগ্রাফি, কপিওয়ার্ক, জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে খুলনা আর্ট কলেজে ওরিয়েন্টাল বিষয় অধিভুক্ত হওয়ার পরের তিনটি ব্যাচে তিনি প্রাচ্যকলা বিষয়ের ক্লাস

নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রাচ্যকলার শিক্ষক নিয়োগে অপারগ হওয়ায় এ বিষয়ে পড়ানোর অনুমোদন বন্ধ হয়ে যায়। অতএব বলা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন খুলনা আর্ট কলেজে প্রাচ্যকলা বিভাগ তিনটি শিক্ষাবর্ষের জন্য হলেও চালু ছিল। যার তত্ত্বাবধান বা শিক্ষকতার দায়িত্বে ছিলেন বিমানেশ বিশ্বাস।

১৯৯৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনে রাজশাহী শহরে 'রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চারুকলা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা বিষয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।[১১]

বাংলাদেশের প্রাচ্যধারার চর্চারত শিল্পী ও তাদের কাজের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার অতীত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশবিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের চিত্রকলার শেকড় সন্ধানে ব্রতী হয়েই বাংলাদেশের একমাত্র শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে চারুকলার অন্যান্য বিভাগের সাথে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা আর্ট স্কুলের নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির পাঠ্যক্রমের আদলে। বলা যায়, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারায় এ প্রতিষ্ঠানেই প্রথম 'প্রাচ্যকলা' নামকরণ ব্যবহৃত হয়। এই বিভাগে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা শিক্ষার প্রাঠ্যক্রমে ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যচিত্রধারায় বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৯৫৫ সালে বিভাগটি চালু হওয়ার সময় ও বিভাগে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন তাঁরা কেউই প্রাচ্যরীতির চিত্রধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরবর্তী (১৯৭১-এর পর) প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিল্পীশিক্ষক আব্দুস সাত্তারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ মাত্রা পায়। এর পূর্ববর্তী সময়ে খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। যাঁদের মধ্যে তাজুল ইসলাম অন্যতম। শিল্পী আব্দুস সাত্তারের প্রথম দিকের ছাত্র শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান এবং শিল্পী নাসরীন বেগম বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের কাজে। এঁদের মধ্যে শিল্পী নাসরীন বেগম ও শওকাতুজ্জামান শিক্ষকতায় যোগ দিলে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় বিশেষ জোয়ার আসে এবং ১৯৯০-এর দশক থেকে প্রাচ্যচিত্রকলা একটি আন্দোলনে রূপ নিয়ে বর্তমান অবধি চলমান আছে। অতএব, সে বিচারে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারার সক্রিয় আন্দোলন ও অবদান মূলত খুব বেশি দিনের পূর্বেকার নয়। যাকে সাম্প্রতিক সময়ের চলমান একটা শিল্পধারা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম ও টেকনিকে চিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা এ প্রজন্মের তরুণ শিল্পীরাই।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা ধারায় প্রধান পুরুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ বহু মাধ্যমে কুশলী এই শিল্পী প্রাচ্যচিত্রকলায় নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছেন প্রাচ্যচিত্রকলার রীতি পদ্ধতিকে আধুনিকতায় উন্নীত করে। তাঁর দেখানো পথ ধরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা প্রাচ্যচিত্রকলাকে আধুনিকতায় উন্নীত করে চলেছেন।

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের পরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলায় যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন—শিল্পী রফিক আহমেদ, শিল্পী শওকাতুজ্জামান ও শিল্পী নাসরীন বেগম। এঁদের প্রত্যেকের কাজে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিশেষত শিল্পী নাসরীন বেগম প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাকে নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষে উপলব্ধ করাতে সক্ষম হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক

প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চায় শিল্পী আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমকে এই ধারার সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে ১৯৯০-এর দশকে। এই দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত খুলনা আর্ট কলেজে প্রাচ্যকলা চর্চা শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যকলা চর্চায় যেসব বিষয় ও টেকনিক চর্চা করা হয় তা পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি-পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। ওয়াশ, গোয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেসকো মাধ্যম যার অন্যতম। এ ছাড়া ক্যালিগ্রাফি, ম্যুরাল, পাণ্ডুলিপি চিত্রণের মতো ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করে যাচ্ছেন শিল্পীরা। যা বিশ্বশিল্পকলায় স্বতন্ত্রতার দাবি রেখে আসছে এবং বিশ্বচিত্রকলায় প্রাচ্যচিত্রকলাকে নতুন নন্দনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীগণের অধিকাংশই এখনো কর্মরত, সৃষ্টিশীল এবং তরুণ প্রজন্ম। অর্থাৎ সমকালীন শিল্পী। দেখা গেছে, ১৯৫৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকজন শিল্পী শিল্পচর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন। তা-ও এখানকার সামগ্রিক শিল্প-আন্দোলনে যার প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং বলা যায়, বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পীদের কাজে ফিগারেটিভ অভিব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা সর্বাধিক লক্ষণীয়, যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ফিগার-প্রধান কাজ দ্বারাই প্রভাবিত। চিত্রমাধ্যমের ক্ষেত্রে নব্য-বঙ্গীয় রীতির ওয়াশ পদ্ধতি এবং শিল্পী আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ওয়াশ পদ্ধতির বিশেষ কৌশল দ্বারাই প্রভাবিত। আবার রাজশাহী চারুকলায় টেম্পারা-প্রধান চিত্র ও সমসাময়িক বাস্তবতানির্ভর বিষয়াবলির চিত্রায়ণই বেশি লক্ষ করা যায়। যা আব্দুস সাত্তার ও নাসরীন বেগমের ছাত্র ও শান্তিনিকেতন ঘরানার শিক্ষিত শিল্পী শিক্ষক সুশান্ত কুমার অধিকারীর কাজ দ্বারা প্রভাবিত।

দেশভাগের আগে ও পরে দুই বাংলাতেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলা চর্চারত শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক পথ সন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব খোঁজার তাগিদ অনুভব করেছেন। যা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের প্রভাবে প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য-ঐতিহ্যের করণ-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য করণ-কৌশল মেলাবার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার শিল্পীরা একদিকে অবিভক্ত বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক বেঙ্গল স্কুলের ঐতিহ্যিক শৈলী ও রীতিকে ব্যবহার করেছেন, অপরদিকে পাশ্চাত্য একাডেমিক করণ-কৌশল সমন্বিত করেছেন। ফলে আধুনিক চিত্রশৈলীর নানান গুণ সমন্বিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রকলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন।

সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। এই রীতির মাধ্যমগত মাধুর্য, প্রাচ্যের ষড়ং গুণাবলির আশ্রয়ে নির্মিত চিত্র দর্শককে ভিন্ন আবেদনে আকৃষ্ট করতে সক্ষম; যার আবেদন পাশ্চাত্য চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র।

সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হলেও এখন পর্যন্ত এই রীতির চিত্রকলার আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়নি। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারও দীর্ঘদিন পরে (১৯৯৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যকলা গ্রুপ খোলা হয়েছে। এ দুই প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা সীমিত। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এসব স্থানে প্রাচ্যকলা বিভাগ বা প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাবিষয়ক কোনো বিভাগ খোলা হয়নি বিধায় আমাদের দেশের শিল্পান্দোলনে এ ধারার কাজ পিছিয়ে আছে। অথচ ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ যেখানে এখনো পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির দ্বারা পরিচালিত। অতএব, প্রাচ্যরীতির চিত্রকলাই বাংলাদেশের স্বকীয় ধারা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে পারে। সৃজনশীলতায়, স্বকীয়তায়, নান্দনিকতায়, আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা যতদূর অগ্রসর হয়েছে তা-ও কম বিস্ময়ের নয়। প্রাচ্যরীতির প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা ফ্রেসকো চিত্রণে, ক্যালিগ্রাফি চিত্রণে, ওয়াশ পদ্ধতির চিত্র অঙ্কনে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা প্রাচ্য-ঐতিহ্যের শেকড়ের সাথে জড়িত। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাজাত্যাভিমানে বলীয়ান। প্রাচ্যরীতির করণ-কৌশলকে অন্য বিভাগের শিল্পচর্চারত শিল্পীরা গ্রহণ করে আসছেন। বিশেষত ওয়াশ, দ্বিমাত্রিকতা এবং রেখার ব্যবহার করে আসছেন বাংলাদেশের পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার সৃষ্টিরত শিল্পীরা। এই গ্রহণের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যরীতির শিল্পধারার সাথে সমসাময়িক টেকনিক, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু সমন্বয়ের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশি চিত্রকলা বিশ্ববুকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিতে পারবে। আর এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রতিটি চারুকলা শিক্ষালয়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এই ধারার চিত্র আন্দোলনকে ভবিষ্যতের পথে তুলে ধরতে জাতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনীগুলোতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। দরকার সেমিনার ও প্রদর্শনীর।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড় ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে বিশ্ব শিল্পকলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রবহমান।

তথ্যসূত্র

১. হরিহর দে, *শিল্পে পরম্পরা*, বর্ধমান, এন.জি আর্ট স্টুডিয়ো, ২০০৮, পৃ. গ

২. তোফায়েল আহমদ, *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৯, পৃ. ৯৬

৩. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি", দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বিশ্বভারতী পত্রিকা* (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২–২০০৬ : প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত), কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২০০৭, পৃ. ১৭১–৭৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৫. প্রাগুক্ত

৬. পরিতোষ সেন, *কিছু শিল্পকথা*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৪১
৭. Lala Rukh Selim, "50 years of the fine Art Institute", *Art*, Vol. 4, No. 3, January-March, 1999, P. 4
৮. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর সুভ্যেনিয়র, ২০০৪, পৃ. ২৩
৯. টি.এম.এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী, "রাজশাহী মহনগরীতে চারুকলা শিক্ষা", *রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান*, সেমিনার খণ্ড, রাজশাহী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৯২
১০. খুলনা আর্ট কলেজে তৎকালীন প্রভাষক বিমানেশ বিশ্বাসের সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর, ২০১৩
১১. টি.এম.এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২–৯৩

[লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা: স্বাধীনতার আগে ও পরে

ন জ রু ল ই স লা ম

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার বয়স মাত্র ৬৭ বছর, তার মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বকালের ২৩ বছর এবং স্বাধীনতা-উত্তর ৪৪ বছর। ১৯৪৮ সনে ঢাকায় প্রথম চারুকলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক চিত্রকলার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন জয়নুল আবেদিন, তখন এক তরুণ খ্যাতিমান শিল্পী। একটি ধর্ম-ভিত্তিক নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজে একটি চারুকলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা রীতিমতো বিপ্লবাত্মক ঘটনা। জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোগীদের অদম্য উৎসাহ তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব করেছিল। একাজে তাঁদের সহায়তা করেছিলেন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরতে খুদা, আমলা সলিমুল্লাহ ফাহমী প্রমুখ

উদারমনা মানুষ। চারুকলা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই আবার কামরুল হাসানের উদ্যোগে ও জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সরকারি পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সমান্তরাল এক আন্দোলন শুরু করেন ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামে সংগঠনের মাধ্যমে। এবার তাঁরা সম্পৃক্ত করেন ঢাকার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তথা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের। এর শুরু ১৯৪৯ সনে। সরকারিভাবে চারুকলার শিক্ষা কার্যক্রম ও বেসরকারিভাবে শিল্প গোষ্ঠী সংগঠন এরকম যুগপৎ যাত্রার মধ্য দিয়ে বস্তুত চারুকলা চর্চা একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবেই অগ্রসর হতে থাকে। ব্যাপারটিই অভূতপূর্ব।

প্রথম থেকেই এদেশে চারুকলা আন্দোলন খুবই উদার ও প্রগতিশীল চেতনা নিয়ে এগোতে থাকে, ফলে চারুকলা ইন্সটিটিউটের পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি কলকাতা আর্ট কলেজের আদলে শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকার চারুকলা চর্চা তুলনামূলকভাবে আধুনিক ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে চারুকলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জয়নুল আবেদিনের লন্ডনের বিখ্যাত স্লেড স্কুল অব আর্টে এক বছরের (১৯৫১-১৯৫২) শিল্পচর্চা, ও ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ ও তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও শিল্পীদের সাথে ভাব বিনিময়ের অভিজ্ঞতা। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মধ্য-পঞ্চাশের মধ্যেই ইউরোপে শিল্পে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে ঢাকার চারুকলার প্রথম ব্যাচের ছাত্র আমিনুল ইসলাম (১৯৫৬), হামিদুর রহমান (১৯৫৬) ও নভেরা আহমদের (১৯৫৬) ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এর পর খুব কাছাকাছি সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে একে একে ফিরে আসেন আব্দুর রাজ্জাক (১৯৫৭), সৈয়দ জাহাঙ্গীর (১৯৫৭), রশীদ চৌধুরী (১৯৫৮), মুর্তজা বশীর (১৯৫৮) ও প্রবীণ শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯৫৯)।

বাংলাদেশের চিত্রকলা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্বে এসেই আধুনিক আঙ্গিক পেতে থাকে, অর্থাৎ বাস্তববাদী বা রূপান্তর-ধর্মী আঙ্গিক থেকে মানব অবয়বের স্টাইলাইজড উপস্থাপনা ও নিসর্গদৃশ্যের সহজীকৃত রূপায়ণ কিংবা লোকজ শিল্প ফর্মের সঙ্গে আধুনিক আঙ্গিকের সংমিশ্রণ, এ ধরনের নিরীক্ষাধর্মী কাজ এ সময়ের মধ্যেই দেখা গেছে। নেতৃত্বে ছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক ও সফিউদ্দিন আহমেদ। এঁরা সবাই তখন দেশীয় বা বঙ্গীয় চিত্রকলা আঙ্গিককে আধুনিকায়ন করতে প্রয়াসী ছিলেন। অন্যদিকে পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ইউরোপ-প্রত্যাগত আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমদ ইউরোপের শিল্প-আঙ্গিক-নির্ভর নতুন আঙ্গিক উপস্থাপন করেন। আমিনুল কিউবিজমের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ১৯৫৭ সনে আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফেরেন রাজ্জাক ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর। তারপর ইউরোপ থেকে ফেরেন রশীদ চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর। রশীদ চৌধুরী ছিলেন সুররিয়ালিজম ধারা প্রভাবিত, বশীর মূলত আমিনুলের মতো কিউবিজম ভক্ত। রাজ্জাক অবশ্য সম-বাস্তবতাবাদী অবয়বী আঙ্গিকে সমর্পিত ছিলেন, আর জাহাঙ্গীর নিসর্গ-নির্ভর সম-বিমূর্ত ধারায়। এঁদের সবার শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদ বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁদের পরে, '৫৬'র দিকে, ফিরে আসেন দশকের শেষে, '৫৯ সনে। নিসর্গ, জল ও জীবন-নির্ভর আধাবিমূর্ত, কিছুটা জ্যামিতিক ডিজাইন ভিত্তিক, অসাধারণ এক শিল্পআঙ্গিক নিয়ে ফেরেন সফিউদ্দিন। মোহাম্মদ কিবরিয়া, দেশেই অবস্থান করে একই সময়ে, অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে পরিচিতি পান অত্যন্ত মননশীল একজন শিল্পী হিসেবে যাঁর কাজে নিসর্গ, জীবন ও মনস্তত্ত্বের বিস্ময়কর সমন্বিত আঙ্গিক নির্মিত হয়েছিল। পরে

জাপানে বছর তিনেক (১৯৫৯-৬২) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে যখন দেশে ফেরেন তখন তিনি আর সেই পঞ্চাশের অবয়ব ও নিসর্গ-নির্ভর

সম-বাস্তববাদী শিল্পী নন, পুরোপুরি বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পী। তেল-রং ও ছাপাই চিত্র উভয় মাধ্যমে অসাধারণ অভিব্যক্তি প্রকাশে দক্ষ এক শিল্পী। জীবনের পরবর্তী পাঁচ দশক তাঁর শিল্পআঙ্গিকে তিনি মোটামুটি একই ধারা অব্যাহত রেখেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পের এই ধারার মধ্যেই নানা মুন্সিয়ানা এনেছেন। সরাসরি জীবনভিত্তিক ছবি আঁকতে ততটা উৎসাহী হননি, যতটা হয়েছেন জীবন ও নিসর্গের মূল সত্যকে আত্মস্থ করে শৈল্পিক রূপায়ণে।

সংক্ষেপে বলা যায় পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের চিত্রকলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল একাধিক, যথা, (ক) প্রথমপ্রজন্মের শিল্পীদের অর্থাৎ জয়নুল, কামরুলদের বঙ্গীয় বা লোকজ ঐতিহ্যনির্ভর আধুনিক আঙ্গিকের চিত্রকলা, (খ) জীবন ও নিসর্গ নির্ভর সম-বাস্তববাদী চিত্রকলা, (গ) ইউরোপীয় সমকালীন, অর্থাৎ কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, আঙ্গিক অনুসারী আধুনিক সম-বিমূর্ত চিত্রকলা ও (ঘ) বিশুদ্ধ বিমূর্ততা।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশের চারুশিল্পের মাধ্যম-বৈশিষ্ট্যে দেখা গেছে চিত্রকলা বা পেইন্টিং ও ছাপাই চিত্রের পাশাপাশি ভাস্কর্যের চর্চা শুরু হতে। পঞ্চাশের দশকে অবশ্য ভাস্কর্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পী নভেরা আহমেদ এককভাবে ভাস্কর্যচর্চা করেছেন। ষাটের দশকের প্রথমদিকে চারুকলা ইন্সটিটিউটে আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ভাস্কর্যচর্চা শুরু হয়। পাশাপাশি সিরামিক ও বুনন শিল্পচর্চারও সূচনা হয়।

পাকিস্তান পর্বে চিত্রশিল্পের বিষয় বা বক্তব্য ছিল প্রধানত অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। এমনকি ভাষা আন্দোলনের শৈল্পিক প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বাইরে খুব একটা দেখা যায়নি। '৬৫-পরবর্তী শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা দাবি ও '৬৯-এর গণআন্দোলনের একধরনের ফলশ্রুতি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আয়োজিত 'নবান্ন' চিত্র প্রদর্শনী ও 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শ্লোগানের সমধর্মী সাহসী শিল্পকর্ম ৬৪ ফুট দীর্ঘ স্ক্রলচিত্র। '৭০-এর উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভাবিত ৩০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রলটিকেও রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়, মানবিক বক্তব্য তো অবশ্যই। জয়নুলের '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার যেমনভাবে মানবিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল মনপুরা '৭০'-এরও সেরকম। দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই একই আঙ্গিকে জয়নুল এঁকেছিলেন দুস্থ মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে বিপ্লবী জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সরাসরি উপস্থাপনা জয়নুলের হাতেই প্রথম।

প্রবীণ শিল্পী জয়নুল যেভাবে পাকিস্তান আমলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ ছবি এঁকেছেন স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে শিল্পআঙ্গিকের বিচারে বিদ্রোহী বা 'রাগী তরুণরা' কিন্তু সেভাবে বক্তব্যের দিক থেকে খুব একটা বিদ্রোহী বা বিপ্লবী ছিলেন না। কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন অবশ্য রশিদ চৌধুরী।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লবী তরুণ শিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে। সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন একজন শিল্পী শাহাবুদ্দিন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে তাঁর সৃজনশীল শিল্পকর্মের প্রধান, এমনকি বলা যায় পৌনপুনিক বিষয় করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবীণ শিল্পী কামরুল হাসান 'এইসব জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামের অসাধারণ পোস্টার করেছেন, নিতুন কুণ্ডু এবং অন্যান্য তরুণ শিল্পীরাও

শিল্পকর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সময়ে জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দিন, সুলতান, আমিনুল, কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মুতর্জা বশীর, আবদুর রাজ্জাক ও আবু তাহের থেকে শুরু করে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ছবি এঁকেছেন। ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার শৈল্পিক রূপায়ণে বিশিষ্টতা পেয়েছে। আবদুর রাজ্জাকের জয়দেবপুরের চৌরাস্তায় স্থাপিত উচ্চমাপের 'জাগ্রত চৌরঙ্গী', আব্দুল্লাহ খালেদের 'অপরাজেয় বাংলা' নিতুন কুণ্ডুর 'সাবাস বাংলাদেশ', মুর্তজা বশীরের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য, হামিদুজ্জামানের 'সংশপ্তক', শামীম শিকদারের 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' অথবা তরুণ শ্যামল চৌধুরীর 'স্বাধীনতা', রাসার 'একাত্তরের গণহত্যা', সবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী শিল্পকর্ম।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে বিস্ময় বলতেই হয় এসএম সুলতানকে। প্রায় দুই যুগ বিস্মৃত ও অনালোচিত থাকার পর মধ্য-সত্তরে তিনি সরবে উপস্থিত হন এবং পরবর্তী দু'দশক দাপটের সাথে শিল্পমঞ্চের নায়কের মতো বিচরণ করেন। মানবজীবন, বিশেষ করে চাষি, জেলে, শ্রমিকের সংগ্রামী জীবন, মুক্তিযুদ্ধও যার অনুষঙ্গ, এসবের ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর বিশাল বিশাল ক্যানভাস সাজিয়েছেন। অবয়ব-নির্ভরই সব ছবি, আঙ্গিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ধারার সাথে তাঁর নিজস্ব সহজিয়া ঢং সংযোজন করে অভিনবত্ব দিয়েছেন। প্রাণ-স্পর্শী শিল্পকর্ম উপহার দিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর ছবির সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য বিদগ্ধ সমজদারদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাইয়ুম চৌধুরী পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আরো বেশি রাজনীতিসচেতন, সমাজসচেতন ও প্রকৃতিসচেতন হওয়ার কারণে এবং অবশ্যই আঙ্গিকে উৎকর্ষতার জন্য অন্যতম নমস্য শিল্পী হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তরুণ শিল্পীদের অনেককেই বক্তব্যপ্রধান শিল্পী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সামাজিক অস্থিরতা, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের অনৈতিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি এসব তরুণদের কাজের বিষয়বস্তু। উপস্থাপনার ভঙ্গি বা আঙ্গিক নতুন। নানাভাবে মানব-অবয়ব বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। পরাবাস্তব উপস্থাপনা, রং ব্যবহারও উচ্চকিত ও অস্বাভাবিক। ব্যঙ্গাত্মক ও কার্টুনধর্মী ছবিও পরিপূর্ণ পেইন্টিং। মূলত উত্তর-আধুনিক চেতনা কাজ করেছে এসব শিল্পীদের কাজে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সমাজে নারীর অবস্থান বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে, অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পীদের হাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী শিল্পচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি বেশ বড় সংখ্যায় মহিলা শিল্পীদের উত্থান। এঁদের অনেকেই নিশ্চিতভাবে আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী। স্বাধীনতা বাংলাদেশের নারীসমাজকে নিঃসন্দেহে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে, একথা চিত্রশিল্পীদের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

স্বাধীনতা-উত্তর চিত্রকলা পূর্বেকার বিমূর্ত ধারাকে যেমন অনুসরণ করেছে, পাশাপাশি আধা-বিমূর্ত ধারা বা অবয়বধর্মী আঙ্গিক, পরাবাস্তববাদী আঙ্গিক ও উত্তর-আধুনিক আঙ্গিক, অর্থাৎ যেখানে তেমন কোনো ধরাবাঁধা প্রথাগত নিয়ম মানার প্রযোজন আছে বলে মনে করা হয় না, সেসব নতুন আঙ্গিক গুরুত্ব পাচ্ছে। শিল্পকলায় সবসময়েই অভিনবত্বের গুরুত্ব থাকে, তবে শিল্পের আবার দর্শক যোগাযোগও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ে শিল্পকলায় ক্যানভাস মাধ্যমকে আগের মতো গুরুত্ব দেয়া হয় না, বরং নানা রকমের স্থাপনা বা 'ইনস্টলেশন' কিংবা 'নির্মাণ' বা 'কন্সট্রাকশন'কে গুরুত্ব দেয়া হয়, তাছাড়া মিশ্র মাধ্যমকেও যথেষ্ট সম্মান দেয়া হচ্ছে। সমকালীন শিল্পকলায়

ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারও সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর শিল্পকর্মে এসব নতুন নতুন মাধ্যম ও প্রযুক্তির অনুশীলন উল্লেখযোগ্য।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৬৯ সনে তাঁর 'নবান্ন' স্ক্রলের মাধ্যমে ক্যানভাস শিল্প থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর স্বাধীনতার পর কালিদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান প্রমুখ তখনকার নবীন শিল্পীরা সাহস দেখালেন নানারকম স্থাপনা শিল্পকর্ম দিয়ে। অলক রায়ের পোড়ামাটির ভাস্কর্য একটি ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমকে নবধারায় এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে মাহবুবুর রহমান, ওয়াকিলুর রহমান, অশোক কর্মকার, ঢালী আল মামুন, নীলুফার চমন, লালা রুখ সেলিম, তেজস হালদার, তৈয়বা বেগম লিপি, মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, ইমরান হোসেন পিপলু প্রমুখ মেধাবী তরুণ শিল্পী স্থাপনা শিল্পের চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অন্যদিকে ডিজিটাল ভিডিও উপস্থাপনায় শিল্পকর্ম সৃজনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, তৈয়বা বেগম লিপি, অসীম হালদার প্রমুখ তরুণ শিল্পীরা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিল্পকলায় নতুন নতুন মাধ্যমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও ক্যানভাসভিত্তিক চিত্রকলাতেও উৎকর্ষ দেখা গেছে। সামগ্রিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের চার দশকের চিত্রকলায় আঙ্গিক, বক্তব্য ও মাধ্যম বিবেচনায় কতিপয় প্রবণতা চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রবণতাসমূহ নিম্নরূপ:

জীবননির্ভর সমবাস্তববাদী ও পরাবাস্তববাদী আঙ্গিক

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এস.এম. সুলতানের গ্রামীণ জীবনের ছবি ও শাহাবুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধ-নির্ভর ছবি। নাজলী লায়লা মনসুরের নগর-জীবনে নারীবিষয়ক কাজগুলোও উল্লেখযোগ্য। মনসুরুল করিম মাটি ও মানুষের কথা তুলে ধরেন তাঁর সম-বাস্তববাদী (তথা পরাবাস্তববাদী) আঙ্গিকে। শেখ আফজালের বাস্তববাদী নগর-ব্রাত্যজনের জীবনালেখ্য রচনা কিংবা কনক চাঁপা চাকমার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে নারীর জীবন অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

প্রকৃতি ও নিসর্গনির্ভর সম-বাস্তববাদী ও প্রতীকী ও পরাবাস্তববাদী আঙ্গিক

প্রবীণদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, হাশেম খান, মনিরুল ইসলাম, রফিকুন নবী, নাসিম আহমদ নাদভী, শামসুদ্দোহা, জাহিদ মুস্তফা, আবদুল মান্নান, মো. মনিরুজ্জামান, নাসরিন বেগম, নাজমা বেগম প্রমুখের প্রাসঙ্গিক কাজের কথা স্মরণ করা যায়। সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা ও সংকটও জার্মানপ্রবাসী মুর্শিদা আরজু আল্পনা অথবা মোখলেসুর রহমান প্রমুখের মতো কোনো কোনো শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

লোকঐতিহ্য-নির্ভর আধুনিকতা

পঞ্চাশের দশকে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান যেমন লোকশিল্প-উৎসারিত লোকজ আধুনিকতা আঙ্গিকের চিত্রভাষা নির্মাণ করেছিলেন তেমনি আশির দশকে লোকসাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন ধারার নকশাপ্রধান চিত্রআঙ্গিক নির্মাণ করেছেন কেউ কেউ। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন আবদুস শাকুর। *ময়মনসিংহ গীতিকার* বিভিন্ন চরিত্র ও কথা তাঁর ছবির মূল প্রেরণা, আবার চরিত্রসমূহের মুখাবয়বের রং নির্বাচনে তিনি একেবারেই পরাবাস্তববাদী। লাল, কালো, নীল, সবুজ ইত্যাদি মুখের মানুষ শোভা পায় তাঁর ক্যানভাসে। গীতিকার কাব্যাংশ দিয়ে ক্যালিগ্রাফির আদলে সাজান ছবিকে।

বিমূর্ত আঙ্গিক

স্বাধীনতা-পূর্ব ষাটের দশকেই বিমূর্ত বা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক আঙ্গিক এদেশের চিত্রকলার একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। মোহাম্মদ কিবরিয়া এ ধারার প্রধান শিল্পীর সম্মান পেয়েছেন। অবশ্য পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, কাজী আবদুল বাসেত, আবু তাহের, মোহাম্মদ মোহসীন, মবিনুল আজিম প্রমুখ বিমূর্ত ধারার শিল্পী ছিলেন। তৎকালীন সামরিক শাসনাধীন পাকিস্তানে বিমূর্ত চিত্রকলা চর্চা সম্ভবত রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও বিমূর্ত ধারা একটি প্রধান ধারা। মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক, কাজী গিয়াস, আবুল বারক আলভী, স্বপন চৌধুরী, একেএম আলমগীর, মমিনুল রেজা, নাইমা হক, রনজিৎ দাস, মোহাম্মদ ইউনুস, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, রফি হক থেকে শুরু করে অনেক তরুণ শিল্পীও বিমূর্ত আঙ্গিকের অনুসারী। অনেকের বিমূর্ততার সাথে নানারকম প্রতীকী ফর্মের ব্যবহার দেখা যায়। ভাস্কর্যেও বিমূর্ত ফর্মের চর্চা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত প্রবীণ শিল্পী আবদুর রাজ্জাক থেকে শুরু করে হামিদুজ্জামান, আইভী জামান, নাসিমা হক মিতু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের বিমূর্ত ফর্মের চর্চা উল্লেখযোগ্য। ছাপচিত্রেও বিমূর্ত আঙ্গিক গুরুত্ব পেয়েছে।

রাজনৈতিক অভিব্যক্তিসম্পন্ন ছবি

বাংলাদেশের উচ্চমানের চিত্রকলায় সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য বা চেতনা স্বাধীনতা-পূর্বকালে তেমন দেখা যায়নি। জয়নুল আবেদিনই ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর 'মনপুরা ৭০' জলোচ্ছ্বাস বিষয়ে আঁকা ত্রাণকর্তারূপী মওলানা ভাসানীর ছবিটি এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শাহাবুদ্দিন, শিশির ভট্টাচার্য, নেসার হোসেন প্রমুখের কাজের কথা উল্লেখ করতে হয়। শাহাবুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি যেমন তাৎপর্যময় তেমনি বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের নিয়ে আঁকা ছবিও নতুন একটি ধারা সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী সময়ে শিল্পী হাশেম খান এধরনের কিছু রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক কাজ করেছেন। প্রবীণ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' ছবিটি রাজনৈতিক ছবির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নারীবাদী বক্তব্যনির্ভর চিত্রকলা

উত্তর আধুনিক শিল্পসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় বা ডিসকোর্স হচ্ছে সমাজে নারীর অবস্থান। বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলাতেও এই প্রসঙ্গ বিবেচিত হচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে কামরুল হাসান ও এস.এম. সুলতানের মতো প্রবীণ শিল্পীদের কাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে, তবে পরবর্তী সময়ে নবীন শিল্পীদের কাজে নারী-প্রশ্ন আরো তাৎপর্য পেয়েছে, বিশেষ করে রোকেয়া সুলতানা, ফরিদা জামান, নাজলী লায়লা মনসুর, আতিয়া ইসলাম এ্যানী, আইভী জামান, কনক চাঁপা চাকমা, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, তৈয়বা বেগম লিপি, মনিকা জাহান বোস প্রমুখের কাজে।

নতুন মাধ্যম: স্থাপনাশিল্প ও ভিডিওচিত্র

সমকালীন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়েই যেন বাংলাদেশের তেজি তরুণ শিল্পীগণ নতুন নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনেও সক্ষম হচ্ছেন। স্থাপনা বা ইন্সটলেশন ও নির্মাণ বা কন্স্ট্রাকশন শিল্প মাধ্যম হিসেবে ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ডিজিটাল ফটোগ্রাফি ও ভিডিওচিত্র ও অনুরূপ নতুন মাধ্যম। প্রথমবারের মতো ২০১২ সালে বাংলাদেশের পাঁচ শিল্পী, পাঁচজনই তরুণ, অত্যন্ত মর্যাদাশীল ভেনিস বিয়েনাল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যম মূলত স্থাপনা ও ভিডিও। পরের বছর আরো একদল শিল্পী ভেনিস বিয়েনালে যোগদানের সুযোগ পান। এছাড়া শিল্পী রনী আহমদ এককভাবে ইতালিতে স্থাপনাশিল্পের প্রদর্শনী করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামগ্রিক শিল্পচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিল্প-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, শিল্পীর সংখ্যা বেড়েছে, পৃষ্ঠপোষকতার মাত্রা বেড়েছে, গ্যালারি ও শিল্পাঙ্গনের সংখ্যা বেড়েছে, প্রদর্শনীর সংখ্যা বেড়েছে। শিল্পবিষয়ক প্রকাশনার ধরন ও মান বেড়েছে। শিল্পে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বেড়েছে এবং শিল্পকর্মের চাহিদা ও আর্থিক মূল্যও বেড়েছে। ১৯৮১ সন থেকে ঢাকায় নিয়মিতভাবে এশীয় দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী, বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা আর্ট সামিট নামের আরেকটি আন্তর্জাতিক বার্ষিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা শিল্পকলার বহুমুখী বিকাশের বিশাল সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৪৮ সনে জয়নুল আবেদিনের হাতে যে বৃক্ষের চারা রোপণ হয়েছিল আজ ৬৭ বছরে সেটিকে মহীরুহ বলেই মনে হয়।

প্রবন্ধটি লেখকের সাম্প্রতিক সংকলন *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা: স্বাধীনতার আগে ও পরে,* (ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৫)-এর সূচনা প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ।

১০ নভেম্বর, ২০১৫

[লেখক: প্রবন্ধকার। শিক্ষাবিদ। নগর বিশেষজ্ঞ ও শিল্প-লেখক।]

বাংলাদেশে আধুনিক চারুকলাচর্চা

সৈয়দ আজিজুল হক

১৯৪৮ সালে ঢাকায় চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পর গত সাতষট্টি বছরে বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রকলার যে বিপুল প্রসার ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তার মর্ম বা বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরানো আবশ্যক বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

আমরা জানি, নগর হিসেবে ঢাকার বয়স যদিও চারশ বছরের অধিক, কিন্তু এখানে আধুনিক চারুকলা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে মাত্র সাতষট্টি বছর আগে। ঢাকার এই পিছিয়ে পড়ার কারণ, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারও পূর্বের কারণ, ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া। এটি ১৭০৪ সালের ঘটনা। নবাব মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মাকসুদাবাদে নিয়ে গিয়ে এর নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। এভাবে রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ঢাকা নবাবি শাসনের পরবর্তী দিনগুলোতে মফস্বল শহরের রীতি অনুযায়ী হয়ে পড়ে গতিহীন। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে নবাবি শাসনের অবসান ঘটলে মুর্শিদাবাদও রাজধানীর সম্মান হারায়। ১৭৭৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থাপিত হয় বাংলার নতুন রাজধানী। শুধু বাংলা নয়, কলকাতা ক্রমশ হয়ে ওঠে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। আর ঢাকা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জেলা শহরের মর্যাদা নিয়ে অব্যাহত রাখে তার স্থবিরতা-আক্রান্ত শ্লথগতির বিকাশহীন যাত্রা।

মোগল শাসনামলে ঢাকা যখন বাংলার রাজধানী তখন কলকাতা ছিল সাধারণ একটি গ্রাম। অথচ কলকাতা ব্রিটিশদের হাতে দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহানগরীতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অনেক ইতিবাচক প্রসাদ লাভে ধন্য হয় কলকাতা। আধুনিক শিক্ষার সকল আয়োজন প্রথমে শুরু হয় কলকাতাতেই। সে অনুযায়ী উনিশ শতকের শেষার্ধে চারুকলা শিক্ষার আধুনিক প্রতিষ্ঠান কলকাতাতেই গড়ে ওঠে। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল নামে এই প্রতিষ্ঠানেই বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে চারুশিল্পের পাঠ গ্রহণ করেন জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমীন, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ। এর মধ্যে কামরুল হাসান ছাড়া বাকিরা ওই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায়ও নিয়োজিত হন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ সৃষ্টি এবং বাংলা ভাগের ফলে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হয় এবং ঢাকা ২৪৩ বছর পরে পুনরায় অর্জন করে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা। উপরিউক্ত শিল্পীরা কলকাতা থেকে চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসেন পূর্ববাংলায়, বর্তমান বাংলাদেশে। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে তাঁরা ঢাকায় চারুকলার একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং

এঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট’ নামে শিক্ষালয়টি। এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনার আগে ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকায় চারুশিল্প চর্চার পরিবেশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা আবশ্যক।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭) ঢাকায় শিল্পচর্চার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এসব নিদর্শন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের। নবাব সৈয়দ আলি খান বাহাদুর নুসরত জঙের কালে (১৭৯৬-১৮২৩) আলম মুসাব্বির নামে এক চিত্রকর জলরঙে ঢাকার ঈদ ও মহররমের মিছিলের কয়েকটি চিত্র আঁকেন। এতে চিত্রিত হয়েছে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা, ভবন ও জীবনযাত্রার ছবি। এছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চার্লস ডয়েলি ঢাকার কালেক্টর থাকাকালে তৎকালীন ঢাকার বিভিন্ন নিদর্শনের চিত্র এঁকে সেগুলোকে লিথোগ্রাফ মাধ্যমে নিয়ে *অ্যান্টিকুয়িটিজ অব ঢাকা* শিরোনামে চার খণ্ডে অ্যালবাম প্রকাশ করেন। উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে আর্ট টিচাররা নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ছবি আঁকতেন এবং তার কিছুকিছু স্টুডিওর মাধ্যমে বিক্রি হত বলেও জানা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিকৃতি আঁকার ব্যাপারটিই ছিল মূল। ১৯০৪ সালে খুলনার মহেশ্বরপাশা গ্রামে শিল্পী শশীভূষণ পাল প্রতিষ্ঠিত ‘মহেশ্বরপাশা স্কুল অফ ফাইন আর্ট’কে কেন্দ্র করে যে শৈল্পিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তার প্রভাব বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর হলেও ওই অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৪২ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় একটি চারুশিল্পের প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। তবে এসবই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের তথ্য মাত্র। এখানে স্মরণীয় যে, ঔপনিবেশিক শাসন কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তাতে, আগেই বলেছি, উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধার সবই গিয়ে জমা হয়েছিল কেন্দ্রের শরীরে। কেন্দ্র তখন কলকাতা; সুতরাং প্রান্ত হিসেবে ঢাকা ছিল স্বাভাবিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

উপর্যুক্ত তথ্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এদেশে আধুনিক চারুশিল্প চর্চার যাত্রা শুরু। এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ঢাকায় একটি চারুকলা শিক্ষালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি কিন্তু গৃহীত হয়েছিল কলকাতায় বসেই। শিল্পী কামরুল হাসানের দুটি প্রবন্ধ (একটি-‘পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প আন্দোলন ও সরকারী কলাভবনের প্রতিষ্ঠা’; অপরটি ‘আমার কথা : বাংলাদেশের শিল্পী আন্দোলন’) থেকে এ-সম্পর্কিত তথ্যাবলি অবহিত হওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের শুরুর দিকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও বাংলাবিভক্তির বিষয়টি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের রাজধানী হবে ঢাকা– এতেও কোনো সন্দেহ ছিল না। জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পীরা কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসবেন– এটাও স্থির হয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় এসে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিও তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। কামরুল হাসান যদিও তখন ছাত্র, তবু শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। ফলে এসব পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। শিল্পীদের এসব পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারে কলকাতায় অবস্থানকালেই সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, আবুল কাশেম, সলিমউল্লা ফাহমি প্রমুখ। কলকাতার সৈয়দ আমির আলি

অ্যাভিনিউতে ছিল সলিমউল্লা ফাহমির বাসা। অফিসশেষে সন্ধ্যায় ওই বাসায় শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হত। শিল্পীদের পরিকল্পনার কথা তিনি শুনতেন এবং সরকারের কাছে উপস্থাপনযোগ্য ভাষায় গুছিয়ে তা টাইপ করে দিতেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের অস্থাবর সম্পত্তি ভাগাভাগির দাবিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে শোনা যায়; যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৪৭ সালের আগস্টে সংঘটিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এঁরা সকলেই কলকাতার চাকরিতে অপশন দিয়ে পূর্ববাংলায় এসে একেকজন একেক প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে ন্যস্ত হন। জয়নুল আবেদিন ঢাকা নর্মাল স্কুলে, আনোয়ারুল হক চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুলে, সফিউদ্দীন আহমেদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে, শফিকুল আমীন আরমানিটোলা স্কুলে, হাবিবুর রহমান আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আর্ট টিচার হিসেবে যোগদান করেন। তবে যে যেখানেই থাকুন আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ত্যাগ না করে বরং সম্মিলিতভাবে তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সরকারি দফতরে পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এ আন্দোলনকে গতিশীল ও বিস্তৃত করার জন্য কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, কবি জসীমউদ্‌দীন, সিকান্‌দার আবু জাফর, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, সাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্‌দীন, আবদুল গনি হাজারি, সাংবাদিক আবুল হাশেম, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, নাজীর আহমদ প্রমুখ। অফিসশেষে বিকেলে প্রতিদিন এ নিয়ে আড্ডা বসত নাজিমউদ্দিন রোড থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের দিকে আসতে রেললাইন পেরিয়ে একটি কালভার্টের ওপর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে ফাইলপত্র আসা-যাওয়ার এক পর্যায়ে কোনো একজন এসডিপিআই এই মর্মে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন : 'পাকিস্তান যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র সেহেতু এদেশে ছবি আঁকা শেখানোর জন্য কোনো স্কুল হতে পারে না।' তার এ আপত্তি টেকেনি। তখন ডিপিআই ছিলেন ড. কুদরত-এ-খুদা। তাঁর অফিস তখন চট্টগ্রামে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ ও কামরুল হাসান চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়েছিল। এছাড়া সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোনো কোনো ব্যক্তিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারের শীর্ষ-ব্যক্তিদের কাছে শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য তাঁরই পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজন করা হয়েছিল একটি পোস্টার প্রদর্শনীর। এজন্য ঢাকার আবদুল হাদি লেনস্থ জয়নুল আবেদিনের শ্বশুরালয়ে তাঁরই নেতৃত্বে পঁয়ত্রিশটি পোস্টার আঁকা হয়। শফিকুল আমীন ও কামরুল হাসান তাঁকে সহায়তা করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বণিকদের পদার্পণ থেকে শুরু করে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উত্থান-পতনের সাক্ষ্যসহ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বের স্বাক্ষর নিয়ে শেষ হয় পোস্টারগুলো। কামরুল হাসান প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮-এর মার্চে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ঢাকা আগমন উপলক্ষে। এ কথা ঠিক, ঢাকায় চারুশিল্পের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখেই এমন একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল এবং শাসকমহলে যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

এসব নানামুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে আমাদের পথিকৃৎ শিল্পীরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। আর এভাবে ১৯৪৮ সালের বাজেট অধিবেশনে ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। কামরুল হাসান লিখেছেন, তখন অর্থবছর শেষ হত ৩১ মার্চ তারিখে

এবং নতুন অর্থবছর শুরু হত ১ এপ্রিল থেকে। সে যাই হোক, আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সরকারি অনুমোদন লাভের পর সমস্যা দেখা দেয় এর স্থান বরাদ্দ নিয়ে। জেলা সদর থেকে হঠাৎ করে প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় বিভিন্ন দফতরের স্থান বরাদ্দ নিয়ে তখন ঢাকা শহর ছিল প্রচণ্ড চাপের মুখে। তারই মধ্যে আবুল কাশেম ও সলিমুল্লা ফাহমির প্রচেষ্টায় নবাবপুর রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের নিচতলায় দুটি ঘর পাওয়া যায়। কলতাবাজারে ঢোকার যে গলি সেদিকের দুটি ঘর নিয়েই যাত্রা শুরু হয় আর্ট ইনস্টিটিউটের। ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম ছাত্রভর্তির বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রচারিত হয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম অধ্যক্ষ হন জয়নুল আবেদিন। কিন্তু সরকার কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রচার বিভাগের আর্ট ডিজাইনার নিযুক্ত করলে তাঁকে ওই বছর মে মাসের শেষে অথবা জুনের একেবারে শুরুতে করাচিতে যেতে হয় এক বছরের জন্য। সে সময়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারুল হক। এ দুজন ছাড়া আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে এর শিক্ষক নিযুক্ত হন সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান, হাবিবুর রহমান ও আলী আহসান। কামরুল হাসান নতুন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বাকি সকলেই কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শফিকুল আমীন দাবি করেছেন যে, তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে দু-মাস এর শিক্ষক ছিলেন, পরে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে চলে যান। প্রথম ব্যাচে ভর্তি হওয়া আঠোরো জন ছাত্রের মধ্যে ছিলেন : আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, আবদুল কাদের, মোহাম্মদ ইসমাইল, আলফাজউদ্দিন খন্দকার, নুরুল ইসলাম, খালেদ চৌধুরী, শামসুল আলম, ইমদাদ হোসেন, জুলফিকার আলি, প্রভাস সেন, লোকনাথ ধর প্রমুখ।

গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট পরবর্তীকালে ওই ভবনে আরো দুটি ঘর লাভ করে। এবং ১৯৫২ সালে সেগুনবাগিচায় একটি সম্পূর্ণ দোতলা ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এবং আরো পরে ১৯৫৬ সালে শাহবাগের নিজস্ব ভবনে সরকার বরাদ্দকৃত চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬৩ সালে এটি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০৮ সাল থেকে এটি রূপান্তরিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে।

একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঢাকা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত চারুকলার এই শিক্ষায়তনটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পের বিকাশ, বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে দেশের অন্যত্র গড়ে উঠতে থাকে চারুশিক্ষার আরো কিছু প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ (১৯৬৯), চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ (১৯৭৩) [এ দুটি মিলে বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট], রাজশাহী কলেজ (১৯৭৯) [এটি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ], খুলনা আর্ট কলেজ (১৯৮৩) [এটি বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ], ঢাকাস্থ দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইওডা ও শান্ত-মরিয়ম) চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ, ঢাকা, যশোর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বেশ কয়েকটি চারুকলা কলেজ। তবে আদি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ রয়েছে নেতৃত্বের আসনে। আজ সারা দেশে চারুশিল্পের যে সমাদর, শিল্পীদের যে মর্যাদা, শিশুদের মধ্যে ছবি আঁকার যে অভূতপূর্ব আগ্রহ তার মূলে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই

প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্ররাই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত এবং শিল্পী হিসেবে স্বনামধন্য।

আধুনিক চারুশিল্পের যাত্রা শুরু

জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ পথিকৃৎ শিল্পীরা শুধু প্রতিষ্ঠান গড়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি। তাঁরা শিল্পচর্চার মাধ্যমেও ছাত্রদের ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমাদের পথিকৃৎ শিল্পীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক করণকৌশল যেমন রপ্ত করেছিলেন, তেমনি বিষয়ান্বেষণের ক্ষেত্রে ছিলেন সমাজজীবন ও স্বাদেশিকতায় দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা থেকে তাঁরা তাঁদের চিত্রে অঙ্গীকার করেছিলেন বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকঐতিহ্যকে। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণাকে তাঁরা অস্বীকার করতে চাননি, আবার একই সঙ্গে চাননি নিজ সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। এ দুয়ের সমন্বসাধনের চেষ্টা তাঁরা করেছেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত চারু শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ যাতে জন্ম নেয়, শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মও যাতে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে, সে-ব্যাপারে তাঁরা বিরামহীনভাবে সচেষ্ট থেকেছেন। পথিকৃৎ শিল্পীদের ব্যক্তিজীবন যেমন ছিল সংগ্রামশীল তেমনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন সচেতন। অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিজীবনের সংগ্রামশীলতার সঙ্গে উপনিবেশবাদবিরোধিতার বিষয়টি যুক্ত হয়েছিল। এভাবে তাঁদের শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছিল যেমন বিষয়ানুগত, অবয়বধর্মী, তেমনি বিরচনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল-জটিলতামুক্ত এবং ভাষার প্রশ্নে প্রতীক-রূপকসহযোগে ব্যঞ্জনামূলক। শিক্ষক-শিল্পীদের কাজের এই বৈশিষ্ট্য প্রথম প্রজন্মের ছাত্র-শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল। ফলে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের চিত্রমালা উপর্যুক্ত রূপ প্রবণতা দ্বারাই বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। বাংলাদেশের নিসর্গ, বিভিন্ন শ্রমজীবীসহ নিম্নবর্গের মানুষ, নারীর বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গিমা প্রভৃতি বিষয় হিসেবে আদৃত হয়েছে এ দশকের চিত্রে। লোকশিল্পের মোটিফ হিসেবে এঁদের চিত্রে আহৃত হয়েছে ময়মনসিংহের টেপা পুতুল, রাজশাহীর শখের হাঁড়ির গাত্রে আঁকা পাখি ও মাছ, লোকমেলার কাঠের ঘোড়া, নকশি কাঁথার নানা উপাদান, জামদানি শাড়ির নকশা প্রভৃতি। কিন্তু ষাটের দশকের চিত্রবৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ ধারণ করে। এর কারণ, পঞ্চাশের দশক থেকেই এদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশগমন শুরু করেন। চারুকলার ক্ষেত্রটিকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে জয়নুল আবেদিনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সংঘটিত হয় এসব বিদেশগমনের ঘটনা। চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে পাস-করা কিংবা এখানকার নবীন শিক্ষকেরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান গিয়ে সেখানকার চিত্রবৈশিষ্ট্য দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা দেশে ফিরে যে চিত্রমালা উপহার দেন তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নতুন চিন্তার প্রকাশ। তাঁদের নতুন চিন্তায় প্রধান হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন পাশ্চাত্য শিল্পের বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারা। অবয়বকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে এই ধারা পরিপুষ্টি লাভ করে। রঙের বিন্যাস ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি এবং টেক্সচার নির্মাণের মধ্যেই এই শিল্পীরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পরিসমাপ্তি বলে বিবেচনা করেন। বিদেশ-প্রত্যাগত শিল্পীরা একেই আধুনিক ধারা হিসেবে প্রচার করেন এবং চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের অবয়বধর্মী চিত্রমালাকে আধুনিকতার পঙ্ক্তিভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। বিদেশে যাননি এমন শিল্পীদেরও অনেকে তাঁদের এই শিল্পকর্ম ও প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বিমূর্ততায় অবগাহন করেন। ফলে

ষাটের দশকের চিত্রবৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারার আধিপত্য। তবে এই দশকে বিমূর্ততার ধারাটি প্রাধান্য অর্জন করলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি স্বদেশানুরাগপুষ্ট লোকঐতিহ্যকেন্দ্রিক বিষয়ানুগ ধারাটি। একথা স্মরণীয় যে, বিমূর্ততায় অবগাহনের পেছনে অবশ্য পাশ্চাত্য প্রভাবই একমাত্র কারণ হিসেবে সক্রিয় ছিল না, পাকিস্তানি শাসকশক্তির ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রাদর্শও ক্রিয়াশীল ছিল পরোক্ষ ভূমিকা হিসেবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চিত্রকলার এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এমন প্রভাববিস্তারী ঘটনা যে তা আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রকে বদলে দিয়েছে দারুণভাবে। মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে বাংলাদেশের চারুশিল্পের জগতেও সঞ্চারিত হয় নতুন প্রাণ। চারুশিল্পীরা উজ্জীবিত হন নতুনতর জীবনবোধে। ঠিক এর আগের দশকটির সঙ্গে তুলনা করলেই নতুনের এই আবাহনের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আমরা আগেই বলেছি, ষাটের দশকে আমাদের বিদেশ-প্রত্যাগত শিল্পীদের কল্যাণে এদেশে চারুকলার পরিমণ্ডলটিতে প্রবল হয়ে উঠেছিল নির্বস্তুক নিরবয়বধর্মী বিমূর্ততার ধারা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মকেন্দ্রিক আচ্ছন্নতা, সে সময়ে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সামরিক একনায়কতান্ত্রিক সরকারের কর্মধারা এবং নতুন বিকশিত নাগরিক জীবনরুচির সঙ্গে শিল্পকলার এই বিমূর্ততা কেমন যেন, অনেকটা কাকতালীয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধ এই ক্ষেত্রে নিয়ে আসে এক নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন স্পন্দন, নতুন জাগরণ। ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জন, অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীন আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ লড়াই, স্বাধীনতার প্রশ্নে সারা দেশের মানুষের ঐক্যবোধ প্রভৃতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের সংবেদনশীল চারুশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে ছিলেন সম্পূর্ণভাবে একাত্ম। তাঁরা তাঁদের হৃদয়াবেগ দিয়ে আমাদের কষ্ট, অপমান ও বীরত্বগাথাকে ধারণ করেছেন। ফলে সত্তরের দশকের চিত্রশিল্পে অবয়বধর্মিতা, স্পষ্ট বিষয়ানুগত্য আবার ফিরে এসেছে নতুনতর বলিষ্ঠতা নিয়ে। শিল্পীরা যথার্থভাবেই অনুধাবন করেছেন যে, এমন জাতীয় দুর্যোগ ও জাতীয় ঐশ্বর্যকে বিমূর্ততার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। মুক্তিযোদ্ধার বলিষ্ঠ লড়াকু গতিশীল শরীর, গণহত্যার শিকার মানব-অবয়ব, লাঞ্ছিত-অবমানিত নারী, বর্বর সেনাকুলের অত্যাচারপ্রবণ পাশবিক প্রমত্ততা, বাংলার প্রকৃতি ও শ্রমজীবী জীবনধারা প্রভৃতি স্বাধীনতা-উত্তরকালে চিত্রের বিষয় হিসেবে আদৃত হল।

কিন্তু পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল সামরিক স্বৈরাচারী শাসন, তখন আবার বিমূর্ততার ধারাটি প্রাণ ফিরে পাওয়া শুরু করল। তবে পাশাপাশি এ-ও ঠিক, শিল্পীদের একাংশের মধ্যে বিশেষত তরুণদের মধ্যে, জাগ্রত হল প্রতিবাদী চেতনা। এই চেতনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠল অগণতান্ত্রিক শাসন ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী মৌলবাদী চক্রের পুনরুত্থানের সমালোচনামূলক শিল্প। এই সমালোচনার বিষয় হল দুর্বৃত্তায়ন এবং নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখার রক্ষণশীল মধ্যযুগীয় মনোভাব। সমালোচনার শিকার হতে থাকল রাষ্ট্র ও সমাজের নানারূপ অন্যায়, অনৈতিকতা ও অসঙ্গতি। এই ধারাটি ক্রমশ সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিল্পীদের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমনের প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে। বিশেষত ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে এ কালপর্বে জাপান ও

ভারতে বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শিল্পীদের যাতায়াত বেড়েছে। ফলে আমাদের শিল্পকলা জগতেও আমরা লক্ষ করছি এর অনিবার্য প্রভাব। ভারত অবয়বধর্মী, বিষয়ানুগত শিল্পচর্চাকে কখনো আধুনিকতার বিরোধী মনে করেনি। ভারতীয় শিল্পীরা অনেক বেশি ঐতিহ্যনির্ভর ও স্বদেশানুরাগী। ভারতগামী বাংলাদেশি শিল্পীদের চেতনায় ও কাজে এর প্রভাব পড়েছে প্রবলভাবে। অন্যদিকে জাপান এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও শিল্পক্ষেত্রে ধারণ করে আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার ভারসাম্যকে। ক্যানভাসে জাপানি শিল্পীদের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাদের শিল্পে আছে ঔদার্য ও প্রাণের সংযোগ। এই সবকিছু আমাদের দেশ থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিল্পীদের মনে ও কাজে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। বহির্গমনের মাধ্যমেই যে শিল্পীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের চিত্রধারা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে তা নয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিয়মিত দ্বিবার্ষিক এশীয় প্রদর্শনীও তাদের বহির্বিশ্বের শিল্পবৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়ক হচ্ছে।

স্বাধীনতা-উত্তর গত চার দশকে আমাদের শিল্পকলা এভাবে জাতীয় জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে ধারণ করে যেমন ঋদ্ধ হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্পকলার রূপান্তরধর্মী বিচিত্রমুখী প্রবণতাকেও আত্মস্থ করেছে। এ কালপর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সময়ে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে নগরজীবনের বিচ্ছিন্নতা এবং তারই পরিণাম হিসেবে মানুষের মনোগত জটিলতা। আর এই জটিলতা এসে চিত্রকলার জমিনকেও করে তুলেছে ভারাক্রান্ত। পঞ্চাশের দশকে আমাদের শিল্পের কম্পোজিশন যত সহজ ছিল, একালের চিত্রতলের দিকে তাকালে সহজেই অনুভব করা যাবে, সেই সরলতার স্থান দখল করে আছে বহুমাত্রিক জটিলতা।

আমাদের তরুণ শিল্পীরা আন্তর্জাতিক শিল্পকলার স্পন্দনকে ধারণ করতে সবসময়ই আগ্রহী। পাশ্চাত্য শিল্পজগতে দ্বিমাত্রিক চিত্রবৈশিষ্ট্য ভেঙে বেরিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া চলছে গত কয়েক দশক ধরে তার প্রভাব পড়েছে আমাদের দেশেও। আমাদের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে স্থাপনাশিল্প সৃষ্টির ঝোঁক বেড়েছে, বেড়েছে কনসেপচুয়াল আর্ট সৃষ্টির প্রবণতা। চেতনানির্ভর এই শিল্প শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধা উভয়ের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সমাজসচেতনতা ও বিশ্বপ্রসারিত দৃষ্টি দাবি করে। এসব স্থাপনা ও চেতনাপ্রিয় শিল্পের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, তা প্রথাগত শিল্প-উপকরণকে পুরোপুরিভাবে বিসর্জন দিয়ে আশ্রয় করেছে যেকোনো কিছু গ্রহণ করার এক উদার মানসিকতা। তা উস্কে দিয়েছে সৃষ্টিশীলতার বৈচিত্র্যকে এবং বর্জন করেছে গৎবাঁধা, বহু ব্যবহারে জীর্ণ, ক্লিশে বিষয়াবলিকে।

এ কালপর্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বলা যায়, আমাদের শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। শিল্পীর সংখ্যা ও শিল্পশিক্ষার ঝোঁক বেড়েছে সারা দেশে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে, বেড়েছে শিশুদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনের ঝোঁক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুশিল্প বিভাগ চালু করার অর্থ : বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করেও শিক্ষার্থীরা চারুশিল্প শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয়টিও এর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি মানে শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হল, সংখ্যা বৃদ্ধিতে শিল্পীসমাজ সংকটগ্রস্ত নয়। সমাজে তাদের চাকরির অনেক ক্ষেত্র বেড়েছে। বেড়েছে শিল্পের চাহিদাও। এ কালপর্বে বেড়েছে গ্যালারির সংখ্যা। সেইসঙ্গে বেড়েছে শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ও বিক্রি। বিপুলভাবে বেড়েছে শিল্পকর্মের দাম। সমাজে উচ্চবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের

ক্রেতাও বেড়েছে। বহুতল ভবন নির্মাণের যেমন হিড়িক পড়েছে, তেমনি সেসব ভবনের দেয়াল সজ্জিত ও শোভাময় করার আগ্রহও সচ্ছল নাগরিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পের প্রসার ঘটা ও কদর বৃদ্ধির পাশাপাশি একই সমান্তরালে বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজে শিল্পীদের মর্যাদা। চারুশিল্প জগতের গত সাতষট্টি বছরের এসব অর্জনের দিকে তাকিয়ে স্বীকার করতেই হবে যে, চারুকলার এই উন্নতি সমাজের ইতিবাচক অগ্রগতিরই স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উদার সমন্বয়সাধন

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার বয়স সাতষট্টি বছর অতিক্রম করলেও এখনও তা সজীবতায়, প্রাণবন্ততায়, বিচিত্রমুখী সৃষ্টিশীলতায়, নব নব চেতনার উদ্ভাসনে, বলা যায়, যৌবনের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। এদেশে চারুকলা অনুশীলনের মূল প্রতিষ্ঠানটি তার জন্মলগ্ন থেকেই নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ায় চারুশিল্পের জমিনটিও বরাবরই থেকেছে সৃজন-আবেগে গতিশীল ও মুখর। এদেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিটি প্রজন্মের শিল্পীরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে গমন করে সেখানে দীর্ঘকাল বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেছেন শিল্পের আন্তর্জাতিক পরিম-লের সকল প্রকার আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার উত্তাপকে। এভাবে পাশ্চাত্যের উনিশ-বিশ শতকীয় শিল্পআন্দোলনসমূহের গতিধারাকেও এদেশের শিল্পীরা সবসময় অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং সেই অনুযায়ী আপন শিল্পের জমিনকেও সর্বসাম্প্রতিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

অন্যদিকে আমাদের পথিকৃৎ শিল্পীরা আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার মধ্যেও বরাবর মাতৃভূমির মাটির নির্যাস দিয়ে তাঁদের চিত্রের জমিনকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদেরও একই উপদেশ দিয়েছেন যাতে বাংলাদেশের লোককলা, লোকঐতিহ্য ও পলিমাটির সিক্ত অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে আমাদের আধুনিক চিত্রকলা। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন-পরিবেশের দিগন্তবিস্তৃত আনুভূমিক রেখার সঙ্গে হাইরাইজ ভবনসমৃদ্ধ ঢাকা মহানগরীর উল্লম্ব রেখার একপ্রকার মেলবন্ধন যেমন আমরা লক্ষ করি তেমনি অবলোকন করি লোকশিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত রেখার সঙ্গে কিউবিজম-প্রভাবিত জ্যামিতিক রেখার সংশ্লেষ। আমাদের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের উন্নত টেকনিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিষয়-অন্বেষণে আনুগত্য প্রদর্শন করেন দেশের জনজীবন, প্রকৃতি এবং এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট ও সম্ভাবনার প্রতি।

অবয়বধর্মিতা, অবয়বকে স্টাইলাইজড করে নানা ইমেজের ব্যবহার, অবয়বের সীমাহীন ভাঙচুর, আবার পুরোপুরিভাবে নিরবয়বধর্মিতা– এর কোনোটি থেকেই বিমুখ নন এদেশের শিল্পীরা। একই সঙ্গে কিউবিজম থেকে সুররিয়ালিজম, অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম থেকে কনসেপচুয়ালিজম–এরও কোনো-না-কোনো শৃঙ্খলার মধ্যে অনায়াসেই নিজেকে বিজড়িত করে ফেলেন বাংলাদেশের শিল্পীসমাজ। ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিও কোনো কোনো শিল্পীর চিত্রজমিনকে দারুণভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। আবার কেউ কেউ চিত্রের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, দেয়ালের সৌন্দর্য বর্ধনের চিন্তা পরিহার করে, শিল্পের স্থায়িত্ববিষয়ক প্রচলিত ধারণাকে নতুন চেতনার আলোকে বিশদায়িত করে স্থাপনাশিল্প নির্মাণে আগ্রহী হয়েছেন। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়েছে অনেক কিছু। প্রথাবদ্ধতার বাইরের সবকিছুকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব। বিষয় হিসেবে, উপাদান হিসেবে, প্রতীক হিসেবে সমাজে বিদ্যমান যে কোনো কিছু হতে পারে এর

আরাধ্য। বর্তমান ডিজিটাল যুগে, তথ্যপ্রযুক্তির সীমাহীন উন্নতির এই যুগে, যন্ত্রের মাধ্যমে, ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও আলোর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে, কোনো একটি চেতনা প্রকাশে বিচিত্র পদ্ধতির ব্যবহার ঘটানো সম্ভব। শিল্পী কখনো নিজেই পরিণত হন বিষয়ে। অভিনয়কলাকেও তিনি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তোলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নানা রূপ ব্যক্ত হচ্ছে এই

শিল্পে। শিল্পের প্রচলিত ধারণার অবসান ঘটিয়ে এই শিল্প মানুষের চেতনাকে আঘাত করতে চায়, তার চেতনার গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে চায় এমন কিছু বোধ যা চিত্রের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের পক্ষে ধারণ করা অসম্ভব। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে নব নব উদ্ভাবনাশক্তি। স্থাপনাশিল্পের বৈচিত্র্যরঞ্জিত সৃজনশীল উপস্থাপনা আজ তাই বিশ্বজুড়ে আদৃত। বাংলাদেশের চারুশিল্পের জগতেও এই ধারার উপস্থিতি বেশ উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী জুড়ে দেখেছিলেন 'আকারের সমারোহ'। নিঃসন্দেহে দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রে ফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জগদ্ব্যাপী বৈচিত্র্যময় ফর্মের যে উপস্থিতি লক্ষ করি, কিউবিস্টরা তার মধ্যে তিনটি মৌলিক ফর্ম আবিষ্কার করেছিলেন, যার মাধ্যমে যাবতীয় প্রাণিকুল, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাকৃতিক স্থাপনাকে চিত্রায়িত করা সম্ভব। আর এই আকারের মূলে হল রেখা। রেখার এই বৈচিত্র্য, ব্যঞ্জনা, গভীরতা ও কাব্যিকতাকে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা ধ্যানে ধারণ করে তাদের চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজও বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে রেখা অনেক বেশি সজীব, উজ্জ্বল, বক্তব্যধর্মী ও প্রাণবন্ত। রেখার ঋজু, বঙ্কিম আর লতানো রূপের যে বৈচিত্র্য তা চিত্রের অসামান্য সৌন্দর্যেরও আকর।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের বড় শক্তির দিক হল, তা চিত্রকলা-সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার সবকিছুকে উদারভাবে ধারণ ও আত্মস্থ করেই অগ্রসর হচ্ছে। জাতিক ও আন্তর্জাতিক কোনো সংকট থেকেই মুখ ফিরিয়ে রাখছেন না বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা। ফলে তাঁদের শিল্পের শেকড় যেমন দেশজ মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত, তেমনি তার শাখা-প্রশাখা আন্তর্জাতিকতাকে স্পর্শ করে পল্লবিত ও কুসুমিত হতে উদগ্রীব।

[লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

বাংলাদেশের দৃশ্যকলা: সাত দশকের গতিপ্রকৃতি

আবুল মনসুর

এমনটি বলা যায় যে বাংলাদেশে দৃশ্যকলা চর্চার সাত দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ঢাকার চারুকলা শিক্ষালয়টি ১৯৪৮ সালে গুটিকয় ছাত্র নিয়ে তার যাত্রা সূচিত করেছিল। তারপরে এটি বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত চারুকলা অনুষদ। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পাঠদান ঢাকার প্রতিষ্ঠানটিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমে ক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিল্পশিক্ষা চালু হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা এখন ব্যাপ্ত হয়েছে মোটামুটি বর্তমান বাংলাদেশের সব প্রান্তিক অঞ্চলে। শিল্পচর্চার এ বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে ৬৭ বছরের শিল্পচর্চার একটি খতিয়ান নেওয়া যেতে পারে, বুঝে নিতে চেষ্টা করা চলে এর চারিত্র্যলক্ষণ ও ভাবগতিক। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আমরা শুরু করেছি অনেক দেরিতে। পার্শ্ববর্তী কলকাতায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা ১৮৪৯ সালে 'মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ১৮৫৪ সালে 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' এবং ১৮৬৪ সালে 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট' রূপে যার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ঊনবিংশ শতকের ত্রি-চতুর্থাংশের ভিতরেই মুম্বাই, চেন্নাই, লাহোর, দিল্লি প্রভৃতি শহরে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে যায়। সে হিসেবে পার্শ্ববর্তী কলকাতার চেয়েও একশ বছর পরে আমাদের যাত্রা শুরু। বলা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক পর্বে ঢাকা ছিল একটি মফস্বলি আধা-শহর, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে না ছিল শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার, না ছিল কোন নাগরিক সংস্কৃতি-চেতনা। বরং ছিল ধর্মাশ্রিত নিষেধের পিছুটান। ফলে ঔপনিবেশিক কলকাতা সমগ্র ভারতে রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হলেও তাতে যেমন বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ ছিল যৎকিঞ্চিৎ তেমনি শহর ঢাকার উপরও এর তেমন কোনো প্রভাব এসে পড়েনি।

ভাস্কর্য নির্মাণে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ব্যাপক উদাহরণ থাকলেও চিত্র রচনায় বাঙালির দক্ষতার তেমন নজির নেই। আমাদের অজন্তা নেই, মুঘল নেই, বাঘ বা বাদামি নেই, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা বা রাজস্থানি কিংবা পাহাড়ি চিত্রশৈলীর মতো উদাহরণ নেই। দরবারি চিত্র-ঐতিহ্যে আমাদের বলবার মতো একমাত্র উত্তরাধিকার পাল পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন। বলাবাহুল্য বিষয়-বৈচিত্র্যে বা নির্মাণ-কৌশলের অভিনবত্বে তা কখনোই অজন্তা, মুঘল বা পাহাড়ি শিল্পের মতো সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় নয়। ঢাকা দীর্ঘদিন সুবেহ বাংলার ও বঙ্গের স্বাধীন নৃপতিদের রাজধানী থাকলেও খুব আশ্চর্যজনকভাবে এখানে অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের মতো কোনো প্রাদেশিক চিত্রশৈলী গড়ে ওঠেনি। অথচ অন্যান্য মুসলিম শাসিত প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে সমৃদ্ধ চিত্রধারা দেখা যায়। এমনকি মুর্শিদাবাদ স্বল্পতর সময় বঙ্গের রাজধানী রূপে বিরাজ করলেও সেখানে বেশ উন্নত 'প্রাদেশিক মুঘল শৈলী'র চিত্র-ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। অবশ্য এই শৈলীর শিল্পীরা ছিলেন অবাঙালি। এতে মনে হয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দরবারি চিত্র-ঐতিহ্যে বাঙালির অংশগ্রহণ সামান্যই। নগরী

হিসেবে কলকাতার চেয়ে অনেক প্রাচীনতর হয়েও শিল্প-ঐতিহ্যে প্রবীণতর হওয়ার সুযোগ ঢাকা নগরী নেয়নি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম এবং কলকাতা নগরীর পত্তনের পর কলকাতাকে ঘিরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে প্রথম দেশীয় চিত্রশৈলী গড়ে ওঠে, যাকে নামকরণ করা হয়েছে 'কোম্পানি শৈলী' বলে, তা-ও হয়েছে অবাঙালি মুসলিম শিল্পীদের হাতে। সত্যি বলতে কী, খাঁটি বাঙালি শিল্পী সত্যিকার অর্থে রংতুলি হাতে নিয়েছে ইংরেজরা এদেশে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর। তা-ও প্রথমদিকে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকেরা চিত্রবিদ্যা শিক্ষাকে বিশেষ সম্মানের মনে করতেন না, আর্ট স্কুলে আসত কামার-কুমোর ও গ্রামীণ কারুশিল্পীর বংশধরেরা আর স্কুল-পালানো বাপে-খেদানো ছেলের দল। হ্যাভেলের অনুরোধে উচ্চবংশীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট স্কুলের শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার পরই কেবল বাঙালি ভদ্রসন্তানরা ক্রমে ক্রমে শিল্পশিক্ষালয়ে আসতে শুরু করে। এই অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বাঙালি আধুনিক ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বকীয় শিল্পশৈলী প্রণয়নের গৌরবে সিঞ্চিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক প্রতিভায় এবং নন্দলালের নেতৃত্বে ও বিনোদবিহারী-রামকিঙ্করের প্রতিভাস্পর্শে শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উদার সংশ্লেষণে এক সত্যিকার আধুনিক ভারতশিল্পের সূচনা ঘটে। সে এক গৌরবের সময় বাঙালির, চিত্রবিদ্যায় বাঙালির কৃতিত্বের ক্ষুদ্র কিন্তু অভাবনীয় পর্ব।

কলকাতা থেকে উদ্ভূত হয়ে 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলী' স্বদেশী জোয়ারে সওয়ার হয়ে সারা ভারতে ঢেউ তুললেও পূর্ব বাংলায় এর হাওয়া বিশেষ লাগেনি। এই বাংলার শিক্ষিত সমাজ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ছিলেন কলকাতামুখী এবং এই জোয়ারের ঢেউ ঢাকায় কেউ বহন করে আনেননি। এ কর্মকাণ্ডে বাঙালি মুসলিমের অংশগ্রহণ ছিল যৎকিঞ্চিৎ এবং তাঁদেরও কর্মস্থল ছিল কলকাতা। সাহিত্য বা সংগীতে ঢাকা বা পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরে কিছু কিছু কর্মকাণ্ড লক্ষ করা গেলেও প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র-ভাস্কর্যচর্চার কোনো প্রয়াস এখানে দেখা যায়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়ে হঠাৎ করে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যাওয়াতে বাঙালি মুসলিম শিল্পীরা পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং এখানে একটি শিল্পচর্চার আয়োজন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

এটি খুব স্বাভাবিক ছিল যে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোগীরা যখন ঢাকায় একটি শিল্প-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করলেন তখন তাঁদের অভিজ্ঞতায় 'মডেল' হিসেবে ছিল ব্রিটিশ ধারার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'কলকাতা আর্ট স্কুল'। তাঁরা তখনো য়ুরোপ বা আমেরিকা যাননি, শিল্প-ঐতিহ্যে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল ইংরেজদের শিক্ষণপদ্ধতি ছাড়া অন্যতর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ধারণাও তখন তাঁদের ছিল না। অতএব ইংরেজ ভিক্টোরীয় আদলের সনাতনপন্থী একটি শিল্প-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করা যথাযথ নয়। তাছাড়া এ-ও মনে রাখতে হবে যে জয়নুল আবেদিন ও অন্যান্য মুসলিম শিল্পীরা একাডেমিক বাস্তবানুগতার মধ্যেও একটি ভিন্নতর আবহ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। তখনকার কলকাতার হিন্দু-পরিবার থেকে আসা শিল্প-শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিল নগর-ঐতিহ্য থেকে আসা, ফলে তাদের বিষযবস্তু ছিল প্রধানত হিন্দু ধর্মীয় বা পৌরাণিক আখ্যান, অথবা নগরদৃশ্য বা নাগরিক জীবন। অন্যদিকে মুসলিম শিল্পীরা এসেছিলেন একেবারেই গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে। গ্রামীণ উৎস থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা এ শিল্পীদের মানসজগতে শ্রমজীবী গ্রাম্য মানুষ, লোকাচার ও লোক-সংস্কৃতি, গ্রামীণ নিসর্গ ইত্যাদির স্মৃতি ছিল উজ্জ্বল ও জীবন্ত। ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তাঁদের পক্ষপাতের পার্থক্য ধরা পড়ে–বাংলার নিসর্গ, নদী, বৃষ্টিবিধৌত রূপ আর আবহমান গ্রামজীবন এঁদের শিল্পকর্মে এক প্রাণস্পন্দিত

দ্যোতনায় রূপ পায় যা কলকাতার নাগরিক শিল্পে এর আগে এত স্পষ্টতায় প্রতিভাত ছিল না। মন্বন্তরে শিকড়-উপড়ানো গ্রামীণ মানুষের অসহায়তাও তাই জয়নুল আবেদিনের তুলিতে যতটা মর্মস্পর্শী সমবেদনায় বিধৃত হয়েছে তেমনটি আর কারোরই নয়। জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযাত্রীদের কারো কারো উপর নব্যবঙ্গীয় শৈলীর কিছু কিছু অনুপ্রেরণা প্রভাব ফেললেও কলকাতা-কেন্দ্রিক বাস্তবানুগ পশ্চিমা ধারাতেই তাঁরা প্রধানত স্থিত ছিলেন। তবে পাকিস্তান পর্বেই বিভিন্ন আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলী ও দেশজ লোককলা তাঁদেরকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে এবং তাঁদের কাজে বিভিন্নমুখী উত্তরণ ঘটে। ফলে তাঁদের প্রচেষ্টায় ঢাকায় স্থাপিত শিল্পশিক্ষালয়ে প্রথম থেকেই কিছুটা ভিন্নতাও ছিল। কলকাতায় প্রচলিত ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় ও নগরজীবনের অনুষঙ্গের বিপরীতে ঢাকায় দেখা যায় গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও অন্ত্যজ লোকজীবনের রূপায়ণ। কলকাতায় তেলরঙের প্রতি আকর্ষণের বিপরীতে ঢাকায় দেখা যায় স্বচ্ছ জলরঙের প্রতি পক্ষপাত। এই সামান্য বৈশিষ্ট্য ও অসামান্য উদ্যমই ছিল জয়নুল ও তাঁর সাথীদের সম্বল। এটুকু নিয়েই তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন ধর্মীয় উন্মাদনায় সদ্য-স্বাধীন পাকিস্তানে শিল্প শিক্ষায়তন গড়ার মত একটি বিপরীতমুখী কাজ সম্পন্ন করতে। পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিল্পকলার পাশাপাশি একটি সামাজিক অঙ্গীকার তাঁদের মধ্যে এক ধরনের দায়িত্বশীলতার বোধ নির্মাণ করে। ফলে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার সূচনাটি হয়েছিল চমৎকার। একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ শিক্ষার্থী সূচনাপর্বেই বিপুল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একই সঙ্গে পঞ্চাশের দশক ছিল পূর্ববাংলাবাসীর আত্ম-অনুসন্ধান ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত হওয়ারও দশক। পাকিস্তানি ধর্মবাদী ঐতিহ্যচেতনাকে অস্বীকার করে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষারও যুগ। এই বোধ পঞ্চাশের নবীন শিল্পীদের মানবমুখী ও সামাজিক সচেতনতা-প্রয়াসী বক্তব্যবাহী বিবিধ নিরীক্ষাধর্মী শিল্পোদ্যমে উদ্যোগী করে তোলে। তবে সদ্য-স্বাধীন দেশে ভিন্নমুখী আকর্ষণও কম ছিল না। স্বাধীনতা খুলে দিয়েছিল পশ্চিমের জানালা, বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের সরাসরি সংস্পর্শের সুযোগ। প্রথম প্রজন্মের অধিকাংশ শিল্পীই দ্রুত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ নতুন এ অভিজ্ঞতা তাঁদের চোখ যে খানিকটা ধাঁধিয়ে দেবে এতে আর আশ্চর্য কী। শিল্পে ‘সমকালীনতা’ ও ‘আন্তর্জাতিকতা’ অর্জনের উপায় হিসেবে তৎকালে পশ্চিমে ব্যাপকভাবে চর্চিত নির্বস্তুকতাকেই আধুনিক শিল্পের পরাকাষ্ঠা হিসেবে তাঁরা অনেকেই বিবেচনা করতে শুরু করেন। শিল্পে প্রত্যক্ষগোচর রূপ বা দেশীয় অনুষঙ্গ প্রয়োগ তাঁদের কাছে পশ্চাদপদতা বলে বিবেচিত হয়। ষাটের দশকে স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসনের প্রবল নিপীড়নে প্রগতিশীল ও জনমুখী রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চাও খানিকটা থিতিয়ে এসেছিল। সমগ্র ষাটের দশক ধরেই চারুশিল্পের মূল ধারাটি ছিল আঙ্গিকমুখী, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দৃষ্টিনন্দন একটি চিত্রতল রচনা করা। দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করা, মননে অভিঘাত সৃষ্টি করা নয়। এই শিল্প হয়তো ব্যক্তিক যুগযন্ত্রণার কোনো সূক্ষ্ম ও প্রতিকায়িত প্রতিফলন বটে, কিন্তু পরিপার্শ্ব ও সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি উদাসীন। অবশ্য ষাটের দশকের শেষাশেষি গণআন্দোলন ও গণজাগরণে শিল্পীসমাজ প্রবলভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এবং পোস্টার, ফেস্টুন, কার্টুন, আল্পনা, ব্যানারচিত্র, প্রচ্ছদ, অলংকরণ, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদিতে দেশজ প্রেক্ষাপট ও সমকালের আকাঙ্ক্ষাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি সত্তার জাগরণপর্বে চারুশিল্পীদের ভূমিকা ছিল প্রথম সারিতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন সমগ্র জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে প্রবল এক স্বদেশচেতনা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে যেমন তেমনই চারুশিল্পে এর অভিঘাত এসে লাগে। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে স্বদেশের প্রেক্ষাপটকে আবিষ্কার ও উপস্থাপনের

এক ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। একমাত্রিক বিমূর্ততার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে শিল্প প্রয়াসী হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যসন্ধানী, জীবনসম্পৃক্ত ও মানবমুখী হওয়ার। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়িই টুটে যায়, স্বপ্নভঙ্গের হতাশা জাতিকে আবারও গ্রাস করে। দীর্ঘস্থায়ী সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অন্তরালে দেশ পুনরায় ফিরে যায় সুবিধাভোগী শ্রেণির কর্তৃত্বের আওতায়। এ স্বপ্নভঙ্গ প্রভাব ফেলে শিল্পকলায়ও। আশির ও নব্বই-এর দশকে স্বদেশ ও ঐতিহ্যের আবেগী রূপায়ণের স্থান নেয় দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য, যুক্ত হয় হতাশা, ক্ষোভ ও পরিহাস। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখছি দৃশ্যকলার খোলনলচে পাল্টে যাচ্ছে, চিত্র-ভাস্কর্যের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে এর নির্মাণ নানা বিচিত্র উপকরণ ও উপায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ইনস্টলেশন, পারফর্মেন্স, ভিডিও, সাইট স্পেসিফিক আর্ট প্রচলিত চারুশিল্পের এলাকাকে প্রসারিত করে চলেছে। আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গনেও আমাদের দৃশ্যকলা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। আজ এ কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করা যায় যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন এ দেশের শিল্পচর্চায় সার্বিকভাবে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে– নানান প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের শিল্পজগৎ প্রাণস্পন্দিত, বৈচিত্র্যপ্রয়াসী ও নিরীক্ষাপ্রবণ। বাংলাদেশের মতো অতিদরিদ্র একটি দেশে চিত্রভাস্কর্যের যে পরিমাণ চর্চা হচ্ছে তাতে অন্তত এটি প্রতিভাত যে শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাঙালির সংস্কৃতিপ্রীতির বিনাশ নেই, এই সত্যটি আমাদের শক্তি ও আশান্বিত হওয়ার প্রেরণা। এই একুশ শতকে বাংলাদেশের শিল্পজগৎ নতুন প্রজন্মের সচেতন সৃজনশীলতায় পল্লবিত হবে, বিশ্বশিল্পের আসরে অধিকার করবে সম্মানজনক আসন এমন আশাবাদ নিশ্চয়ই ব্যক্ত করা যায়।

[লেখক: অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্র ব ন্ধ

চিত্রশিল্পে বাঙালিয়ানা এবং বাংলাদেশ-চরিত্র নির্মাণ

র শি দ আ মী ন

বাঙালিয়ানা

আত্ম-অনুসন্ধান বা শেকড়ের খোঁজ করা বোধ হয় মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ঠিক এই সময়ে এসে আমরা যখন আমাদের শিল্পের উৎস সন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠি কিংবা ইতিহাসের হাত ধরে চলে যাই অনেক পেছনে তখন যেন একটা সোনালি সময়েরই আভাস দেয়, কিন্তু এই সময়ের শিল্পের চর্চা কতটা আমাদের নিজেদের পরিচয় বহন করছে কিংবা আমাদের বাঙালি চরিত্র কতটা প্রতিভাত হচ্ছে, তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। ইতিহাসের পর্যালোচনায় জানা যায় বাংলায় পালযুগের শাসনামলকেই ধরা হয় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে সুবর্ণ কাল। এই সময় কি রাষ্ট্র পরিচালনায় কি সাংস্কৃতিক চর্চায় সবক্ষেত্রেই এক অভাবনীয় সাফল্যের নমুনা পাওয়া যায়, এবং এই সময়ের প্রেক্ষাপটেই বাঙালি জাতি পৃথিবীর মানচিত্রে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। চিত্রশিল্পেও উচ্চমার্গীয় শিল্পের (High Art) যে প্রথা এই বাংলায় গড়ে উঠেছিল তার চর্চাও পালযুগে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ চিত্রশিল্পের প্রথম নিদর্শন হিসেবে পালযুগের চিত্রিত পুঁথির আঁকা ছবিগুলোই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজারা এদেশ শাসন করে এবং এই চারশ বছর সময়কালেই বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্ত ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল। শিল্পের সমস্ত শাখায় যেমন, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প সবক্ষেত্রেই একটি পরিপক্ক রূপ পরিগ্রহ হয়েছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে একটি পরিপক্ক রূপ হঠাৎ করেই গড়ে ওঠে না, তার একটি প্রেক্ষাপট কিংবা পূর্বসূত্রিতা বিদ্যমান থাকে এবং একথা মেনে নিতেই হয় যে দীর্ঘদিনের চর্চার ফলেই শিল্প একটি পরিশীলিত রূপ লাভ করে। আমরা পালযুগের পুঁথিচিত্রে যে অঙ্কনশৈলী লক্ষ করি তা অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ, মানবদেহ অঙ্কনে এবং তার ভঙ্গিমা রূপায়ণে এবং সেই সাথে বর্ণপ্রয়োগে যথেষ্ট পরিপক্কতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পরিপ্রেক্ষিতের (Perspective) ব্যবহারও চোখে পড়ে এবং বর্ণের বিপ্রতীপ (Contrast) চরিত্র নির্মাণ করে একটি চিত্রভাষা তৈরির প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। সুতরাং আমরা ধরেই নিতে পারি যে, পালযুগের আগেও এই বাংলায় চিত্রশিল্পের একটি পরম্পরা গড়ে উঠেছিল, হয়তো আর্দ্র আবহাওয়া এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে কোনো নমুনা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিধ কাহিনী, সূত্রাবলি এবং শাস্ত্রসমূহই এই পুঁথিমালায় স্থান পেত। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামের যে পুঁথিটি

নেপাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তা অনেকগুলো অঙ্কিত চিত্রদ্বারা শোভিত, এখানে বুদ্ধের নানা ভঙ্গিমা এবং সেইসাথে জাতকের নানা কাহিনীর অলঙ্করণ স্থান পেয়েছে। তালপাতার উপর চিত্রিত এই পুঁথিসমূহ যেমন নানা অনুপম চিত্র দ্বারা অলংকৃত হয়েছে পাশাপাশি সুন্দর হস্তলিপি দ্বারা নানা কাহিনী এবং শাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে পালযুগের পতনের পর এই অনুপম শিল্পধারা বাংলার মাটিতে কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। তবে নেপালে এবং তিব্বতে অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে, যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে পুঁথিচিত্রের ঐতিহ্য স্তিমিত হতে থাকে, তবে পালশিল্পের এই নান্দনিক চিত্রশৈলী অদ্যাবধি নেপাল ও তিব্বতে নানা আঙ্গিকে টিকে আছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। নেপালে তালপাতার পাশাপাশি কাগজেও কিছু পুঁথি চিত্রিত হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে ধারণা করে নেয়া যায় যে, চীন দেশে বেশ আগেই কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তা প্রথম শতাব্দীতেই, ধারণা করা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাহায্যে কিছু কাগজ হয়তো নেপালে আমদানি হয়েছিল অথবা কাগজ তৈরির ফর্মুলা চীনাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল, কারন আমরা জানি নেপালের হাতে তৈরি কাগজ এখনো পৃথিবীবিখ্যাত। কাগজ তৈরির দক্ষতা হয়তো নেপালিরা প্রাচীনকালেই রপ্ত করেছিল। কাগজ তালপাতার জায়গা দখল করে নিল। এ পর্যায়ে চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও কিছুটা সুবিধা অর্জিত হল, এবং সেইসাথে বর্ণের উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি পেল। কালক্রমে নেপালের মধ্যযুগের চিত্রশিল্পীরা এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিল যে সূদুর চীন দেশের সম্রাটের রাজদরবারেও ডাক পড়েছিল। বর্তমানে নেপালে এবং তিব্বতে প্রচলিত 'থানকা' চিত্রশৈলী একান্তই তাদের চর্চা এবং দক্ষতার ফসল। এই শৈলী সমস্ত বিশ্বব্যপী এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণামতে বৌদ্ধ শিল্পের এই অনুপম শৈলীর সূত্রপাত হয়েছিল পাল পুঁথিচিত্রের প্রেরণাতেই, বাংলার পুঁথিচিত্রই কালক্রমে 'থানকা' চিত্রধারাতে রূপান্তরিত হয়। বাংলার হারিয়ে যাওয়া এই অনুপম শৈলীটি যেন নেপাল ও তিব্বতে 'থানকা' শৈলীর মাঝে জীবন্ত হয়ে রইল। পালযুগের পরে সেনরা এই দেশে ক্ষমতা দখল করে এবং পরবর্তীতে চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কিরা এই দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং এই বঙ্গভূমি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময় অতিক্রম করে। পাল শাসনামলে বৌদ্ধযুগে যে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা যেন স্তিমিত হতে থাকে। তবে হাজার বছর ধরে বাংলায় নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যে প্রচলন হয়ে আসছে তাতে লোকশিল্পের একটি ব্যাপক ভূমিকা লক্ষণীয়। উৎসব-পার্বণকে উপলক্ষ করে বাংলায় যে লোকশিল্পের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মূলধারার শিল্পের বিকল্প হিসেবে আমাদেরকে একটি জাতীয় চরিত্র প্রদান করে, এবং একেবারে মাটি থেকে উঠে আসা এই প্রান্তিক লোকজ শিল্প বাঙালি জাতির শিল্পের স্বকীয়তার সংকটকে উত্তরণে প্রভূত ভূমিকা রাখে। বাংলার পটচিত্র, সরাচিত্র এবং সখের হাঁড়ির মধ্য দিয়ে যে চিত্রভাষা তৈরি হয়েছে তা যেন ক্ষয়িষ্ণু পাল চিত্রকলার অস্তমিত গৌরবের বিপরীতে একটি নব সূর্যোদয় হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে পদানত হওয়ার পর আমাদের শিল্পচর্চায় ব্যপক পাশ্চাত্যকরণ ঘটে, পশ্চিমা একাডেমিক কায়দায় এখানে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বলা যেতে পারে এই সময় থেকেই আমাদের নিজস্ব শিল্পধারার যে ক্ষীণ স্রোতটি ছিল, তা যেন মৃতপ্রায় হয়ে উঠল। তবে ব্যতিক্রমও আছে, কোলকাতা আর্ট কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবই প্রথম ভারতীয় শিল্পের পাশ্চাত্যকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি অজন্তা, ইলোরা, পাহাড়ি চিত্রকলা, মুঘল মিনিয়েচারের আদলে ভারতীয় শিল্পের চর্চার একটি আবহ তৈরি করে দেন তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

তবে হ্যাভেলেরই প্রেরণায় মূল কাজটি করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ শতকের প্রারম্ভে তিনি পত্তন করেন নব্য বঙ্গীয় শিল্পরীতির যা বেঙ্গল স্কুল নামেও পরিচিত। শেকড় অন্বেষণের এই পর্যায়ে অবনীন্দ্র ভারতীয়, বঙ্গীয় তথা প্রাচ্য শিল্পবিষয়ক ব্যাপক গবেষণা করে পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার বিপরীতে একটি প্রাচ্য শৈলী নির্মাণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রেরণা ছিল অজন্তার ভিত্তিচিত্রের রেখাধর্মিতা, চীন-জাপানের ধোয়া (Wash) পদ্ধতি, মুঘল মিনিয়েচারের বর্ণনাধর্মী চরিত্র এবং আরো নানান ভারতীয় ও বঙ্গীয় শিল্পশৈলী। তিনি মূলত বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এবং অনেকাংশেই সার্থক হয়েছিলেন, তবে তথাকথিত পাশ্চাত্য আধুনিকতার তোড়ে এই নব্য বঙ্গীয় ধারা খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বিশ শতকের শুরুর দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল এবং সেইসাথে স্বদেশিয়ানার একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজ পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল স্বাদেশিকতার এই আন্দোলন, গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের বিপরীতে নিজস্ব ধারার একটি ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার। তবে দীর্ঘদিনের ইংরেজি শেখা ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই চেতনা কতটুকু প্রোথিত হয়েছিল, তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। তবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানামুখী কর্মকা- সূচিত হয়েছিল যা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এক্ষেত্রে গুরুসদয় দত্তের উদাহরণ টানা যেতে পারে, তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিয়ানা এবং স্বদেশি ভাবধারার একটি জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তিনি সমস্ত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে লোকশিল্পের একটি বড় সংগ্রহ গড়ে তোলেন, এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে লোকশিল্পের অনুপম গুণাবলি তুলে ধরেন। শিল্পগুরু কামরুল হাসানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুল মূলত চীন, জাপান, ভারতীয় তথা প্রাচ্যশিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি উচ্চমার্গীয় শিল্পসৌকর্যের (High Art) প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তবে সেখানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের স্থান কতটুকু ছিল তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। তবে এই সময়ই আবির্ভাব ঘটেছিল শিল্পী যামিনী রায়ের, তিনি শহুরে বাঙালি শিল্পীসমাজের মাঝে এমন এক শিল্পধারার প্রবর্তন করেন যা আমদের লোকশিল্পের আত্মা থেকে উৎসারিত। তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটশিল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন একটি ধারার উন্মোচন করেন যাতে ষোল আনাই বাঙালি চরিত্র উঠে এল। এ প্রসঙ্গে অশোক ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার চিত্রকলা*, বইয়ে লিখেছেন, ‘তিনি একজন শিল্পী হিসেবে ইউরোপীয়দের মতো, কিংবা চীনা বা তিব্বতীয়দের ছবি আঁকতে পারেন না, যেমন পারেন না পারসিক বা মুঘল চিত্রকরদের মতো আঁকতে, কেননা তিনি এদের পরিবেশে মানুষ নন। এই উপলব্ধিই একজন প্রকৃত বাঙালির মতো, বাংলার নিজস্ব পরম্পরার ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করল তাঁকে’।

তিনি চিত্রতলের সমস্ত বাহুল্যতা বর্জন করে বাংলার পটশিল্পের আঙ্গিকে দ্বিমাত্রিক রেখাধর্মিতায় সারলিক প্রকাশধর্মিতায় একটি নতুন শিল্পআঙ্গিকের জন্ম দিলেন এবং বিষয় হিসেবেও বেছে নিলেন বাংলার লোক ও পৌরাণিক কাহিনী, যা সেই সময় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মাঝে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই ধারাও বাংলা চিত্রকলার একটি জাতীয় চরিত্র হিসেবে টিকে থাকতে পারেনি। কারণ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে ব্যাপক আধুনিক শিল্পের জোয়ার এসেছিল তা তরঙ্গায়িত হয়ে এই ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়েছিল। তবে পরবর্তীতে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালি শিল্পীরা যে চিত্রকলায় আত্মনুসন্ধান বা শেকড় অন্বেষণের চেষ্টা করেননি তা-ও ঠিক নয়। শিল্পগুরু কামরুল হাসান গুরুসদয় দত্তের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে বাংলার

লোকশিল্পের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি হাজার বছরের লোকশিল্পকে তাঁর আধুনিক শিল্পচর্চার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পটুয়াদের সরল আঙ্গিকের রেখাধর্মিতা থেকে প্রেরণা নিয়ে এবং লোকজ শিল্পের উজ্জ্বল বর্ণের প্রয়োগ করে তিনি যে নিজস্ব ধারা তৈরি করেছেন, যা আমাদের সামনে আমাদের হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলার শিল্পকলা হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে পালযুগের সুবর্ণ সময়কে অতিবাহিত করে বাংলার শিল্প একটি উচ্চমার্গীয় চরিত্র অর্জন করেছিল, তবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে তা হয়তো চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছতে পারেনি, তবে হাজার বছরের লোকশিল্পের ধারার মধ্যে বাংলার সংস্কৃতি জীবন্ত হয়ে আছে। বলা যায় বাংলার লোকশিল্প বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া শিল্পঐতিহ্যের অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করছে।

দুই.

বাংলাদেশ-চরিত্র নির্মাণ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের লোকশিল্প হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এদেশের লক্ষ্মীর সরা, গাজির পট কিংবা নকশিকাঁথা, টেপা পুতুল, সখের হাঁড়ি সহ নানা ধরনের লোকআঙ্গিকের শিল্পসম্ভার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এবং তা রঙ-রেখার নান্দনিকতায় কিংবা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের গুণে এই উপমহাদেশের কলারসিকদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত এবং একটি উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তবে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের প্রবেশ কিছুটা বিলম্বেই ঘটে এবং তা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি সময়ে। এদেশের লোকশিল্প হাজার বছর ধরে প্রবহমান থাকলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের শেকড় খুব একটা গভীরে নয়। একটি সময়-রেখা হিসেবে ১৯৪৮ সালকেই এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক তথা আধুনিক শিল্পের সূচনালগ্ন হিসেবে ধরা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীয় রেনেসাঁর সময় আলো-ছায়ার বিপ্রতীপ চরিত্র, পরিপ্রেক্ষিত ও অস্থি-সংস্থান বিদ্যা, ইত্যাদির প্রয়োগ করে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে ত্রিমাত্রিক ইমেজের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল এবং গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক তথা একাডেমিক শিল্পচর্চার; সেই হিসেবে এই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের সূচনা কিছুটা বিলম্ব বইকি। অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা শহরে প্রথম একাডেমিক শিল্পচর্চার শুরু হয়েছিল ১৮৬৪ সালে, কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইতালীয় রেনেসাঁর আলোকে এই আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজদের আনুকূল্যে। এই সময় থেকে বলা যেতে পারে অনুকরণধর্মী কিংবা বাস্তবধর্মী রীতির প্রচলন শুরু হয় এবং সেইসাথে শুরু হয় এদেশের শিল্পের পাশ্চাত্যকরণ। ইংরেজরা এদেশে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চার যে বীজ বপন করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে কি এদেশের শিল্পের জাতীয় চরিত্র কিংবা শিল্পের নিজস্ব ভাবধারা বিলুপ্তির পথে যাত্রা শুরু করেছিল? এ বিষয় নিয়ে হয়তো বিস্তর বাদানুবাদ হতে পারে কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করলে এ উক্তির সত্যতার কিছু প্রমাণ হয়তো পাওয়া যেতে পারে। হাজার বছরের ভারতীয় শিল্পের যে ঐতিহ্য তা ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করেছিল এদেশে ইংরেজদের আবির্ভাবে, তবে আশার কথা এই ইংরেজ সাহেবরাই আবার আমাদের শিল্পের জাতীয় ঐতিহ্য এবং শিকড় অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এক্ষেত্রে হ্যাভেল সাহেবের নাম সর্বাগ্রে এসে যায়। তাঁর প্রেরণায় এবং অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশ শতকের শুরুতে গড়ে উঠেছিল নব্য-বঙ্গীয় শিল্পধারা। যদিও তথাকথিত পাশ্চাত্য আধুনিকতার জোয়ারে এই ধারা খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি কিন্তু ভারতীয় তথা বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের একটি বীজ বপন করতে পেরেছিল

এই শিল্পচিন্তা। চীনারা এবং জাপানিরা তাদের শিল্পের জাতীয় চরিত্র রক্ষা করতে পেরেছে, অদ্যাবধি তাদের দেশে মূলধারার শিল্প হিসেবে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধারা রক্ষিত আছে। তবে পাশ্চাত্য শিল্পের চর্চাও সমান্তরালভাবে অব্যাহত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধারাসমূহ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। আমাদের অজন্তার চিত্রাদর্শ, পাহাড়ি চিত্রধারা, পাল পুঁথিচিত্র, কালিঘাটের পটচিত্র, মুঘল মিনিয়েচার ইত্যাদির চর্চার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য আধুনিক ধারার বিপরীতে নিজস্ব চিত্রশৈলীর একটি সমান্তরাল ধারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। তবে আধুনিক শিল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে লোকশিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারাসমূহ বার বার উঠে এসেছে। এবং এটাও তো ঠিক যে, শিল্পীরা তাদের পারিপার্শ্বিকতার বাইরে যেতে পারে না। তাঁর দেশসমাজ জলমাটিই কি ঘুরে ফিরে আসে শিল্পকর্মে?

১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের আধুনিক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দেশবিভাগের পূর্বে এই দেশে শিল্পশিক্ষার তেমন কোনো স্কুল গড়ে ওঠেনি, একমাত্র ব্যতিক্রম খুলনার মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্ট। শিল্পী শশিভূষণ পালের প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে এই স্কুলটি গড়ে ওঠে। তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্কুল হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজটিই এদেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শিল্পাচার্য জয়নুলের নেতৃত্বে গড়েওঠা এই শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি এদেশে চারুশিল্পের জাগরণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষিত এবং পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত একদল উচ্চ রুচিসম্পন্ন প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে আমাদের দেশের শিল্পের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক এবং হবিবুর রহমান প্রমুখ। পরে এই শিল্পমিছিলে যুক্ত হয়েছিলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। অবিভক্ত বাংলায় শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতাই ছিল প্রধান কেন্দ্র, সেই সময় এই বঙ্গের মানুষেরা যারা শিল্পী হিসেবে যাদের ভাগ্য গড়ে তুলতে চাইতেন তাঁরা কলকাতাতেই পাড়ি জমাতেন। কলকাতা একটি প্রাচীনতম শহর হিসেবে দীর্ঘদিনের নানামুখী ঐতিহ্যকে ধারণ করে একটি কসমোপলিটন শহরে পরিণত হয়েছিল। একসময়ের ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যে সেজে উঠেছিল কলকাতা। নাটক-থিয়েটার, সাহিত্য চর্চায়, সংগীত চর্চায় এবং চারুশিল্পের উচ্চমার্গীয় মূলধারার চর্চার মধ্যদিয়ে এই কলকাতা মহানগর দুই বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এবং সেই সময় কলকাতাকে উপমহাদেশের লন্ডন কিংবা প্যারিস বলে সম্বোধন করলেও অত্যুক্তি বলে গণ্য হবে না। এবং একথা বলাই যেতে পারে যে, ভারত ভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একধরনের কলকাতা-নির্ভরশীলতা ছিল। হয়তোবা সেই কারণেই পূর্ব বাংলায় তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। ঢাকা শহরের সত্যিকার উত্থান শুরু হয় দেশবিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে। তবে ১৬১০ সালে ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর এই শহর মুঘল স্থাপত্যে সমৃদ্ধ হয়ে একটি মুঘল শহরের আদল পায়। পরবর্তীতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে ঢাকা যেন একটি পরিত্যক্ত শহরের রূপ পরিগ্রহ করে। উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজ সৌখিন শিল্পী চার্লস ডয়েলির আঁকা চিত্রাবলিতে ঢাকার একটি ভগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছিল।

১৯৪৮-পূর্ব ঢাকার মূলধারার শিল্পচর্চার স্বরূপটি কী ছিল তা নিয়ে তেমন কোনো নমুনা কিংবা প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। একমাত্র আলম মুসাব্বির নামের একজন শিল্পীর হদিস মেলে যিনি ঢাকার নবাবদের আনুকূল্যে মুঘল শৈলীর অনুবর্তী হয়ে কিছু ছবি এঁকেছিলেন যার কিছু নিদর্শন

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এবং ৪৮-পূর্ব মূলধারার শিল্পচর্চার নমুনা হিসেবে আলম মুসাব্বিরের এই শিল্পকর্মসমূহ মূল্যবান নমুনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে পূর্ব বাংলার শিল্পের মূল শক্তি হিসেবে লোকশিল্পকেই সবসময় ধরা হয়। হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে লোকশিল্পের যে ভা-ার গড়ে উঠেছে তা সবসময়ই একটি সমৃদ্ধ শিল্পশৈলীর চিহ্ন বহন করে আসছে। রঙ রেখার সাবলীল ব্যবহার, নানামুখি আলংকারিক মোটিফের সমাহারে এই দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে বিষয় করে এবং নানামুখী ধর্মবিশ্বাস, যাদুবিশ্বাস এবং বিভিন্ন টোটেম টাবুকে অবলম্বন করে লোকজ শিল্পীদের হাতে যে শিল্পঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা একান্তই আমাদের মাটি থেকে উৎসারিত এবং এই দেশের শিল্পের জাতীয় চরিত্রকে পৃথিবীর বুকে অনন্য মহিমায় তুলে ধরে। যদিও এই শিল্প নাগরিক উচ্চমার্গীয় মূলধারার শিল্পের কাতারে পৌছতে পারে না তবু একথা বলতেই হয় আমাদের মূলধারার শিল্প যখন পাশ্চাত্যের প্রভাবে আপন চরিত্র খুইয়ে বসেছে, তখন লোকশিল্পই আমাদের শিল্পের নিজস্বতাকে ধরে রেখেছে। আমাদের দেশের দুই শিল্পগুরু জয়নুল এবং কামরুল দুজনেই লোকশিল্পের এই শক্তি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কলকাতাফেরত এই দুই শিল্পী শেকড়সন্ধানী হয়েছিলেন। সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে লোকশিল্পের সংগ্রহ গড়ে তুলেন। জয়নুল আবেদিন গড়ে তুলেছিলেন লোকশিল্প যাদুঘর। আর কামরুল হাসান তো একেবারে লোকশিল্পের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে পটুয়া বলে দাবি করতেন এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রের আঙ্গিকে সারাজীবন ছবি এঁকে গেছেন। কামরুল হাসান আধুনিক শিল্পধারার সাথে এদেশের লোকশিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি বাঙালি শিল্পসত্তার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং সেইসাথে শিল্পের একটি বাংলাদেশ-চরিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল, যিনি প্রথম কাতারে থেকে এদেশের শিল্পআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনিও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিল্পচর্চার উপজীব্য হিসেবে এই দেশকেই বেছে নিয়েছিলেন। এদেশের জীবনমৃত্যু, হাসিকান্না, আনন্দউল্লাস, মানুষ প্রকৃতি সবই যেন এপিক-ধর্মিতায় তাঁর ক্যানভাসে উঠে আসে। তিনি যেমন মনপুরার জলোচ্ছাসের ছবি এঁকেছেন আবার জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে নবান্নের ছবিও এঁকেছেন। এবং সারাজীবন তিনি শিল্পসৃজনে এদেশের মানুষের কথাই বলে গেছেন। বাংলাদেশের শিল্পআন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুখের বিষয় হচ্ছে যে, এদেশের তিন শিল্পগুরুরই দেশভাবনা ছিল প্রকট, অর্থাৎ জয়নুল, কামরুল, সুলতান– তিনজনের ক্যানভাসেই ঘুরেফিরে দেশের কথা উঠে এসেছে। বাংলাদেশের শিল্পের একটি নিজস্ব ভাষা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই তিন শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য। সুলতান এদেশের লোকজ মানুষকে দানবীয়ভাবে তুলে ধরেছেন, এক ধরনের দার্শনিকতায় মগ্ন হয়েছেন, এদেশের প্রান্তিক মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে রূপকায়িত করেছেন। আমাদের দেশের এই মহান তিন শিল্পীর হাত ধরে শিল্পে বাংলাদেশ-চরিত্র নির্মাণের প্রয়াসের যে সূচনা হয়েছিল তা থেমে থাকেনি, বরং তা নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একধরনের সফলতার পথে যাত্রা করেছে।

১৯৪৮ সালে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের আধুনিক চারুশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে তা পঁয়ষট্টি বছর অতিক্রম করেছে। আসলে ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকেই আমাদের দেশে শিল্পের একটি জাগরণ ঘটে গিয়েছিল। এই সময় দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে একঝাঁক প্রতিভাবান নবীন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুরতাজা বশীর, হামিদুর রহমান, কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, নভেরা আহমেদ,

রশীদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, কাজি আব্দুল বাসেত প্রমুখ। এই শিল্পীদের অধিকাংশই সেই সময় ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ইউরোপ এবং আমেরিকা তখন আধুনিক শিল্পের স্বর্গ। খুব স্বভাবতই সেই সময়ের তরুণ শিল্পীরা নতুন এইসব শিল্পধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং এদেশে নিরীক্ষাধর্মী বিমূর্ত ধাঁচের শিল্পের প্রচলন করেছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রশীদ চৌধুরী, তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে এসে আরো বেশি শেকড়-অনুসন্ধানী হয়ে ওঠেন। তিনি লোকশিল্পের মধ্যে খুঁজে পান আধুনিক শিল্পের উপাদান, এবং লোকশিল্প থেকে মটিভ নিয়ে রং-রেখার প্রেরণায় তাঁর ক্যানভাস ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং দেশ-চরিত্র উঠে আসে তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পী কিবরিয়ার কথাও এখানে উল্লেখ করার মতো, তিনি জাপান থেকে ফিরে শিল্পের বিমূর্ততায় আচ্ছন্ন হলেন, তবে এই বিমূর্ততা পাশ্চাত্যের আদলে সৃজিত নয়, বরং এই দেশের মানুষের অন্তর্নিহিত আনন্দ-বেদনার কাব্য। একজন চীনা শিল্পী তাঁর কাজ দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রাচ্যদেশের চাপা কান্না' বলে। হয়তো জাপানে বসে তিনি 'জেন' ধ্যানে মজেছিলেন। শিল্পী কিবরিয়া এদেশের বিমূর্ত শিল্পের পথিকৃৎ, তিনিও সচেষ্ট হয়েছেন একটি শিল্পভাষা সৃষ্টি করতে, যা এদেশের জলবায়ু থেকেই উৎসারিত।

শিল্পী মাত্রই তাঁর পারিপার্শ্বিকতার অনুবর্তী। দেশ, মৃত্তিকা, মানুষ, প্রকৃতি, লোকজ জীবন এই সবেরই সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে শিল্পের দেশ-চরিত্র। এইদেশের আধুনিক শিল্পের যাত্রার বয়স হল পঁয়ষট্টি, ধীরে ধীরে আমাদের শিল্পেরও ভূমিসংলগ্ন একটি ধারা তৈরি হচ্ছে। একদিন বিশ্বমাঝে 'বাংলাদেশ শিল্প' নামে একটি অনন্য ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে, আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার চিত্রকলা, অশোক ভট্টাচার্য।
২. বাঙালীর ইতিহাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
৩. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
৪. উইকিপিডিয়া।

[লেখক: চিত্রশিল্পী। প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।]

প্র ব ন্ধ

আমার শিল্পচর্চা ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মু র্ত জা ব শী র

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লাইব্রেরিতে প্রবেশের অধিকার শুধু তাঁর বড় ছেলে সফিয়্যাল্লাহ্‌রই ছিল। আমি খুবই ছোট ছিলাম, পরে বড় ভাইদের কাছে শুনেছি, লাইব্রেরিতে ঢুকলে বাবা কিছু বলতেন না। আমি নাকি তাঁর লাইব্রেরির বইগুলো নাড়তাম, র‍্যাক থেকে মেঝেতে ফেলতাম, আবার তুলে রাখতাম। ছোটবেলায় আমার ছবি দেখতে খুব ভালো লাগত। আমি সেসব বইয়ে নানা রকম ছবি দেখতাম। বাসায় *মডার্ন রিভিউ*, *বিচিত্রা*, *ভারতবর্ষ*, *প্রবাসী* ইত্যাদি পত্রিকা আসত। সেখানে ছবি থাকত। এখন বুঝতে পারি ওই ছবিগুলো ছিল অবন ঠাকুরের, নন্দলাল বসুর, আরো অনেকের, যেমন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অসিত হালদার, সুধীর খাস্তগীর, বরদাচরণ ও সারদাচরণ উকিল, অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের। পরবর্তীকালের ওই ছবিগুলো কেটে কেটে আমি একটি রঙিন কাগজের খাতায় লাগিয়েছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই ছবির প্রতি আমার একটা ভালোবাসা ছিল; যদিও ড্রইংয়ের প্রতি তেমন ঝোঁক ছিল না, শিল্পী হওয়ার কোনো স্বপ্নও আমি দেখিনি। স্কুলের বইয়ের পাতার ছবিগুলো রং করতাম, আনন্দ পেতাম। লাল, সবুজ ও কপিং পেনসিলে পানি দিয়ে বেগুনি রং বের করে লাগাতাম। বাবুর টেবিলে এসব ছিল। তিনি বেশিরভাগ লেখালেখি করতেন সবুজ কালি কিংবা কপিং পেনসিলে। বেশ মনে আছে, সেভেনে পড়ার সময় বাবার টেবিল থেকে কালি নিয়ে কিংবা পরীক্ষার খাতা কাটার লাল-নীল পেনসিল দিয়ে ইংরেজি বইয়ের ছবিগুলো রং করতাম। ক্লাসে ড্রইং ছিল, আমি তাতে শূন্যই পেতাম। তবে রং লাগাতে আমার খুব ভালো লাগত।

নাইনে পড়ার সময় আমি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। পার্টি অফিসের জন্য লেনিন, মার্কস ও স্ট্যালিনের ছবি আঁকার ইচ্ছা হত। কী করে আঁকব জানতাম না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতাম সাইনবোর্ড পেইন্টাররা কী করে ছোট ছবি বড় করে আঁকেন। আমি তাঁদের মতো করেই গ্রাফ করে ৩০ বাই ২২ সাইজের কাগজে লেনিন, মার্কসের প্রতিকৃতি আঁকতাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বগুড়া থেকে ঢাকায় এলাম। রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার জন্য আর্ট স্কুলে ঢুকে পড়ার নির্দেশ এল। বাবু আমাকে হাফেজ করতে চেয়েছিলেন। মাওলানা এসে আমাকে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করাতেন। প্রায় দুই সেপারা আমি কণ্ঠস্থ করেছিলাম। ফলে আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনা তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। আমি হাফেজ হতে চাই না দেখে আমাকে তিনি আলিগড়ে ভর্তি হতে বললেন। তখন মুসলিম

আভিজাত্য ছিল আলিগড়ে পড়াশোনা করা। বাবা যখন দেখলেন আমি আর্ট স্কুলেই পড়ব, বললেন, 'তাহলে তুমি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যাও।' বাবা রবীন্দ্রপ্রেমিক ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি প্যারিসে পড়তে যান, সঙ্গে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথের কিছু বই।

আমার উদ্দেশ্য তো আর্টিস্ট হওয়া নয়, পার্টির সংগঠন গড়ে তোলা। প্রথমে তিনি খুব বিরোধিতা করলেন, রাগারাগি করলেন রীতিমতো। একদিন ডাকলেন, 'তাহলে কী ঠিক করলে?' আমার ইচ্ছা পুনরায় তাঁকে জানালাম। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি প্যারিসে ছিলাম, দেখেছি আর্টিস্টদের জীবন বড় কষ্টের। তারা না খেয়ে মরে। তুমি আমার সন্তান, আমি চাই না তুমি জীবনে কষ্ট পাও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'শখের জন্য শিখবে, বেশ ভালো। এমএ পাশ করে না হয় পড়।' আমার জবাব, শখে তো আমি শিখছি না। তিনি ভর্তি হওয়ার জন্য আমার হাতে টাকা তুলে দিলেন।

এরপর বাবা যেটা করলেন তা অদ্ভুত। তিনি আমাকে তাঁর লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। আলমারিতে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে চামড়ায় বাঁধানো দুটি মোটা বই ছিল। বই দুটি তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এতদিন আমার কাছে ছিল, এখন থেকে তোমার।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিশ্চয়ই শিল্পপ্রেমিক ছিলেন, তা না হলে কেন তাঁকে আর্টের বই দেওয়া হবে? মেহগনি কাঠের সেই ছোট্ট আলমারিটি আমার খুব পরিচিত। সবসময় তালা দেওয়া থাকত। তিনি বই দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, আমার বিদায় উপলক্ষে ১৯২৮ সালে প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রদের অ্যাসোসিয়েশন আমাকে উপহার দিয়েছিল।

বই দুটিতে ল্যুভর চিত্রশালার অমূল্য ছবির রঙিন কিছু নিদর্শন ছিল; ফলে আমার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। বইয়ের নারীর উন্মুক্ত ছবির প্রতি কৈশোরের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল ছিল। বই দুটি তিনি অন্য ছেলেদের দিলেন না, দিলেন তাকে, যে সবে ১৬ থেকে ১৭-তে পা দিয়েছে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই ছবিগুলো অন্যদের কাছে হবে ন্যাকেড, আমার কাছে ন্যুড।

১৯৫৪ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থেকে পাশ করে কলকাতায় গেলাম আশুতোষ মিউজিয়ামে আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করতে। বাবাই পড়ার খরচ বহন করলেন। ঢাকায় এ ধরনের কোনো ক্লাস হয়নি। এখানে যা কিছু শিখেছি, শিল্পী আমিনুলের [আমিনুল ইসলাম] বাড়িতে বইপত্র দেখে। ওরিয়েন্টাল ও ইউরোপীয় আর্টের ওপর প্রথম শিক্ষা পেলাম আশুতোষ মিউজিয়ামে। এ কোর্সের জন্য আবেদন করেছে ১০০ জন, নেওয়া হবে ১০ জন। অধ্যাপক কল্যাণ গাঙ্গুলী, পরবর্তীকালে বাগেশ্বরী অধ্যাপক, আমাকে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা কোনো ছাত্র নেব না। ইউনিভার্সিটি মাইগ্রেশন ইত্যাদিতে অনেক অনেক ঝামেলা। আমার বাবা দুটি চিঠি দিলেন, একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে; অন্যটি মিউজিয়ামের কিউরেটর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে। অধ্যাপক দেবপ্রসাদকে চিঠি দিলাম। শহীদুল্লাহ্‌র ছেলে জেনে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার অসুবিধা হবে না, ভর্তি হতে পারবে।' এখানে প্র্যাকটিক্যাল হিসেবে আমার জন্য দুটি বিষয় ছিল—লিনোকাট ও অন্যটি ভাস্কর্য। প্রদোষ দাশগুপ্ত ভাস্কর্যের ক্লাস নিতেন। আমার কাজ দেখে তিনি বললেন, 'তুমি ভাস্কর্য করো না কেন?'

চিত্রকলা সম্পর্কে ইতালিতে পড়ব ঠিক করে প্রথমে মাকে জানাই। মা বাবুকে বললেন। তিনি ডাকলেন আমাকে। বাবা চেয়েছিলেন আমি প্যারিসে পড়তে যাই। কিন্তু ইতালির ফ্লোরেন্স থেকে আমিনুল ইসলাম চিঠি লিখে জানাল যে ওখানে সে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। আমিও আমিনুলের কাছে যাওয়াই পছন্দ করলাম। বাবা আর দ্বিমত করলেন না। তিনি মাসে ২৫ পাউন্ড

করে পাঠাতেন। দুই বছর। ইতালি থেকে ফিরে এসে ১৯৫৯ সালের মে মাসে করাচিতে জীবনের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হল আমার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। 'আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব দ্য মিডলইস্ট' আয়োজিত সে অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়েছিল ককটেল। তিনি সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।

শেষ পর্যন্ত সব ছবিই তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন; সন্ধ্যায় প্রদর্শনী হলের এক কোণে মাগরিবের নামাজ পড়েছেন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন সে সময়ের শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাকে বাবু তাঁর ব্যক্তিগত ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিলেন। সেখানে ওপরের দিকে লেখা ছিল– টু মি. হাবিবুর রহমান, এডুকেশন মিনিস্টার এবং নিচের দিকে– টু ইন্ট্রোডিউস হিস সান মুর্তজা বশীর, আর্টিস্ট।

বাবা খবরের কাগজে চিত্র প্রদর্শনীর খবর পড়তেন, আমাকে সে খবর লিখে জানাতেন। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে থাকার জন্য আমি ইতালি থেকে লন্ডনে চলে আসি; নভেম্বরে লন্ডনে বসবাসকারী সফিউদ্দীন আহমেদ, আলী ইমাম, আহমেদ পারভেজ, সেমজাসহ যৌথ প্রদর্শনী করি। বাবা তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। তিনি পত্রিকায় প্রদর্শনীর খবর পড়ে ১৫ ডিসেম্বর এক চিঠিতে লেখেন, 'তোমার লন্ডনের Art Exhibition-এর বিষয় *Pakistan Observer*-এ প্রকাশিত হয়েছে।' পত্রিকায় আমার ওপর কোনো লেখা বেরোলে মনোযোগ দিয়ে পড়তেন; ক্লিপিংও রাখতেন সযত্নে। ১৯৫৭ সালের ২৬ মে *পাকিস্তান অবজারভারে* ওয়াশিংটন ডিসিতে পাকিস্তানের নয় শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনীর খবর বেরিয়েছিল। সেই আলোচনায় আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে দেখে আমার নামের সংশোধনী দিয়ে তিনি পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি দেন। 'স্যার, আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত রিতা খানের 'পাকিস্তানি পেইন্টিংস এক্সিবিটেড ইন ওয়াশিংটন' নিবন্ধটি পাঠ করলাম। একটি মুদ্রণজনিত ত্রুটির (অথবা লেখিকার একটি ভুল) প্রতি আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেসব শিল্পীর চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ফ্লোরেন্সপ্রবাসী মুর্তজা রশীদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইনি আসলে আমার পুত্র মুর্তজা বশীর। তাঁর পুরো নাম আবুল খায়র মুর্তজা বশীরুল্লাহ। তাঁর কাজটি প্রশংসা পেয়েছে জেনে আমি আনন্দিত– আপনারই অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।' (চিঠিটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ছেলে মুর্তজা বশীর, এই পরিচয় আমার কাম্য ছিল না। আমি বরং চাইতাম লোকে বলুক মুর্তজা বশীরের বাবা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাই নামের শেষ থেকে 'উল্লাহ' মুছে দিয়ে আমি মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছি। এই পারিবারিক চিহ্নটি মুছে ফেলার ব্যাপারটি আমার বাবা-মা কেউ সহজভাবে নিতে পারেননি।

বাবু একদিন তাঁর লাইব্রেরিতে পড়ছেন। ডাকপিয়ন আমার একটা চিঠি দিল। চিঠিটি বাবুর সামনে রাখতেই তিনি চোখ বুলিয়ে ফেরত দিলেন। ঘটনাচক্রে তখন আমি সেখানে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে দেখলাম আমার চিঠি। তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি অকম্পিত গলায় বললাম, 'উল্লাহ্' কেটে দিয়েছি। নিজের পরিচয়ে দাঁড়াতে চাই। তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে নাম পড়লেন; বললেন, 'তোমার মুর্তজা নামের বানানে 'ম'-এর নিচে দীর্ঘ-উকার দাও কেন? মূর্খের বানানে 'ম'-র নিচে দীর্ঘ-উকার হয়। তুমি তো মূর্খ নও, তাই তুমি 'ম'-তে লিখবে হ্রস্ব-উকার।' প্রথম প্রথম আমাকে লেখা চিঠিতে পুরো নাম লিখতেন। পরে alias দিয়ে মুর্তজা বশীর এবং মাঝেমধ্যে শুধু মুর্তজা বশীর আর্টিস্ট লিখতেন।

১৯৬৮ সলে সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে বাবা যখন হাসপাতালে, তখন বারবার জানতে চাইতেন, ছবি আঁকা কেমন হচ্ছে। সে সময় আমি স্টেট ব্যাংক (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক) ম্যুরাল করছিলাম। মা মারা যাওয়ায় কাজে বিঘ্ন ঘটেছিল, কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। বাবু বললেন, 'দেখো, কাজ করে যেতে হবে। মা মারা গেছেন তাতে কী? তুমি তোমার কাজ করে যাও।' আমার চোখে পানি এসে জড়ো হয়েছিল। বলেছিলাম, দোয়া করবেন। তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগ্ণ হাত কষ্ট করে উঁচু করলেন, দোয়া করলেন। এ কাজে কত পয়সা পাব শুনে পিঠে মৃদু চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'নাউ ইউ আর এ রিচ ম্যান।'

তিনি ছিলেন ৯ নম্বর কেবিনে। একদিন তাঁকে দেখতে এলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাকে। সবশেষে বললেন, 'আর্টিস্ট।' ড. এনামুল হকের সঙ্গে এর আগে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ নাম করেছে।' শুনে বাবু হাসলেন, মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে গেল তার রেশ। পরিতৃপ্তির সঙ্গে ক্লান্ত চোখজোড়া বুজলেন।

১৯৫৯ সালের শেষের দিকে উর্দু ভাষার বিশিষ্ট কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ চিত্র প্রদর্শনী করার জন্য আমাকে লাহোরে নিয়ে যান। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ফয়েজ ভাইয়ের অনুরোধে লাহোরে থেকে যাই। বাবু দুঃখ পেয়ে করাচি থেকে ১৯৬০ সালের ৮ মার্চ চিঠি লেখেন, 'বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে তুমি লাহোরে গিয়া অবধি আমাকে কোনো পত্র লিখ নাই! আমি গত জানুয়ারি মাসে ঢাকায় গিয়াছিলাম। মি. বাটলবির নিকট তোমার canvas দিয়াছিলাম। বোধ হয় তুমি তাহা পাইয়াছ।' বাটলবি ছিলেন লাহোরের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী। উর্দু সাহিত্যিক সাদাত হাসান মান্টোর ব্যক্তিগত বন্ধু। আমি বাবার এ চিঠির উত্তর ১১ মার্চ দিই: মি. এজাজ বাটলবির হাতে পাঠানো ক্যানভাসগুলো আমি যথাসময়ে পেয়েছি। আমার প্রদর্শনী এখানকার শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। কাগজে ভালো রিভিউ পেয়েছি। আগামী জুনে Muree-তে প্রদর্শনী করার ইচ্ছে। খুব কাজ করছি। তাছাড়া Rawalpindi-তে মে'র প্রথমদিকে প্রদর্শনী করার আমন্ত্রণ পেয়েছি। কাজের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। 'আমার চিঠি পাওয়ার কয়েক মাস পর তিনি ৪ মে এক চিঠিতে লেখেন, 'তোমার পয়সা-কড়ির অভাব হইলে বিনা সংকোচে আমাকে জানাইবে। কিন্তু স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে।'

মানুষ অনন্য। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, প্রেম বারবার এসেছে আমার ক্যানভাসে। আর এসেছে হতাশা কিংবা রূপকের ভেতর দিয়ে আত্মার আর্তি। ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমিতে 'সমকালীন চিত্রকলা' শীর্ষক এক প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে আমার এ ধরনের একটি ছবি ছিল। নাম 'ডেড লিজার্ড'। বাবা ছবিটি দেখেছিলেন প্রদর্শনীতে। বাসায় এসে সোজা আমার ঘরে ঢোকা দিলেন। দরজায় শব্দ না করে ঘরে ঢুকতেন না তিনি। বললেন, 'জানো, তোমার ছবিটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমার ভেতরটা কেমন নড়ে ওঠে।' মনে হল এর চেয়ে বড় সম্মান আর হয় না। এ সম্মান অতুলনীয়। আমি তাঁকে গভীরভাবে দেখলাম, বললাম, সেই মৃত টিকটিকিটি হচ্ছে এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে মানুষের প্রতীক; আমরা যেখানে জীবন্মৃত। আমরা প্রেতাত্মা, অশরীরী। আমি, আপনি সবাই। চলছি, নড়ছি, তবু আমাদের মধ্যে প্রাণ নেই।

বোধ করি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর সেই উজ্জ্বল চোখজোড়া দিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিলেন। তারপর মৃদু গলায়, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে এমন স্বরে বললেন, 'তা হয়তো হবে।' কয়েকদিন পর বাংলা একাডেমিতে 'আধুনিক চিত্র ও আধুনিক শিল্পী' শিরোনামে এক ঘরোয়া আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে প্রখ্যাত আইনজীবী এ কে ব্রোহী বাবুকে

প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপিন বলুন ডক্টর সাহেব, আপনার ছেলে তো একজন আধুনিক শিল্পী।' জবাবে বাবু হেসেছিলেন, 'আধুনিক চিত্রের মতোই আমার ছেলে দুর্বোধ্য।'

কালেভদ্রে আমার ঘরে আসতেন তিনি। একদিন আমার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আমার এক ছবি দেখে বললেন, 'এসব ভূত কেন আঁক? আর্টিস্ট তুমি, সুন্দর জিনিস আঁকবে।' তাঁর অযাচিত উপদেশে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিয়েছিলাম, সুন্দরই যে আঁকতে হবে তার কোনো মানে নেই। এক ফোঁটাও বিব্রত হননি তিনি। বলেছিলেন, 'প্যারিসে ল্যুভে আমি দেখেছি কত চমৎকার সুন্দর শিল্পকলা সেগুলো।'

কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন করলে বা ছবি আঁকার জন্য রঙের প্রয়োজন হলে তাঁকে আমি লিখতাম। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের এক মিটিং উপলক্ষে তাঁর লাহোরে আসার কথা জেনেছিলাম। তাই করাচি থেকে রং আনতে বলেছিলাম। এভাবে তাঁকে রং আনতে আগেও একবার বলেছি। ১৯৫৪ সালে, তিনি তখন দেশের বাড়ি চব্বিশ পরগনার পেয়ারাতে। ১৯৫৪ সালে ৮ অক্টোবর ঢাকা থেকে তাঁকে লিখেছিলাম, 'আসার সময় আমার জন্য যদি পারেন নিচে লেখা রংগুলো আনবেন।....' ১৯৬০ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি করাচি থেকে আমাকে জানান, 'লাহোর হইয়া ৬ মাসের ছুটিতে ঢাকায় যাইব। সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র থাকিবে। সুতরাং রং লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। তুমি উহা লাহোরে কিনিবে।' কিংবা প্রদর্শনীর খবর তাঁকে জানানোর পর তিনি ঢাকা থেকে ১৯৬১ সালের ৮ জুলাই এক চিঠিতে বলেন, 'তোমার পূর্বের পত্র হইতে জানিলাম তুমি একটি Art exhibition করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কোথায়? যখন বিদেশে থাকিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেছ না, তখন ঢাকায় আসিয়া কোনও চাকরির সন্ধান করা ভালো। চাকরি না হইলেও তুমি বসিয়া কাজ করিতে পারিবে।' তিনি ঢাকার শিল্পীদের প্রদর্শনীর খবরাদি রাখতেন; সে সংবাদ জানিয়ে আমাকেও ঢাকায় প্রদর্শনী করতে বলতেন।

১৯৬১ সালের ২১ মার্চ এক চিঠিতে লিখলেন, 'ঢাকায় কিছুদিন পূর্বে আমিনুল ইসলাম ছবি প্রদর্শনী করিয়া ১৫০০ টাকা পাইয়াছে। তুমিও এখানে আসিয়া প্রদর্শনী কর।' শুধু তা-ই নয়, সে বছরের ১৬ মার্চের পত্রে যেখানে আমিনুল ইসলামের প্রদর্শনীর খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'লাহোরে যখন যত্র আয় তত্র ব্যয়, তখন ঢাকায় আসাই উচিত।' তখনো আমি লাহোরে। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিটিংয়ের জন্য লাহোরে আসেন। ওঠেন হোটেলে। সেদিনই আমাকে চিঠি লেখেন। আমি হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। তিনি কাজ শেষ হওয়ার পর বললেন, 'চলো, তোমার ওখানে যাই।'

আমার ঘরে তাঁকে নিয়ে যেতে ইতস্তত করছিলাম। থাকি শহরতলী সামনাবাদে। ঘর বলতে খুপরি, দেয়ালে চুন নেই, কোনো আসবাবপত্র নেই। জানালার পাটে সার্সি নেই। গরমে আসে আগুনের হলকা, শীতজুড়ে বরফের চাবুক। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ক্যানভাসের কোণে ঝুলে থাকে প্যান্ট-শার্ট। মেঝের মাঝে আটটি ইট জড়ো করা, তার ওপর কর্ডের প্যান্ট ভাঁজ করে রাখা; সেখানে বসি। টাঙ্গায় তাঁর পাশে বসে ঘরের এই দৃশ্যের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারধারে ভালো করে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি একসেন্ট্রিক।'

আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম, তাঁকে কোথায় বসাব ।! ভারী মানুষ, ইটের ওপর বসালে একদিকে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে । শোয়ার চারপেয়েটার অবস্থাও নাজুক । বসলে ভেঙে যেতে পারে । একটা শতরঞ্জির ওপর শুতাম । পায়ের কাছে গোটানো চাদর, রাতে গায়ে দিতাম, দিনে বেডকভার বানাতাম । বিছানায় সেটা তাড়াতাড়ি মেলে দিয়ে সেখানে তাঁকে বসতে বললাম । তিনি সেখানে বসলেন না, ইটের স্তূপের ওপর বসলেন । কোমরে তিনি চিটাগংয়ের চওড়া বেল্ট বাঁধতেন । তার ভেতর থেকে একটা ১০০ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন । মনে হচ্ছিল এটা অনুকম্পা; হাত বাড়িয়ে এই দান নিতে মন সায় দিচ্ছিল না । তিনি উঠে দাঁড়ালেন । আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আফটার অল আওয়ার রিলেশন ইজ দ্যাট অব ফাদার অ্যান্ড সান ।'

আমার শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ, মৃত্যুর কিছুদিন আগে কালি-কলমে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকা । তিনি নিজেই আমাকে তাঁর ছবি আঁকার জন্য বলেছিলেন । তিনি আচকান পরলেন, তাঁর বহুল পরিচিত কালো টুপি মাথায় দিয়ে আমার সামনে চেয়ারে বসলেন । মনে পড়ল, ১৯৬০ সালে যখন তিনি করাচিতে উর্দু ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত, সে সময় আমি লাহোর থেকে করাচিতে এসেছিলাম । কথা প্রসঙ্গে ইসলামে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধের কথা শোনা যায় সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে আঁকতে পার, এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই । তবে তোমার যদি সেই প্রতিকৃতি দেখে হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয়, যদি তাতে ফুলের মালা পরাও, তবে তা শেরক্ হয়ে যাবে ।' ইতিপূর্বে আমি তাঁর চারটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলাম । প্রথমে ১৯৫৩ সালে । সবই আমি আঁকতাম দূর থেকে । এই প্রথম তাঁকে মডেল করলাম ।

যেভাবে যেদিকে যেমনভাবে তাঁকে তাকাতে বলেছি, তিনি একজন পেশাদার মডেলের মতো সেভাবেই বসেছেন ।

অসুস্থ তিনি, তাই তাড়াতাড়ি আঁকছিলাম । আগের মতো সেই বুক পর্যন্ত শুভ্র দাড়ি নেই; খেতে কষ্ট হত বলে একটু গোল করে ছোট করা । গোঁফ ছাঁটা । তখনো কি জানতাম, এই আমার শেষ আঁকা, তাঁকে গভীরভাবে দেখা? মন ভরে, সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রাণ ভরে দেখা ।

আর এখানেই আমার দুঃখ ।

[১০ জুলাই ২০০৮ ছিল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জন্মদিন । এ উপলক্ষে শিল্পী মুর্তজা বশীর এ প্রবন্ধটি লেখেন ।]

দুই.

বাংলাদেশে শিল্পকলার চর্চা

বাংলাদেশের সৃজনী ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের যে বিকাশ ঘটেছে, তা অকল্পনীয় । ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরে এদেশের শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্য বলতে যা তাঁরা জানতেন, সরকারি চাপে পড়ে সেটা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হয়েছিল । এ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সামাজিক অনুশাসন, রঙের আখড়া, তার ভেতর দিয়ে এদেশের শিল্পীরা যেভাবে চিত্র সৃষ্টি করেছেন তা একটা অদম্য বাসনার ফল এবং এই যে আভা সেটা স্বাধীনতা-উত্তর আরো ফুলে-ফলে ছেয়ে গেছে । তবে কোনো দেশের শিল্পীই সত্যিকার অর্থে মহৎ হতে পারেন না যতক্ষণ না তিনি সমাজসচেতন হন । শিল্পীর দায়িত্ব একটি–তাঁর পারিপার্শ্বিকতার জগৎ সত্যতার সঙ্গে তুলে ধরা, শিল্প যাতে মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তবানের আনন্দের খোরাক না হয়ে জনসাধারণের হয়, সেজন্য সেটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব । নতুবা সমাজ থেকে

সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে একজন ইনডিভিজ্যুয়ালরূপে পরগাছা হবেন। আজকের যে শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে তা অনেকটা রেনেসাঁ যুগের শিল্পীদের কাজের মতো। সে যুগে শিল্পীরা ছিলেন শ্রমশিল্পী বা কারিগর। ভাস্কর বা স্থপতিরা ছিলেন পাথরকাটা মিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রি এবং চিত্রশিল্পীরা ছিলেন চিকিৎসক ও ওষুধবিক্রেতার সমন্বয়ে গঠিত গিল্ডের সদস্য। বস্তুত এইসব শিল্পী, দার্শনিক বা চিকিৎসক ছিলেন সমাজের উচ্চমার্গের বিলাসী একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী। শিল্পীরা যেহেতু চার্চের আদেশে বা শাসকগোষ্ঠী কিংবা পৃষ্ঠপোষকদের নির্দেশে অথবা মনোরঞ্জনার্থে শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তাই সামাজিক স্তরবিন্যাসে তাঁদের স্থান, ছিল সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণির দলেই। ফলে রেনেসাঁসের স্বর্ণযুগেও সাধারণ গণজীবন কখনো শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এমনকি রেনেসাঁসের মানবতাবাদী শিল্পদর্শনের আলো সাধারণ মানুষকে কখনো স্পর্শ করেনি। অনেকটা আমাদের দেশের চিত্রকলার মতোই।

আমাদের দেশে বেশিরভাগ শিল্পকর্মের পেছনে কলাকৈবল্যবাদী চেতনা কাজ করছে। ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য কিংবা সৌন্দর্যসৃষ্টি মূল লক্ষ্য হয়েছে। বার্নার্ড শ'র ভাষায় 'Arts for arts sake means merely success for money's sake.' এছাড়া শিল্প-সাহিত্যে আমরা যারা গণামানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটনকে বড় করে দেখিয়েছি কিন্তু এরপরও যে আগামীতে একটি সম্ভাবনাময় পৃথিবী রয়েছে তা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। সত্যিকার অর্থে সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজম বলতে যা বোঝায় তা না চিত্রে না সাহিত্যে ফুটে উঠেছে।

একটা জিনিস ভাবতেই অবাক লাগে যে, আমাদের সবাই শিল্পীরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন, দেখেছেন দৈন্য আর টানাপড়েন কিন্তু যেভাবে সাধারণ মানুষের কথা ছবিতে আসার কথা ছিল সেভাবে আসেনি। তাই দেখি '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বা '৭১-এ স্বাধীনতা কিংবা '৫২-এ ভাষা আন্দোলনই বলি না কেন তেমন ব্যাপকভাবে শিল্পীদের সৃষ্টিতে ধরা পড়েনি যেমন সংগীত, কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নাটক ও চলচ্চিত্র চিত্রিত হয়েছে। এর কারণ কী? আমার মনে হয় আমরা যারা ছবি আঁকি তারা বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে নিজেদের আত্মাভিমানকে বিক্রি করে দিয়েছি। এই যে সমাজের প্রতি বিমুখতা এবং জীবনবোধ থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখার প্রবৃত্তি তার কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একজন শিল্পী পণ্য হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকে এই আত্মবিস্মৃত শিল্পীর অহঙ্কার বুর্জোয়া শ্রেণির খামখেয়ালির কাছে পদদলিত।

অনেকে বিমূর্ত ছবির ওপর বিক্ষুব্ধ। এই বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে না বোঝার লজ্জা ও গ্লানি। চিত্রকলা দেখবার সময় দর্শকদের দেবশিশুর হৃদয় নিয়ে আসতে হবে। প্রথমেই যদি এই ধারণা নিয়ে আসা হয়, আধুনিক চিত্রকলা মানে রাবিশ তবে চিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র ঘটবে না। ফলে রস থেকে বঞ্চিত হবেন। চিত্র বোঝার চেষ্টা করতে হবে আন্তরিকতার সঙ্গে, উন্নাসিকতার সঙ্গে নয়। সংবেদন হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হবে চিত্রকে। যে-কোনো সৎ চিত্র দর্শককে আকর্ষণ করে, এটা আমার বিশ্বাস। শিল্পীর দায়িত্ব একটিই, যা ধ্রুব সত্য হিসেবে তিনি বিশ্বাস করেন তা সততার সঙ্গে তুলে ধরা। শিল্প যেন মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তবানের আনন্দের খোরাক না হয়ে জনসাধারণের হয় তার জন্য অসংখ্য সেমিনারের আয়োজন করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝে শিল্পকলাকে পরিচিত করানো, এটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। আর্ট কালেক্টর বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই রকম আর্ট কালেক্টর দু-একজন ছাড়া আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। আর্ট যতক্ষণ না ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে রূপ নেবে ততক্ষণ কিন্তু এখানে আর্ট কালেকশন হবে না। ধরে নিতে হবে এখানে আর্ট কালেক্টর লগ্নি করছে টাকা এবং রিটার্নও আসবে। তাহলেই ছবির দাম বাড়বে এবং ছবির দাম

বাড়লে শিল্পীরা তাতে লাভবান হবেন। আরেকটি দিক আছে, যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্ভব। শিল্পকলার বিকাশের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপক প্রয়োজন। কখনো গির্জা, কখনো মন্দির, কখনো রাজা-বাদশাহরা করেছে। বাংলাদেশে যেখানে বিনোদনের অভাব সেখানে যদি সব জেলা শহরে না হলেও বিভাগীয় শহরগুলোতে চিত্রশালা স্থাপিত করা যায়, তবে এদেশের মানুষের শিল্পরুচি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে।

এখানে সরকারের আর্থিক ইনভলভমেন্ট তেমন নেই বললেই চলে। এদেশে সরকারের আওতাধীন বহু পরিত্যক্ত ভবন রয়েছে, সেখানে কিংবা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে পারে।

ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে এভাবে– সরকার যদি ঘোষণা দেন যে, কোনো বিত্তবান যদি শিল্পকর্ম এই চিত্রশালায় দান করেন তবে যে অর্থে তিনি এই শিল্পকর্মগুলো ক্রয় করেছেন তা হবে আয়করমুক্ত। যেমন আমরা দেখি প্রাইজবন্ড বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত বিভিন্ন সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে। ফলে ছবির দাম বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পীরাও লাভবান হবে।

এই ব্যবস্থার দুটি দিক রয়েছে। একটি হল আয়কর থেকে রেয়াত পাওয়ার জন্য একদিকে যেমন ছবি বিক্রি হবে, তেমনি অন্যদিকে শিল্পীরা পরিপূর্ণভাবে শিল্পচর্চায় মগ্ন হতে পারবেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন। অন্নচিন্তার জন্য তাঁকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে না।

[লেখক: কবি; গদ্যশিল্পী ও চিত্রশিল্পী। অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।]

আমাদের নিসর্গ চিত্রকলা

জা হি দ মু স্তা ফা

সেই কোনকালে শুনেছিলাম আমার দেশের এক প্রচলিত রূপবর্ণনা– সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ। এই দেশের জলকাদায় ধুলায় মাটিতে আমাদের বেড়ে ওঠা। শৈশবের নতুন উজ্জ্বল চোখে দেখা বাংলার নিসর্গ এখনো মনে লেগে আছে। চোখের দেখা যদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, সেই দেখার গভীরতা সমুদ্রের মতো। হৃদিঅনুভূতিময় এই দেখা হয় কবির নতুবা চিত্রকরের। তিনি ছবি আঁকেন বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার রঙ চাপিয়ে।

দুনিয়াজুড়ে শিল্পীদের চিত্রপটে সবচে' বেশি চর্চিত বিষয় হচ্ছে– প্রথমত নিসর্গ অতঃপর মানুষ। মানুষের সঙ্গে নিসর্গ মিলেমিশে বিশ্বাসযোগ্য একটা চিত্র দাঁড়ায় বটে, আবার এই দুইয়ে মিলে ফ্যান্টাসিও হয়। শিল্পের পথ বড় বিচিত্র, তার গতিবিধি বহুদূর, বহুস্তরে তার বিচরণ।

মানুষ বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গে হেসে খেলে মিলেমিশে। এক অর্থে মানুষ তাই প্রকৃতির সন্তান। একই সঙ্গে প্রকৃতি মানুষের শিক্ষকও বটে। আদ্যিকালে মানুষ যখন জাদুবিশ্বাস নিয়ে ছবি এঁকেছে গুহাগাত্রে– সেই আঁকায় ছিল মানুষের অস্তিত্বরক্ষার আকুতি। শিকারি মানুষ চেয়েছিল তারা যেন নির্বিঘ্নে শিকার করতে পারে, এই বিশ্বাস নিয়ে তাদের বাইসনের ছবি আঁকা। নিসর্গপাঠের মুগ্ধতা তখন তাদের ছিল না। বেঁচে থাকার প্রয়াসটাই ছিল মুখ্য। মানুষ আরো সভ্যভব্য হবার পর, তার ক্ষুণ্নিবৃত্তি মিটে গেলে– যখন সে নিজের অস্তিত্ব ও উৎসকে খুঁজতে চেয়েছে, তখন চিরচেনা নিসর্গ তার চোখে ধরা পড়েছে নতুন ভাবে, নতুন করে।

অর্গল প্রথম খুলেছে রেনেসাঁ। মানুষ– মানুষ হল এইবেলা, সে পেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। যে শিল্পীরা দলবদ্ধভাবে ছবি আঁকত– তারা পেল নিজস্ব চিত্রপট। মানুষ নিজেকে উদ্ধার করে ফিরে তাকাল নিসর্গে। শিল্পীর চিত্রপটে উঠে এল প্রকৃতির অমিত সৌন্দর্য। রোমের রেনেসাঁয় ব্যক্তির দাপট, অভিজাত মানব-অবয়বের তুমুল বন্দনা। নিসর্গ নিছক যেন প্রেক্ষাপট, আবহ সদৃশ। ভেনিস রেনেসাঁয় নিসর্গ সাবলীল, মানুষ ও নিসর্গ যেন একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বান্ধব। একে অন্যের পরিপূরক। বত্তিচেল্লির ভেনাসের জন্মের কথাই ধরা যাক, নিসর্গ এখানে মুখ্য না হয়েও তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজমান। এই পথ ধরেই নিসর্গরূপের মাধুরী ছড়ায় সপ্তদশ দশকের ডাচ চিত্রকলায়। লুইস ডায়েল এ রীতির সেরা নিসর্গ-আঁকিয়ে।

নিসর্গ দারুণ মনোহর, বৈভবে নন্দিত হয়ে ওঠে রোমান্টিক যুগের দুই ব্রিটিশশিল্পী টার্নার আর জন কনস্টেবলের চিত্রপটে। প্রকৃতির প্রকৃত রূপের পসরা যেন শিল্পীর গভীর মমতামাখা রঙতুলিতে আরো নন্দিত হয়ে ওঠে একে একে। পাথুরে নুড়ির উপর বহমান স্বচ্ছ জলধারাময়

নদীপথ পার হতে গাড়ি টেনে চলা ঘোড়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টার সঙ্গে পাহাড়ি নিসর্গের মৌন সৌন্দর্যের দ্বন্দ্ব– দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী জন কনস্টেবল। নিসর্গচিত্রের পাশ্চাত্য ঘরানার আদর্শ রূপ আজো অবলোকন করছে দর্শক-শিল্পবোদ্ধারা।

শুরুতেই বলেছিলাম আমাদের রূপের মাধুরী নিয়ে জনশ্লোক। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উপর ভর করে ভারতশিল্পে ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব জায়গা করে নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে নিসর্গকেন্দ্রিক শিল্প অভিযাত্রার সফল সূত্রপাত। তবে এরও বহু আগে মুঘল চিত্রকলায় আমরা অবলোকন করেছি শাহি অবয়বের পশ্চাতে রাজকীয় বাগান নিয়ে চিত্রকর্মের গঠন। চিত্রপটের ভেতরবাড়িতে সে কেবল পরিবেশের নিয়ামক হয়ে এসেছে। ভারতে ভূদৃশ্য বিপুল বৈভবে প্রথম এসেছে আমাদের এ অঞ্চলে ঊনবিংশ শতকে।

সে কালের ঢাকার নৈসর্গিক নানা রূপ আমরা অবলোকন করি ঢাকায় বসবাসকারী ব্রিটিশ চিত্রকর চার্লস ড'য়লির নানা চিত্রকর্মে। লালবাগ কেল্লার সৌন্দর্য, সুত্রাপুরের কাঠের পুল এলাকা, বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী নিসর্গ ও জনজীবনের দৃশ্য বাস্তবানুগভাবে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। সেকালের ঢাকার এত বিশ্বস্ত রূপায়ণ আমরা আর কোনো চিত্রকর্মে পাইনি। সে হিসেবে চার্লসের এ কাজগুলোর মূল্য ঐতিহাসিক।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শাহজাদপুর ও শিলাইদহে এসে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নদী-জল-নিসর্গের মায়াবীরূপের পটভূমিকায় এঁকেছেন 'পদ্মাবোট'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিসর্গের রহস্যময়তার ছবি এঁকেছেন। তাঁর কালের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখের চিত্রকর্মে নিসর্গ এসেছে ঘুরেফিরে।

কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থী শিল্পীদের হাতে নিসর্গ চিত্রচর্চা, গঙ্গার ধারে বসে-দাঁড়িয়ে তো কম হয়নি ঊনবিংশ-বিংশ শতকে! পাশ্চাত্য ঘরানার শিল্পশিক্ষার কলাকৌশল রপ্ত করে শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েছেন সারা ভারতে। নিসর্গচিত্রে তারই প্রভাব। কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে (১৮৯৫-১৯৯১), যিনি আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিক্ষক– তাঁর আঁকা এক স্কেচে দেখেছি গঙ্গার বুকে নৌকা ভিড়ে আছে– দূরে কতগুলো পালতোলা নৌকার হাতছানি। বিংশশতকের দুই দশকের কাজ। গঙ্গা তখন ভরা যৌবনে, মহানগর কলকাতার গ্রাস তখনো তাকে জাপটে ধরেনি। সে সময়ের বেশিরভাগ শিল্পীরা ছবি আঁকতে পাশ্চাত্যকেতায় বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে। নিসর্গের উদার প্রান্তরের কাছে দায়বদ্ধতা তাঁদের অনেকের।

ব্রিটিশ শাসনামলে এই বাংলার ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের শিল্পী খুলনার শশীভূষণ পালের আঁকা নিসর্গচিত্রে আমরা দেখতে পাই নৌকায় নদী পারাপারে ব্যস্ত মানুষ আর ওপারের বৃক্ষরাজিতে বাতাসের দোলাচল। যেন শিল্পীমনের আবেগের সঙ্গে বাতাসের বেগ এখানে সমন্বিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে কলকাতা আর্ট স্কুলে পাঠকালীন আমাদের বাংলাদেশের জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) অসংখ্য নিসর্গচিত্র এঁকেছেন। ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ সন্নিহিত অঞ্চলের নিসর্গদৃশ্য অনুশীলন করতে করতে হয়ে উঠেছেন শক্তিমান শিল্পী। ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ চিত্রমালার জন্য তিনি গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ষাটের দশকে তাঁর ছাত্র– আজকের বরেণ্যশিল্পী মনিরুল ইসলামের সঙ্গে চাঁদপুরে মেঘনা অববাহিকায় জলরঙে নিসর্গ এঁকেছেন জয়নুল।

ছবি আঁকা শুরু করার আগে শিল্পাচার্য খানিকক্ষণ নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গী শিক্ষার্থী মনিরকে বলতেন– 'নদী আর নৌকার ছবি আঁকবা, আর নদীতে নৌকায় করে ঘুরে বেড়াবে না– তা হয় না। নদীতে নৌকায় বসে নৌকার দুলুনি টের না পেলে, তোমার ছবিতে সেই দোলা আসবে না।' কী অসাধারণ পর্যবেক্ষণ! প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর এমনই টান, তিনি এমনও বলেছেন– 'যদি কেউ নিশিরাতে গামছা পড়ে আমাকে ডাক দেয়, আমি তাঁর হাত ধরে চলে যাব।'

জয়নুলের সমসাময়িক শিল্পী আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীরা নিসর্গ নিয়ে অনেক এঁকেছেন। নদীবক্ষে রঙিন ছাতা মাথায় নৌকাআরোহীদের এই কাজটি আনোয়ারুল হকের ফভবাদী ধারার এক অসাধারণ ও সাবলীল সৃষ্টি। বোর্ডে তেলরঙে শফিকুল আমিনের আঁকা 'ফসল তোলা' সেকালের শিল্পবিচারে ভ্যানগখের পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট রীতির অনুসরণে এক অনবদ্য কাজ।

কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৯) বাংলার মানুষ, নারী ও নিসর্গের অনন্যসাধারণ এক রূপকার। বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প আর পাবলো পিকাসোর আধুনিক অংকনশৈলীর সমন্বয়ে কামরুল বাংলা প্রকৃতি ও প্রকৃতিসন্তানদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে দারুণ দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। আমাদের নিসর্গআবহে বাঙালি ললনাদের তিনি তুলে ধরেছেন প্রেমমুগ্ধ প্রণয়ীর মতো আবেগ দিয়ে। *তিনকন্যা, নাইয়র* এসব চিত্রকর্ম এমনই অসাধারণ কাজ। তাঁর ছবিতে নিসর্গ এসেছে বারেবারে, ঘুরেফিরে। বাংলার ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পেয়ে যাই তাঁর অনেক চিত্রকর্মে। আমরা লক্ষ করলে দেখব– বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কামরুলের কাজে নিসর্গ এসেছে তাঁর আঁকা মানুষ ও অন্যান্য কিছুর পরিবেশ সৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসেবে। সে সত্ত্বেও তাঁর নিসর্গ সহজ সৌন্দর্য-চেতনা নিয়ে অসামান্য সৃজন। ঘোমটা দেয়া ললনার পেছনে কলাগাছের সরল উপস্থিতি যে নন্দিত সৌন্দর্যের অবতারণা করে তাঁর চিত্রকর্মে তার মূল্য কম নয়।

সফিউদ্দিন আহমেদের উড এনগ্রেভিং মাধ্যমের ছবি *বনের পথে* আলোছায়াময় নিসর্গরূপের দুর্দান্ত এক রূপায়ণ। তাঁর আঁকা *দুমকির পথে* সহ আরো কিছু এনগ্রেভিং কিংবা কাঠখোদাই চিত্রে ওই বাংলার নিসর্গ রূপ ফুটে ওঠেছে। জ্যামিতিক ফর্মকে আধুনিক রূপায়ণে পরিবর্তিত করে নীলাভ সবুজ রঙের নন্দিত প্রয়োগে অসামান্য দক্ষতায় তেলরঙে এই বাংলার নিসর্গকে তুলে ধরেছেন শিল্পী। প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য তিনি তুলে ধরেছেন নিয়ন্ত্রিত আবেগ দিয়ে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ, তাদের বসতি-বৃক্ষ এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেও তিনি এঁকেছেন। *বন্যা* তাঁর এমনই এক সৃষ্টি।

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, রশীদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), আবদুর রাজ্জাক, দেবদাস চক্রবর্তী, কাজী আবদুল বাসেত প্রমুখ প্রচুর এঁকেছেন নিজেদের দেখা নিসর্গ– নিজের মতো করে।

কিবরিয়াকে বলা হয় এদেশে প্রকাশবাদী বিমূর্তশিল্পের প্রধান উদগাতা। তাঁর চিত্রকর্মের বর্ণলেপনে আমরা পেয়ে যাই বাংলা নিসর্গরূপের নানাবর্ণের নানা মাত্রা, জলজ শ্যাওলার রূপ কিংবা আকাশের বুকে মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি। শিল্পী দারুণ দক্ষতায় তাঁর চারপাশের প্রকৃতি থেকে রঙ, রেখা ও রূপ-রস নিয়ে তাঁর চিত্রপটকে মোহনীয় করে তুলেছেন।

আমিনুলের আঁকায় ও তাঁর নকশাকৃত ফ্রেস্কোয় নিসর্গ ও এর আবহ দেখা যায়। নব্বই দশকে তাঁর করা তেলচিত্রে বহুবর্ণের মিলেমিশে যাওয়া প্রবাহ যেন আমাদের প্রকৃতির বসন্তবর্ণময় সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয়।

ধানক্ষেতের পাশেই শাখানদীতে নৌকার এক নিবিড় ছবি এঁকেছিলেন রশীদ চৌধুরী বোধকরি পঞ্চাশের দশকে। বাংলার প্রকৃতি আর বাংলার হাজার বছরের নানা উপকথা, উপাচার, বারবার উঠে এসেছে তাঁর চিত্রকর্মে অসাধারণ শক্তিমত্তায়।

আবদুর রাজ্জাক অঙ্কনপ্রধান কাজ ও ভাস্কর্যে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিলেও ছাত্রাবস্থায় জলরঙে পঞ্চাশ দশকের ঢাকার নানা এলাকার পরিবেশ ও নিসর্গ নিয়ে যে অনুশীলন করেছেন তার মূল্য ঐতিহাসিক। পরিণত বয়সে তুলির স্ট্রোক দিয়ে বহুবর্ণের খেলায় বাংলার নিসর্গ তুলে ধরেছেন তিনি। মুর্তজা বশীর নিসর্গ এঁকেছেন, তবে তাঁর বিষয়বস্তুর আবহ বা প্রেক্ষিত হিসেবেই এর প্রয়োগ বেশি এসেছে।

কাজী আবদুল বাসেত পঞ্চাশের দশকে তাঁর শিক্ষাজীবন শেষে পেশাদার শিল্পী হিসেবে ইম্প্রেশনিস্ট ধারায় নিসর্গের উজ্জ্বল রূপ এঁকেছেন। মাঝে মজেছিলেন প্রকাশবাদী বিমূর্ততায়, সেখানেও ছিল নিসর্গের রূপের মায়াজাল। তাঁর জীবনের শেষদিকে এসে বাসেতের কাজে দেশীয় অবয়ব ও পরিবেশের দেখা মিলেছে।

ওই প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে বাংলার নিসর্গ নিয়ে তাকে নকশায় বেঁধে সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪)। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে তাঁর শিল্প অভিযাত্রা। তাঁর তখনকার কাজে মানবাকৃতির সঙ্গে পরিবেশ এসেছে গৌণ হয়ে। পরে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাইয়ুমের চিত্রপট হয়ে ওঠেছে নিসর্গ ও নিসর্গসন্তানদের একাকার হয়ে ওঠার অমল কাব্য। বাংলার নিসর্গরূপের সৌকর্যকে লোকশিল্পের নকশায় বেঁধে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এত সার্থকভাবে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। কী নেই তাঁর কাজে, ফুল-পাখি-প্রজাপতি-বেড়াল-নানাবিধ বৃক্ষ এবং সর্বোপরি এই ভুবনের কর্মঠ নারী-পুরুষ-শিশু। সবাই উপস্থিত কাইয়ুমের স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র রূপে। *আমার গ্রাম, জলমগ্ন গ্রাম, কিষাণ-কিষাণী* এসব শিরোনামে আঁকা তাঁর সিরিজ চিত্রকর্ম তাঁর শিল্পভুবনের উজ্জ্বল উদাহরণ।

শিল্পনির্মাণ করছেন আর নিসর্গ নিয়ে ছবি আঁকেননি এমন শিল্পী খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কাইয়ুম চৌধুরী-পরবর্তী খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে নিসর্গ নিয়ে এঁকেছেন কমবেশি সবাই। এই শিল্পীদলে আছেন– সৈয়দ জাহাঙ্গীর (১৯৩৫), সমরজিৎ রায় চৌধুরী (১৯৩৭), হাশেম খান, রফিকুন নবী (১৯৪৩), মনিরুল ইসলাম(১৯৪৪)। কাজের ধরন হয়তো একেকজনের একেক রকম। এঁদের সবাই আঁকেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রকৃতিকে নীল-হলুদ এসব উজ্জ্বল রঙে উপস্থাপন করেন। নদী ও নিসর্গ নিয়ে এঁকেছেন, জেলেদের মাছধরা নিয়েও এঁকেছেন। শুধু সৌন্দর্য সৃজন নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয় নিয়েও চিত্রপটে সরব হয়েছেন শিল্পী। অসংখ্য ইটের ভাটার চিমনি দিয়ে নির্গত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ ও সন্নিহিত পরিবেশ এঁকে শিল্পী বলতে চেয়েছেন– এই অবস্থা কি অনিবার্য!

সমরজিৎ রায় চৌধুরী লোকজ ও জ্যামিতিক নকশায় আমাদের ঐতিহ্য তুলে ধরেন অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। তাঁর উজ্জ্বল ও বর্ণিল চিত্রপট জুড়ে আমরা পেয়ে যাই বাংলার নিসর্গ ও মানুষ। হাশেম খান বাংলার নিসর্গবর্ণকে চিত্রপটে ঢেলে ঢেলে দিয়ে চিত্রপটভূমি নির্মাণ করে সরল

সাবলীলভাবে তুলে ধরেন নিসর্গসন্তানদের। তাঁর আঁকা গ্রামীণ আবহে কলসি কাঁখে বঙ্গললনার রূপ তো আমাদের চোখে এখনো ভেসে ওঠে।

রফিকুন নবীর নিসর্গচিত্রে আমরা পাই রাঢ়বঙ্গের আঁকাবাঁকা পথে চলা মহিষের গাড়ি করে মাঠের ফসল নিয়ে যাওয়ার ভূ-দৃশ্য, উঁচু নদীতীর আর নদীর উপরিস্থলের নৌকা আর তার ভেতরকার মাছের আলোড়ন, নৌকোর মাঝিমাল্লাদের অবসর যাপন এরকম নানা বিষয়বস্তু। গ্রামীণ নিসর্গের বিশাল পটভূমিকার মধ্য দিয়ে ছুটে চলা রেলগাড়ির ছবি এঁকে শিল্পী যেন মনে করিয়ে দিয়েছেন ছুটে চলা জীবনের গতিময়তার সঙ্গে নিসর্গের তুমুল সখ্যতা। গ্রামীণ ও শহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের এক ধরনের স্মৃতিকাতর অনুভূতি আছে রফিকুন নবীর কাজে।

মনিরুল ইসলামের চিত্রকর্মে তাঁর শৈশবে দেখা নদীবক্ষের সৌন্দর্যচেতনাকে খুঁজে পাই বারবার। বৃক্ষ-বন-বনানীর নন্দিত পরিবেশও চলে আসে তাঁর কাজে। দীর্ঘকাল স্পেনপ্রবাসী হয়েও শিল্পী ভুলে যাননি তাঁর শৈশব-যৌবনে দেখা বাংলার নদী ও নিসর্গের ছায়া। স্বদেশকে নিয়ে শিল্পীর সেই অমল অবলোকন আমরা লক্ষ করি তাঁর অসামান্য সব চিত্রকর্মে।

তেরোশ' নদীর এই বাংলাদেশের নদীমাতৃক রূপের নির্যাস যেন আমরা পেয়ে যাই আমাদের চিত্রকরদের কাজে। নিসর্গের রঙ আর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ছবি আঁকেন মাহমুদুল হক, মিজানুর রহীম, হামিদুজ্জামান খান, আবুল বার্‌ক আলভী, শহীদ কবির, মো. গিয়াসউদ্দিন প্রমুখ শিল্পীরা। মাহমুদুল হক নিসর্গের রূপ-রস ছেনে তাঁর চিত্রপট সাজিয়ে তোলেন। হামিদুজ্জামান খান মূলত ভাস্কর, তবে ছবি আঁকা বিশেষ করে নিসর্গ-রূপের নানা অনুবাদ আমরা পেয়ে যাই তাঁর সৃজনে। আবুল বার্‌ক আলভীর চিত্রকর্মে আমরা লক্ষ করি দেশের ভূমি বিভাজনের নানা রূপ। শহীদ কবির তাঁর চিত্রপটে রঙের পিগমেন্টে আমাদের মাটির রূপকে তুলে আনেন এবং এ মাটির মানুষ ও অন্যান্য উপাদানকে চিত্রিত করেন। মো. গিয়াসউদ্দিন দীর্ঘকাল জাপান প্রবাসী থাকলেও বাংলার নদী-কাদা-মাটি-জল-বৃষ্টির ইমেজ নিয়ে দারুণ মনোহর ছবি আঁকেন।

আবদুল মান্নান, রেজাউল করিম, বীরেন সোম, মতলুব আলী, আবদুস সাত্তার, আবদুস শাকুর, চন্দ্রশেখর দে, প্রয়াত হাসি চক্রবর্তী, শাহাবুদ্দিন, মনসুর-উল-করিম, অলকেশ ঘোষ, কে.এম.এ কাইয়ুম, ফরিদা জামান, নাসিম আহমেদ নাদভী, রফিক আহমেদ, রণজিৎ দাস, জামাল আহমেদ, মোহাম্মদ ইউনুস, নাসরিন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, নাঈমা হক, গোলাম ফারুক, আহমেদ সামসুদ্দোহা, রেজাউন নবী, জালালউদ্দিন, মোহাম্মদ নজীব, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, শেখ আফজালের চিত্রপটে আমাদের নিসর্গের নানা রূপের ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে। এঁদের কেউ কেউ আঁকছেন বাস্তবানুগভাবে, ইম্প্রেশনিস্ট রীতিতেও কাজ করে চলেছেন এঁদের অনেকে। আবদুল মান্নান নদীমেখলা বাংলার মনোরম নিসর্গের নিষ্ঠাবান অনুবাদক। রেজাউল করিমের বিমূর্ত চিত্রপটে প্রকৃতির নানা উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়। বীরেন সোম বাংলার প্রকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আঁকেন। বাংলার নারী ও নিসর্গের ছবি আঁকেন আবদুস সাত্তার। শাকুর শাহ্ আমাদের লোককাহিনী ও নিসর্গ নিয়ে ছবি এঁকে দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছেন। চন্দ্রশেখর দে কালি ও কলমে দারুণ দক্ষতায় আলো-আঁধারিতে আমাদের প্রকৃতির রূপ সৃজন করেন। হাসি চক্রবর্তী প্রকৃতির রঙ ও উপাদান নিয়ে এঁকে স্বকীয় একটা মাত্রা তৈরি করতে পেরেছিলেন।

প্যারিসপ্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রধানত বাঙালির অহংকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আঁকলেও তাঁর কতক কাজে দেখেছি– তিনি অসাধারণ দক্ষতায় জল-কাদাময় সবুজ বাংলার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। মনসুর-উল-করিম কৃষিভিত্তিক বাংলার কৃষক ও তাঁদের কর্ষিত জমি নিয়ে

মাঠের গল্প শিরোনামে অনেক এঁকেছেন, দেশে-বিদেশে তার স্বীকৃতিও পেয়েছেন। অলকেশ ঘোষ জলরঙে নদীমাতৃক বাংলার চিত্র রূপায়ণের এক শক্তিমান শিল্পী। কে এম এ কাইয়ুম নিসর্গের অন্তর্গত সৌন্দর্য চিত্রিত করেন। ফরিদা জামান নদীমাতৃক বাংলার জলাশয়, জাল-জেলে, মাছ ও জেলেকন্যার সঙ্গে নিসর্গের নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরেন। প্রকৃতিতে নানা রঙ। তবু নাসিম আহমেদ নাদভী কালচে বর্ণে প্রকৃতির নমিত রূপ চিত্রিত করেন। রণজিৎ দাসের চিত্রপটে মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধন পাই আমরা। জামাল আহমেদের দৃষ্টিনন্দন কাজে নিসর্গের বিশালতা ও বৈভব পাওয়া আমরা। মোহাম্মদ ইউনুস নিসর্গের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন নিজের চিত্রপটে। নাসরীন বেগম প্রাচ্যকলার উঁচুমানের শিল্পী। প্রকৃতির রূপ-রস নিয়ে দৃষ্টিনন্দন তাঁর সৃজন। রোকেয়া সুলতানা নিসর্গের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেন কখনো বিমূর্ততায় কখনো প্রতীক প্রয়োগে। গোলাম ফারুক প্রকৃতিকে ভেঙে-চুরে নিংড়ে তুলে ধরেন চিত্রপটে। আহমেদ সামসুদ্দোহা প্রকৃতির রূপকে বাড়িয়ে আরো সুন্দর করে প্রকাশ করেন। সৈয়দ হাসান মাহমুদ গাছপালার উলম্ব বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেন চিত্রপটে বর্ণ প্রক্ষেপণে। শেখ আফজাল গ্রামীণ নিসর্গে পারিবারিক পরিবেশ তুলে ধরেন।

নাজলি লায়লা মনসুর, ঢালী আল মামুন, নিসার হোসেন, শিশির ভট্টাচার্য, ওয়াকিলুর রহমান, দিলারা বেগম জলির চিত্রকর্মে সমাজের নানা অসঙ্গতি ফুটে ওঠে। তাঁদের কাজেও নিসর্গ আসে, তবে তা ঘটনাক্রমে– প্রসঙ্গের অবতারণায়। কনকচাঁপা চাকমা আমাদের পাহাড়ি প্রকৃতি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির রূপকার। মনিরুজ্জামান, খালিদ মাহমুদ মিঠু, নিলোফার চামান, ইফতেখারউদ্দিন আহমেদ, মোখলেসুর রহমান, নাসিমা খানম কুইনি, অশোক কর্মকার, হিরন্ময় চন্দ, আহমেদ নাজির, সমীরণ চৌধুরী, ফকরুল আলম, শামছুল আলম আজাদের চিত্রকর্মে আমরা নিসর্গের সরাসরি উপস্থাপন কিংবা তার প্রতীকী রূপ অবলোকন করি।

জাহেদ আলী চৌধুরী, তাসাদ্দুক হোসেন দুলু, জসিমউদ্দিন, মোহাম্মদ ইকবাল, রফি হক, সুমনা হক, রশীদ আমিন, সামছুল আলম আজাদ, গৌতম চক্রবর্তী, বিপুল শাহ্, আলপ্তগীন তুষার, মাকসুদা ইকবাল নীপা, আনিসুজ্জামান, আবদুস সোবাহান হীরা, দুলাল গাইন, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, অনুকূল চন্দ্র মজুমদার, মলয় বালা, রাশেদুল হাসান, মুস্তফা আকবর জামিল শামিম, সোহেল প্রাণন, জাহিদ, ফারজানা ঊর্মি, আবদুস সাত্তার তৌফিক, শহীদ কাজী, বিশ্বজিৎ গোস্বামী, কামালউদ্দিন, সুমন ওয়াহিদ, শাহনূর মামুনসহ আজকের নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের অনেকেই নিসগের বর্ণিল আবহে তাঁদের চিত্রপটকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা বিধেয়– আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা স্থাপনা ও ভাস্কর্য করেন, তাঁরাও কিন্তু আমাদের নিসর্গকে সঙ্গে রেখেই নিজেদের কাজটি করেন। এঁদের মধ্যে আছেন– আইভি জামান, তৌফিকুর

রহমান, মাহবুব জামাল শামিম, অশোক কর্মকার, লালা রুখ সেলিম, নাসিমা হক মিতু, মাহবুবুর রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি, ইমরান হোসেন পিপলু প্রমুখ।

এই দেখার আনন্দ অন্যরকম– চার দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে নিসর্গের বিশালতাকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস। চিত্রপটের এই নিসর্গের সঙ্গে বাস্তব নিসর্গ দেখে আমাদের উপলব্ধিতে নিসর্গ আরো সতেজ আরো বর্ণিল হয়ে ওঠে। নগরের সংকীর্ণ ঝুলবারান্দা থেকে দেখা নিসর্গ নয়– আমাদের অতীতের বিশাল ক্যানভাসের মনকাড়া নিসর্গে আমরা যেন আবারো সমর্পিত হই নতুন করে, নতুন ভাবে, নতুন চৈতন্যে।

[লেখক: চিত্রশিল্পী সমালোচক। চীফ ডিজাইনার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

আ ব্দু স সা ত্তা র

একুশে ফেব্রুয়ারি এবং শিল্পীর ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশ যারা শাসন করেছে, তাদের সবাই বহিরাগত। আর্য, তুর্কি, পাঠান, মুঘল, ব্রিটিশ সবাই আমাদের এ অঞ্চলে এসে রাজত্ব করেছে। শুধু তাই নয় আমাদের অমূল্য সম্পদ লণ্ঠন করেছে তারা। ব্যবসার নামে এসে ধূর্ত ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল করে দীর্ঘ সময় আমাদের ওপর দুঃশাসন চালিয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষ ইংরেজের আধিপত্য এবং চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করলেও সকল শ্রেণির মানুষ তা করেননি। তারা ইংরেজদের সম্পর্কে হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করেন এবং একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশরা যখন ভারত শাসন করে তখন ভারতের লোকসংখ্যা ২৭,১৫,২৬,৯৩৮। এসময় শাসক ব্রিটিশদের সংখ্যা মাত্র ২,০০,০০০ কিংবা তারও কম। তৎকালে ব্রিটিশ ভারতের আত্মমর্যাদাহীন লোভী মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সিংহভাগ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের পদলেহন নীতির কারণেই এই নগণ্যসংখ্যক ব্রিটিশদের পক্ষে বিশাল ভারতকে শাসন ও শোষণ করা সম্ভব

হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দালাল লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাহায্য-সহযোগিতা সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক মানুষের ব্যাপক বিদ্রোহের কারণে ব্রিটিশদের পালাতে হয়েছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সমগ্র ভারতে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বাংলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৯৩১ হতে ১৯৩৪ এই সময়সীমায় ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড বাংলায় যেখানে ঘটেছে ২১০টি, সেখানে মাদ্রাজে ৬, বোম্বাইয়ে ১৭, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৪, আসামে ১৩, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশে ৬, মধ্য প্রদেশে ৬, ব্রহ্মে ০ এবং দিল্লিতে ৪।[১] উল্লেখ্য, এর সবটাই ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড নয়। এর মধ্যে নিছক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও রয়েছে। তবে, বাংলার ক্ষেত্রে সিংহভাগই ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের আওতায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গুলি চালনাও ছিল অন্যতম। যেমন বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর স্যার জন এন্ডার্সনের ওপর দার্জিলিং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুলিবর্ষিত হয়েছিল এবং এই গুলি চালনার অপরাধে কয়েকজন বালক এবং যুবককে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এই সংগ্রামী চেতনা, এই সংগ্রামী কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা এল ঠিকই, কিন্তু খণ্ড-বিখণ্ড হল ভারত। বাঙালির সাধের বাংলা হল দ্বিখণ্ডিত। এর এক খণ্ড রইল ভারতের সঙ্গে আর এক খণ্ডকে (বর্তমান বাংলাদেশ) জুড়ে দেয়া হল পাকিস্তানের সঙ্গে। এই অযৌক্তিক বিভাজন ছিল ধূর্ত ব্রিটিশদেরই আরেক ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র হিন্দু-মুসলমান এবং মুসলমান-মুসলমানে সংঘর্ষ অব্যাহতভাবে লাগিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র। ফলে অনিবার্য কারণে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করলেও উর্দুভাষী পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই। মাথামোটা পাকিস্তানি শাসকরা তাদের ভাষা উর্দুকে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিতে চাইল; কিন্তু বাঙালি জাতি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল। বাঙালির এ সংগ্রামী চেতনা ধার করা নয়। এ চেতনা পরম্পরাগত। বারবার, বহুবার অন্যের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়ার কারণেই বাঙালি এই ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু সবার মধ্যে এ ক্ষমতা কাজ করেনি। ক্ষমতালোভী, সুবিধাভোগী, মাথা বিকানো একশ্রেণির শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক মানুষ নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে, 'যারা প্রকৃত অর্থে ধূর্ত, কপট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, চালবাজ, সুবিধাবাদী, মোনাফেক এবং মক্কর'।[২] আর এজন্যই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে পাক সরকার কর্তৃক জারি করা একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করবার বিরোধিতা করেছিল একশ্রেণির মানুষ। ক্ষমতালোভী, সুবিধাবাদীরা না করলেও একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত ছাত্র, যুবক, তরুণেরা। এ সংগ্রামে শরিক ছিলেন রঙ-তুলি কারিগর, অর্থাৎ চিত্রশিল্পীরাও। কিন্তু সবাই ছিলেন না। এখনও কোনো একশ্রেণির শিল্পী ভিক্ষাপাত্র হাতে ক্ষমতাসীনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আখের গোছাতে ব্যস্ত। তখনও তেমনি ছিল। একশ্রেণির শিল্পী পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন ওপর মহলের প্রভুদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখের গোছাবার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তারা পাকিস্তানি প্রভুদের পক্ষে কাজ করে দু'হাতে অর্থ উপার্জন করেছেন। তবে এদের সংখ্যা হাতেগোনা এবং এদেরকে সবাই-চেনেন। যে দল ক্ষমতায় যায় তারা সেই দলের পক্ষেই কাজ করেন। সব দলেরই প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত হন তারা। মেরুদ-হীনরা কখনোই যোদ্ধা হতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে যোদ্ধার অভাব হয়নি কখনোই। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবার ক্ষেত্রেও হয়নি। ছোটখাটো চেহারার উষ্ণ টগবগে রক্তের অধিকারী তরুণ শিল্পী মুর্তজা বশীর সে

সময় সরাসরি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষার যুদ্ধে ১৯৫২-র শহীদ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিকের সহযোদ্ধা ছিলেন তিনি। এর পরের ইতিহাস ভিন্ন।

বরকত, সালাম, জব্বার এবং রফিকের রক্তে রঞ্জিত একুশ যেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিতে পরিণত হল সেদিন থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হল। বাংলা মায়ের স্নেহধন্য বাঙালি সন্তানেরা মায়ের ভাষা 'বাংলা'কে রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে পালিত হতে থাকল। বিষাদময় কালো দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের সকল পর্বে চারুকলার শিক্ষক এবং ছাত্রদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পরিকল্পনা এবং নকশাও করেছেন শিল্পীরাই। এক্ষেত্রে ভাস্কর নভেরা আহমেদ এবং শিল্পী হামিদুর রাহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একুশের প্রাক্কালে এই শহীদ মিনারকে নবরূপে রঞ্জিত করা হয়ে থাকে। শিল্পীরা দিনরাত খেটে শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে দেয়াল লিখন, আলপনা এবং শহীদ মিনারের পিছনে বিশালাকৃতির রক্তিম সূর্যের সাহায্যে ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকেন। অদ্যাবধি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

১৯৫৩-র একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি একুশে শহীদ মিনার সজ্জিতকরণ ছাড়াও শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট বিশেষ করে শাহবাগ থেকে শহীদ মিনার, আজিমপুর গোরস্তান সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিশালাকৃতির ব্যানার, চিত্র, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সজ্জিত করা হত। এ সকল কর্মকাণ্ডে শিল্পী রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, ইমদাদ হোসেন, বিজন চৌধুরী, মুস্তফা মনোয়ার, রফিকুন নবী, হাশেম খান, আনোয়ার হোসেন, বিজয় সেন, কেরামত মওলা, নাসির বিশ্বাস, রেজাউল করিম, বীরেন সোমসহ অগণিত শিল্পী যুক্ত থেকেছেন। কার্জন হল, চারুকলা ইনস্টিটিউট, শহীদ শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাস ছিল এসকল কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান কেন্দ্র। দূর-দূরান্ত থেকে শিল্পীরা নিউ মার্কেট পোস্টঅফিসের পাশে অবস্থিত শহীদ শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাসে এসে রাতের পর রাত জেগে বিশাল বিশাল ব্যানারচিত্র এঁকেছেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর বাঙালির চিরআকাঙ্ক্ষিত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পাক হানাদার বাহিনীসহ পাকিস্তানিরা বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সংগঠন যে সকল পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, অ্যালবাম প্রকাশ করে থাকে তাতে এখনও পাকিস্তানিদের অন্যায় কার্যক্রম ও আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। এ সমস্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সবসময়ই চারুশিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। শুধু অগ্রণী ভূমিকা নয় বিপ্লবী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এই শিল্পীরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে অনেক সময় শিল্পীদের স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো কোনো সরকারের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। কারণ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে, বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ, দমন এবং নির্যাতনের যেসকল চিত্র শিল্পীরা আঁকতেন এবং প্রদর্শন করতেন তা আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীকেও বিচলিত করত। কেরামত মওলা, মহিউদ্দিন ফারুক, আনোয়ার হোসেন, এ.কে.এম. মাহতা, রেজাউল করিম, হোসেন জামাল, আবদুল মান্নান, জি.এম.এ. রাজ্জাক, জি.এম. খলিলুর রহমান, শিরীন মহল বন্দনা, এম.এ. খালেক, মোহাম্মদ ইউনুস, জাকিয়া বেগম, হারুন আল রশিদ, মোহাম্মদ আলমগীর, সৈয়দ সালাউদ্দিন চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পী একুশ উপলক্ষে চিত্রকলার একটি অ্যালবাম প্রকাশ করে স্বৈরাচার সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন। কারণ এসকল অ্যালবামে শুধু চিত্র ছিল না, ছিল দেশের

শীর্ষস্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের কবিতারও সমন্বয়। এ সকল কবিতার কোনো কোনোটি সরাসরি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে লেখা।

একুশকে স্মরণ করে কিংবা বলা যায় একুশকে অবলম্বন করে শিল্পীদের রঙ-তুলির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা কিংবা আঁকা চিত্রকর্মের বিষয়গুলোর মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুটের নিচে পিষ্ট বাংলা বর্ণমালা, মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংস্কৃতিকর্মীর মুখ কিংবা দেহ, পোস্টারসহ গুলিবিদ্ধ লাশ, পেট্রোডলারের দেশ ঈগলরূপী আমেরিকা (তৎকালীন পাকিস্তানের মিত্রশক্তি) কর্তৃক বাংলার সংস্কৃতির ওপর ছোবল, বাংলা বর্ণের বইপত্র ইঁদুর কর্তৃক কেটে বিনষ্ট করা, মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে শপথ গ্রহণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী অঙ্কিত এ সকল চিত্র বাংলাপ্রেমী সকল মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে অধিক মাত্রায় বেগবান করেছে। যখন কোনো মানুষ শিল্পীর অঙ্কিত মাতৃভাষার জন্য, মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে বীরদর্পে অগ্রসরমান নরনারীর মিছিলের সম্মুখীন হয়েছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই লিখিত ব্যানার সহ রাজপথে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা লাশের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা আমেরিকার প্রতীক ঈগল কর্তৃক বাঙালি সংস্কৃতি আক্রান্ত হওয়ার মতো চিত্রের সামনে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের সুপ্ত কিংবা শান্ত হৃদয়কে উত্তাল, অশান্ত সাগরের ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করেছে। অস্থির করেছে। ফলে এই সকল অশান্ত এবং অস্থিরচিত্ত মানুষেরা ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’ শ্লোগান দিতে দিতে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে গিয়েছে। সেখান থেকে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার বজ্রশপথ নিয়ে ফিরেছে সবাই। আজও পালিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি, কিন্তু একুশের সকল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলা যায় না। আর সেজন্যই ২০০১ সালে একুশে স্মরণে শিল্পী কামরুল হাসানের ভাষায় বলতে হয়:

“ ’৫২ থেকে ২০০১ যদিও ঊনপঞ্চাশ। তবুও একুশকেই স্মরণ করছি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। ২০০১ সালেও একুশই আসবে। সেদিন যারা একুশে পালন করবে, তারা যেন ১৯৫২-র একুশের শহীদদের রক্তমাখা বিপ্লবী পথ ধরে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, যা আমরা পারছি না। ২০০১ সালের এই একুশ যেন আমাদের হৃদয়ে সেই উষ্ণতা নিয়ে আসছে।”

তথ্যসূত্র

১. *প্রবাসী*, ১ম খণ্ড, ৩৪শ ভাগ, ১৩৪১, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২৯২, ২৯৩।

২. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *কেউ থাকে যুদ্ধে কেউ চলে ভিক্ষায়* পৃ. ১৬।

মুক্তিযুদ্ধ বন্দুক-বুলেটে, মুক্তিযুদ্ধ রঙ ও তুলিতে

সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, কঠিন শৈলভূমি এবং বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদীর পলিপ্লাবিত উর্বর মাটির বুকে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ ও ফলবৃক্ষ শোভিত; দোয়েল, কোয়েল, ডাহুকের মতো অগণিত পাখির কলকাকলিতে মুখরিত; শাপলা-শালুক, পদ্মপুষ্পে পূর্ণ বিল-ঝিল, দিঘি-নালা; জারি, সারি ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার সুমধুর সুরধ্বনিতে পূর্ণ হৃদয়দোলানো সবুজ প্রান্তরের বহু বর্ণিল চিত্রসম সুন্দর যে সোনার বাংলা, সেই বাংলার বহু বিচিত্র বর্ণের বহু ধর্মের সংস্কৃতিসেবী শান্তিকামী মানুষ শান্তি পায়নি কখনো। কারণ সুশীতল ছায়াঘেরা মায়াময় এ দেশে আর্য, তুর্কি, পাঠান, মুঘল, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিরা শাসন-শোষণের মাধ্যমে জনমানুষের সুন্দর জীবনকে বিষময় করে রেখেছিল। সুচতুর ধূর্ত ব্রিটিশরা বাঙালি বহুবর্ণের চিত্রসম সোনার বাংলাকে করেছে দ্বিখণ্ডিত।

বাংলা বিভাগের দায় বাহ্যিকভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের ওপর চাপাবার প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও এ প্রবণতা যথার্থ নয়। কারণ ধূর্ত ইংরেজ যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দাবি উত্থাপন করতে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে উস্কানি দিয়েছিল এবং কংগ্রেসকে তা সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার প্রমাণের অভাব নেই। লর্ড মিন্টোর আমলেই যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয় ইতিহাসে সে কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'ঐ বড়লাটের কাছে আগা খাঁ প্রমুখ মুসলমানরা স্বতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধা দাবি করতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু গিয়েছিলেন সরকারি হুকুমে বা ইঙ্গিতে।' কংগ্রেসের তৎকালের সভাপতি মৌলানা মোহাম্মদ আলীও তাঁর বক্তৃতার এক স্থানে বলেছেন যে, 'আগা খাঁ এই যে দরবার করেছিলেন তা কমান্ড পার্ফরমেন্স অর্থাৎ উহা উপরওয়ালাদের হুকুমে করা হয়েছিল।' মৌলানা মোহাম্মদ আলীর এই বক্তব্যের সমর্থন ভারতের সচিব লর্ড মর্লির জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় ভল্যুমের ৩২৫ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটির রিপোর্টের ১১৩ পৃষ্ঠাতেও এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "It was at the time of the Morley Minto Reforms that the claim for communal electorates was adviced by the Mohammadans, inspired by certain officials.।"[১] বাংলা তথা বাঙালির হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করবার ক্ষেত্রে এবং হিন্দু-মুসলমান সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে ইংরেজ বেনিয়ারাই দায়ী সে বিষয়ে আরও অনেক তথ্য রয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রে তার উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ বিষয়গুলো কমবেশি সকলের জানা।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটাবার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা আরও অনেক কৌশল অবলম্বন করেছে এবং এই কৌশলের দ্বারা যে হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলিমবিরোধী করা হয়েছে তারও প্রমাণ *প্রবাসী* পত্রিকায় পাওয়া যায়। ৬৯৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'ইংরেজ ইতিহাস শিখাইয়াছে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অসম্ভব।' ৬৯৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে– 'বহু শতাব্দী একত্র বাসের ফলে হিন্দু-মুসলমানের আদিবিরোধ ক্রমে মিলনেচ্ছায় রূপান্তরিত হইল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, ইংরেজের আগমনের সাথে সাথে কালের এই জয়যাত্রার পথে আর এক নতুন বাধার সৃষ্টি হইল।' এছাড়া লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে, হিন্দুদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দুর্বল করতে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, অযোগ্য, দুর্বল এবং সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা মুসলমানদেরকে অধিক সুযোগ-সুবিধাদানের মাধ্যমেও হিন্দুদেরকে মুসলিমবিরোধী করে তুলেছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে বাংলা দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে পড়েছে তাদের মধ্যে ১৯২১-২২ সালে শতকরা ১২.৮ জন ছিল মুসলমান। ১৯২৬-২৭ সালে ছিল শতকরা ১৪.২ জন মুসলমান এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছিল শতকরা ১৩.৩ জন মুসলমান।[২] এই যখন মুসলমানদের শিক্ষার হারের অবস্থা তখন ভারতের এক পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গের শতকরা ৪৬.৮ জন মুসলমান শিক্ষক এবং ৫৪.২ জন মুসলমান পরিদর্শক কাজ করেছেন। সুতরাং এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ইংরেজরা অযৌক্তিক নিয়োগবিধির প্রচলন করেছিল। অথচ এক সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলেমিশেই যে কাজ করতেন তার প্রমাণ সে সময়কার পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আজ থেকে ৯০ বছর পূর্বে মালদহ জেলায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল সেই সমাবেশে রংপুরের মৌলবী সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, মৌলবী হেমায়েত উদ্দীন আহমেদ এবং মালদহ জেলার মৌলবী কাদের বক্স, আবদুল আজিজ খাঁ, মৌলবী

আবদুল গনি এবং মুন্সী আবেদ আলী খাঁ প্রমূখ মুসলমান পণ্ডিতরাও উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনে হিন্দু পণ্ডিতদের তুলনায় অতি নগণ্যসংখ্যক মুসলিম পণ্ডিতের উপস্থিতি থাকলেও সম্মেলনে স্বাগত কবিতা পাঠ করানো হয় হিন্দু এবং মুসলমান দুই বালিকাকে দিয়ে। সম্মেলনের অভিভাষণ কিংবা গৃহীত প্রস্তাবের কোথাও মুসলিমবিরোধী কোনো মনোভাব প্রকাশ পায়নি। বরং শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়কে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এখন যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে পড়ানো হচ্ছে এবং তাতে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ এবং পবিত্র কোরআনের বক্তব্যগুলো সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছেন তাও ঐ সম্মেলনেরই ফল। কারণ ঐ সময় সভাপতি পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁর অভিভাষণে স্পষ্ট করেই এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর যে কোরআন সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন তা-ও তাঁর অভিভাষণে স্পষ্ট। 'কোনো কোনো মসজিদ নির্মাণে মন্দির ভেঙে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে বলে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন।' কিন্তু ঐ সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে যে, 'প্রস্তরগুলির ওপর দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে দেখে কেউ কেউ মনে করেন, সেকেন্দার শাহ হিন্দুদিগের মন্দির ভগ্ন করে মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি দ্বারাই আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছেন।' এ সকল অভিমত যাঁরা ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপ্যাধায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ প্রভৃতি পণ্ডিতের নাম উলেখযোগ্য। এতদসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অবশ্যই দ্বন্দ্ব ছিল। কারণ একত্রে বসবাস করলে দ্বন্দ্ব-সমস্যা থাকতে বাধ্য। যে সকল দেশে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করে সে সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব যেমন আছে অসদ্ভাবও তেমনি আছে। একে গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রদায়গত বিভাজন মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এমন সদ্ভাব এবং অসদ্ভাব যে-কোনো একক গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে। এমনকি পরিবারের মধ্যেও আছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, বৈষম্য ছিল তা ধর্ম কিংবা সংস্কৃতিগত ছিল না। ছিল কুসংস্কারগত। যা এখনও হিন্দু-হিন্দুতে কিংবা মুসলমান-মুসলমানের মধ্যেও রয়েছে, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের দুর্ভাগ্য তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ঠিকই কিন্তু ইংরেজের দুরভিসন্ধিমূলক বাংলা বিভাগকে রোধ করতে পারেনি। এখানেই ইংরেজের বিজয় সূচিত হয়েছে এবং পরাজয় হয়েছে বাঙালির। এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে কিছুটা হলেও বাঙালি মুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করবার মধ্য দিয়ে। এ বিজয় পূর্ণ বিজয় নয়, আংশিক বিজয়। এ বিজয়ে শামিল ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালিরা। এই স্বাধীনতা এই বিজয়ের শুভ সূচনা হয়েছিল '৭১-এর মার্চ মাসে। আর এ কারণেই মার্চ মাসকে বলা হয় স্বাধীনতার মাস। তাছাড়া এ মাসেই বাঙালি জাতি মাতৃভূমিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে সার্বিক যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙালি জাতির ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এ মাসেই। যুদ্ধবাজ লে. জেনারেল টিক্কা খানকে এ মাসেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করবার সকল আয়োজন সম্পন্ন হয় এবং তাকে নিযুক্ত করবার সংবাদ প্রচার করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুদ্ধাস্ত্র এনে ঢাকার পাক জোয়ানদের শক্তি বৃদ্ধির সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয় এ মাসেই। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এভাবে যত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে বাঙালির আন্দোলনও ততই কঠোরতর হতে থাকে। এবং নয় মাসেই পাক সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মাতৃভাষার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রূপ

নেয় স্বাধীনতার আন্দোলনে। ফলে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ প্রকৃত অর্থে সমগ্র বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত করে তোলে। যে কারণে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার ঘুমন্ত মানুষদের ওপর মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল সেই যুদ্ধ, সেই আক্রমণ প্রতিহত করবার তাৎক্ষণিক কোনো নির্দেশ কারও পক্ষ থেকে পাওয়া না গেলেও সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর পরের ইতিহাস ভিন্ন এবং বিতর্কিত। দেশের মানুষ কার নির্দেশে যুদ্ধ করেছিল এ বিষয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। এ বিতর্কে শামিল হয়েছেন রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীরা। শামিল হয়েছেন আরও অনেকে। কিন্তু এ বিতর্কের ধারেকাছে না গিয়েও বলা যায় যে, হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ২৫ মার্চ রাত থেকেই যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, পাকিস্তানি শাসকদের আচার-আচরণ এবং গৃহীত ব্যবস্থার কারণে দেশে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তাতে জনগণের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আর এ কারণেই বহু পূর্ব হতে দেশের প্রতিটি ঘরেই মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কিছু পাকিস্তানপ্রেমী মানুষ ছাড়া সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল। সুতরাং বিপথগামী মুষ্টিমেয় মানুষকে বাদ দিলে দেশের বাদবাকি মানুষকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েক মাস বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে লক্ষ করেছি, যারা সরাসরি যুদ্ধে যেতে পারেননি তারা কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়াসহ সর্ববিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন। কিভাবে পুত্রস্নেহে সমাদর করেছেন পরিবারের প্রধানগণ। যাদের এ সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না। একটি নাটকে, যাত্রাপালায় কিংবা চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকাই অভিনয় করেন না। অভিনয় আরও অনেকেই করেন। অনেক চরিত্রের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয় নাটক, পালা কিংবা চলচ্চিত্র। আর এ সকল ক্ষেত্রে সকলেই অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিতি পান। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। দেশকে হানাদার বাহিনীমুক্ত করতে, স্বাধীন করতে প্রতিটি মানুষেরই কমবেশি অবদান রয়েছে। আর সেজন্যই দেশের প্রতিটি মানুষই মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

বিভিন্ন কারণে সরাসরি যুদ্ধ করতে অপারগ যে মানুষটি গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষদের যুদ্ধে যেতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে কাজ করেছেন তার অবদান একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। আর এ কারণে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরকে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি, প্রতিটি ঘরের প্রতিটি মানুষকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দিলে যথার্থ কাজটিই করা হয়। জনগণের নিশ্চয়ই স্মরণে থাকবার কথা, ২৫ মার্চের পরের দিনগুলোতে যখন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার দল গঠিত হয়নি তখন গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরের প্রতিটি মানুষ কিভাবে কী অমিত তেজে দলবদ্ধভাবে পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করেছে এবং এ সকল ট্রেনিংহীন নিরস্ত্র মানুষের দলবদ্ধ আক্রমণে আধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত দুর্ধর্ষ পাক জোয়ানরা কিভাবে পরাজয় বরণ করেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকার দলবদ্ধ আক্রমণে পিপীলিকার তুলনায় বহুগুণ বড় কীট-পতঙ্গ যেমন পরাস্ত হয় ঠিক তেমনি পরাস্ত হয়েছে নিরস্ত্র মানুষের তুলনায় হাজারগুণ শক্তিশালী পাকসেনারা সাধারণ মানুষের দলবদ্ধ আক্রমণের কাছে। নাটোরের ওয়ালিয়া নামক স্থানে পাকসেনাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

২৫ মার্চের দিনকয়েক পরের কথা। পাকসেনারা নগরবাড়ি-পাবনা হয়ে রাজশাহী, বগুড়ার উদ্দেশে যাত্রা করবার এক পর্যায়ে কয়েকজন জোয়ান পথ ভুলে ওয়ালিয়ার সন্নিকটে ময়না নামক স্থানে আটকা পড়ে যায়। এ খবর বিদ্যুৎগতিতে সর্বত্র প্রচারিত হয়। খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ মানুষ লাঠিসোঁটা, বর্শা, বন্দুক যে যা পেল হাতে নিয়ে ওয়ালিয়ার দিকে ছুটল। শত্রু নিধনের দৃঢ় শপথ নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েও লাখ লাখ জনতা সেদিন পাকসেনাদের মোকাবিলা করেছে। জনতার দলবদ্ধ আক্রমণে পাকসেনারা পরাজিত এবং নিহত হয়েছে। সেখান থেকে বীর জনতা যখন বিজয়ীর বেশে ফিরেছে তখন কারো কারো হাতে জোয়ানদের মাথার হেলমেট এবং বুটজুতা শোভা পাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং কিংবা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটহীন সেদিনকার সেই লাখ লাখ জনতার ক'জনের তালিকা কার কাছে আছে? সেদিনের সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লাখ লাখ জনতার কাকে রেখে কাকে মুক্তিযোদ্ধার খেতাব দেয়া হবে? কাকে রেখে কাকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় স্থান দেয়া হবে? কিংবা ধরা যাক ফাদার ক্যান্টনের কথা। সে সময় নাটোর জেলার জোনাইল মিশনে ফাদার ক্যান্টন কর্মরত। জোনাইল এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ঘাঁটি। এই ঘাঁটির খবর পেয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জোনাইল আক্রমণের জন্য সেখানে পৌঁছে ফাদার ক্যান্টনের নিকট মুক্তিবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইল। সেখানে কোনো মুক্তিযোদ্ধা কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ঘাঁটি নেই বলে ফাদার জানিয়ে দেন। ফলে পাকবাহিনী সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ফাদার ক্যান্টনের সেদিনকার সেই ভূমিকার কারণে মুক্তিযোদ্ধাসহ সে অঞ্চলের অগণিত নারীপুরুষ রক্ষা পেয়েছিল। এর পরবর্তী সময়েও ফাদার ক্যান্টন নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও প্রকৃত একজন যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। একই জেলার বড়াইগ্রাম থানার মৌখাড়ার এক বৃদ্ধের কথাও স্মরণ করা যায়। তিনি পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের পতাকা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। একথা পাকসেনাদের কানে পৌঁছাতে বিলম্ব হয় না। ফলে পাকসেনাদের দ্বারা তিনি নিগৃহীত হন এবং পরবর্তী সময়ে নিগৃহীত হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। কিংবা স্মরণ করা যাক একজন পাগলের কথা। যাকে সাধারণত সচেতন কিংবা সুস্থ মানুষ হিসেবে কেউ গণ্য করেন না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় এমনই একজন পাগল 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সকল মানুষকে সচেতন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিল। একদিন সেই পাগলকেও পাকবাহিনীর জোয়ানরা পাকড়াও করে এবং বড়াইগ্রাম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেই পাগল 'জয় বাংলা' শ্লোগান উচ্চারণ করেছেন। জোনাইলের ফাদার ক্যান্টন, মৌখাড়ার রহিম বখশের বৃদ্ধ পিতা কিংবা নাম-না-জানা জয়বাংলা শ্লোগানপ্রেমী পাগলের অবদান কিংবা আত্মদানকে কি খাটো করে দেখবার কোনো সুযোগ আছে? তারা কি মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কারণ তাদের বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না। তারা না থাকলে, তারা অবদান না রাখলে, তারা আত্মদান না করলে, তাদের রক্তে বাংলার মাটি রক্তিম না হলে দেশ শত্রুমুক্ত হত না।

মুক্তিযোদ্ধা নন কি তারা যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের আশ্রয় ও সাহস দিয়ে বিপদে-আপদে সঙ্গ দিয়ে রক্ষা করেছেন? প্রয়োজনে সীমান্তপাড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছেন? যারা রাতের পর রাত মা-বোনদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন? কিংবা গল্প, কবিতা, সংগীত, কিংবা পোস্টার, ফেস্টুন, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে অগণিত মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দিতে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা

করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন? রঙ-তুলির কারিগর, শিল্পী কামরুল হাসান কি মুক্তিযোদ্ধা নন? 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' নামক কামরুল হাসান অঙ্কিত বুলেটের চেয়েও শক্তিশালী পোস্টারের কথা কে না জানে। বাংলাদেশের মানুষ তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের মানুষ জানে কামরুল হাসানের এই পোস্টারের কথা। তাঁর এই পোস্টার কি মুক্তিযুদ্ধে বোমা, বন্দুক কিংবা ট্যাংকের চেয়ে অবদান কিছু কম রেখেছে? কামরুলের এই পোস্টারকে রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া এবং তার বাহিনী যতটা ভয় পেয়েছে অন্য কিছুতে ততটা পায়নি। কারণ এই পোস্টারের বাণী যত দ্রুত মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং শত্রু নিধনে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্য কোনোকিছু তা করতে সক্ষম হয়নি। শুধু কামরুল হাসানই নন, অগণিত শিল্পী চিত্র এবং চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে জয়নুলের 'বীর মুক্তিযোদ্ধা', সফিউদ্দিনের 'একাত্তরের স্মৃতি', সুলতানের 'হত্যাযজ্ঞ', আমিনুলের 'গণহত্যা', কিবরিয়ার 'একাত্তরের স্মৃতি', মুর্তজা বশিরের 'শহীদের সমাধিলিপি', কাইয়ুম চৌধুরীর 'জয় বাংলা', রফিকুন নবীর 'স্মৃতি ৭১ বধ্যভূমি', সমরজিতের 'মুক্তিযুদ্ধের শপথ', হাশেম খানের 'রক্তাক্ত একাত্তর', কালিদাসের 'শহিদ', সাত্তারের 'একাত্তর', মনসুর উল করিমের 'একাত্তরে স্মৃতি', শাহাবুদ্দিনের 'মুক্তিযোদ্ধা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জলরঙে আঁকা 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' নামক এই চিত্রে একদল যুবক বন্দুকহাতে শত্রু মোকাবিলায় বীরদর্পে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। ২৫ মার্চের রাতে সেনাদের কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে, সকল বাধা-বিঘ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়কে জয় করতে তারা সঙ্কল্পবদ্ধ। এই প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয়ী মুক্তিযোদ্ধারা, স্বাধীন বাংলাদেশের (সবুজের বুকে লাল টকটকে রক্তিম সূর্য আঁকা) পতাকা নিয়ে সগর্বে সম্মুখে ধাবমান। এরূপ বেশকিছু চিত্রের জন্ম দিয়েছেন শিল্পী সাহাবুদ্দিন। তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন বন্দুক। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার অনেক কিছুই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ক্যানভাসে। বিশাল বিশাল ক্যানভাসের প্রচণ্ড গতি এবং শক্তির প্রতীক মুক্তিযোদ্ধারা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। স্মরণ করিয়ে দেবে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে সে সময় বাংলার দামাল ছেলেরা কিভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে কথাও। যেমন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর 'জয় বাংলা' নামক চিত্রের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একাত্তরে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছিল সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর 'মুক্তিযোদ্ধা রমণী' নামক চিত্রের মাধ্যমে। অকুতোভয় রমণীর এক হাতে খালি কলস, আর এক হাতে বন্দুক। নদী কিংবা খাল-বিলের ধারে যে ঘন জঙ্গল তারই ভেতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে শত্রু নিধনে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে তাকে। শাড়ি পরিহিতা রমণীর কাঁধে ঝুলানো বন্দুকের কিংবা রাইফেলের বুলেটপূর্ণ বেল্ট। নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ দৃশ্য তারই প্রমাণ। এ যুদ্ধ রক্তপাতহীন ছিল না। যুদ্ধে এক সাগর রক্ত দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা। অগণিত নারী হয়েছেন নির্যাতিতা, ধর্ষিতা। নিরপরাধ অনেক মানুষকেও আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। হানাদার বাহিনী তাদেরকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করেছে। শিল্পী কালিদাস কর্মকার 'শহীদ' নামক এচিং চিত্রের মাধ্যমে সে কথা তুলে ধরেছেন। শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর 'বিষের পেয়ালা' নামক লিথো মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে একজন ধর্ষিতা রমণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্জ্বালার কথা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ করেছেন তার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত নিদারুণ অভিব্যক্তি, যা হানাদার বাহিনীর অপকর্মের দলিলরূপে চিহ্নিত।

যুদ্ধকালে পাকবাহিনী তাদের দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের সহায়তায় দেশের অগণিত নরনারী, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে ধরে নিয়ে যে সকল বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল সেই বধ্যভূমিও শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায়নি। লাশভর্তি সেই রক্তাক্ত বধ্যভূমির হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেশবাসীর জন্য চিহ্নিত করেছেন শিল্পী রফিকুন নবী তাঁর 'স্মৃতি ৭১ বধ্যভূমি' নামক জলরঙে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে। খুন, গুম, ধর্ষণ, অগণিত বধ্যভূমি সৃষ্টি এবং দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েও বর্বর পাক হানাদার বাহিনী শেষরক্ষা করতে পারেনি। মুক্তিপাগল দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। তাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে মুক্ত করতে লেগেছে নয় মাসেরও অধিক সময়। আর এরই মধ্য ফুল-বৃক্ষে পূর্ণ হয়েছে অগণিত বধ্যভূমি। শহীদদের অগণিত লাশ শত কোটি শ্বেত-শুভ্র সুবাসিত ফুলে স্বাধীনতার প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর '১৯৭১' নামক লিথো চিত্রের মাধ্যমে এই অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল এখানে স্বাধীনতার প্রতীক। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রিয় ফুলের মতোই প্রিয় স্বাধীনতা।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেলেও শিল্পীরা কিন্তু থেমে থাকেননি। তাঁরা পাকিস্তানি নিষ্ঠুর সমরনায়কদের রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন অন্বেষণ করেছেন। একের পর এক আবিষ্কার করেছেন তাদের সৃষ্ট বধ্যভূমি। আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য মুক্তিপাগল জানা-অজানা বাঙালির লাশ আর কঙ্কালের পাহাড়। বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট, খানা-খন্দক, বিল-ঝিল আর পথে-প্রান্তরে আবিষ্কৃত শহীদদের কঙ্কাল স্তূপাকারে সাজিয়েছেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলামের 'গণহত্যা' নামক চিত্র পাক সমরনায়ক এবং জোয়ানদের সৃষ্ট বর্বরতার মূর্ত প্রতীক। এ সকল হৃদয়বিদারক প্রতীক এবং শহীদদের স্মরণে শিল্পী মুর্তজা বশীর সৃষ্টি করেছেন এক ধরনের বিমূর্ত লিপির বিশেষ প্রকৃতির প্রতীক। যার নাম দিয়েছেন তিনি 'শহীদের সমাধিলিপি'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এসকল চিত্রে শিল্পী কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুতের লগ্ন থেকে যারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত রঙ-তুলির সাহায্যে পোস্টার, ব্যানার, চিত্রাঙ্কন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের সংগ্রামী জনতাকে জাগ্রত করেছেন, বাংলা মায়ের মুক্তির জন্য, বাংলা মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মানুষের সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করেছেন, শত্রুর মোকাবিলা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যামেরা হাতে একাত্তরের রক্তঝরা দিনগুলোতে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ আর ধর্ষণের আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছেন, দেশে-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সেই চিত্র প্রেরণের মাধ্যমে পাকবাহিনীর অসহনীয় অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক বিবরণ প্রচার করেছেন, তাঁরা কি মুক্তিযুদ্ধে অবদান কম রেখেছেন? তাহলে তাঁরাও তো মুক্তিযোদ্ধাই।

তৎকালীন হোটেল ইন্টারকনের সামনে ভুট্টোবিরোধী সমাবেশে 'NO PAKISTAN, WE WANT BANGLADESH' লিখিত পোস্টার হাতে যেসকল অমিত তেজি তরুণ জমায়েত হয়ে অসীম সাহসে প্রতিবাদ করেছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল তাদের নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নিশ্চয়ই নেই। কারণ মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেটহীন এইসকল তরুণদের হিসাব দেয়া কিংবা হিসাব রাখা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতে যারা সে সময় পথে নেমেছিল, শ্লোগান শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত করেছিল, পোস্টার-ব্যানার হাতে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল তারা কেউই নাম লিখিয়ে তা করেনি। কিংবা তাদের নাম কখনো

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লেখা হবে একথা ভেবেও তা করেনি। তারা তা করেছে একান্তই প্রয়োজনের তাগিদে। সেখানে কোনো স্বার্থ কিংবা ব্যবসার মনোভাব কাজ করেনি। সুতরাং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা যতই প্রস্তুত করা হোক না কেন তা ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কারণ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং সার্টিফিকেটধারীরাই মুক্তিযোদ্ধা নন। মুক্তিযোদ্ধা দেশের অগণিত মানুষ। যাদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা আজ আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১. *প্রবাসী*, ১ম খ-, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬০৬, ৬০৭।
২. ঐ, পৃ. ২৯৭।

[লেখক: প্রাবন্ধিক। গবেষক।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে নারীর অবদান

র বি উ ল হু সা ই ন

শিল্পকলা সৃষ্টির ইতিহাস এদেশে ঐতিহাসিক সেই প্রাচীন আমল থেকেই শুরু হয়েছে। বগুড়ায় মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্থাপত্যশৈলী যা সেই আমলের বৌদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে, তা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ ও অহঙ্কার। সেইখানে ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির যে নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তাতে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের শিল্পকলার গৌরবময় অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য। আমরা সেই ঐতিহ্যের অংশীদার এবং এটাকেই বহন করে নিয়ে যাওয়ায় ধারাবাহিকতা ও পরম্পরায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদেশি অনুপ্রবেশকারী রাজনৈতিক ক্ষমতাধরেরা এই দেশকে বিভিন্ন সময়ে শাসন করেছেন বলে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি ঠিকই, তবে সেগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাগুক্ত নিদর্শন সবই আমাদের ঐতিহ্যের গৌরবময় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য,

স্থাপত্য যা-ই হোক না কেন। রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার কারণে এক-এক যুগে এক-এক শাসকের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায় হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, পরে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক কারণে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে শিল্পচর্চার ধারাবহিকতা ব্যাহত হয়– যেহেতু ইসলাম ধর্মে শিল্পচর্চার মধ্যে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ ইত্যাদি অপরাধ ও অধর্মীয় কার্যক্রম বলে বিবেচিত হত। পাকিস্তান সৃষ্টির সময়েও এই আবহাওয়া বিরাজমান ছিল।

এই বৈরী সময়ে সেই ১৯৪৮ সালে সরকারি কলা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছিল দুঃসাহসী এবং একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যার গুরুভার বহন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। কলকাতা আর্ট স্কুলের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও শিল্পী দেশভাগের পর সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে যে অসমসাহসী পদক্ষেপে 'গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অব আর্টস' নামে শিল্পকলা চর্চার বিদ্যালয় পুরনো ঢাকার একটি ভবনের দুই কামরায় স্থাপন করেন যে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরে সেই স্কুল সেগুনবাগিচার মিউজিক কলেজে স্থানান্তরিত হয় ১৯৫১ সালে এবং এখনকার জায়গায় ১৯৫৪ সালে চারুশিল্পের নিজস্ব ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সেটি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। ভবনটির নক্সা করেন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। চারুশিল্পের সার্বিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ বিবেচনায় রেখে স্থপতি একটি অনুপম স্থাপত্যশৈলী উপহার দেন যা আমাদের দেশের আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে প্রথম ভবন বলে বিবেচিত। ঘটনাটি চমকপ্রদ ও একইসঙ্গে কাকতালীয় এই বিবেচনায় যে এদেশে আধুনিক চিত্রশিল্প এবং আধুনিক স্থাপত্যশিল্প প্রায় প্রায় একই সময়ে সেই আর্ট স্কুলের ভবন থেকে শুরু হয়।

শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকভাবে প্রাচীন ব্রিটিশ ভিকটোরিয়ান আদর্শের অনুসরণ করা হয়। হ্যাভেল কর্তৃক প্রচলিত শুধুমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতিই চর্চা করতে হবে এই ধারণায় বিপরীতে অবন ঠাকুর দ্বারা প্রবর্তিত বহমান প্রাচীন শিল্পধারার সঙ্গে আধুনিক শিল্পশৈলী মিলিত হয়ে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় শিল্পচর্চায় যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় সেটিই এখন পর্যন্ত বহমান। এর সঙ্গে পাশাপাশি বহমান রাজনৈতিক স্বাধীন চেতনা, সামাজিক অনাচার-অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানসগঠন ও পরিবেশ এই দেশে একটি নতুন শিল্পশৈলীর জন্ম দেয় যা একান্তভাবে এই দেশের এবং এই সমাজ-প্রতিবেশের। বিগত প্রায় ষাট বছর যাবত এই পৃথক ও ভিন্ন দৈশিক শিল্প-পরিচয়ে চিহ্নিত হচ্ছে বর্তমান শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতা। এই শিল্পমানস গঠনে অন্যান্যের পাশাপাশি যশস্বী বহু নারীশিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য এবং প্রশংসনীয়।

এই স্বল্প পরিসরে প্রতিটি নারীশিল্পীর সৃষ্টকর্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় অবকাশ না থাকলেও হয়তো এই প্রথম তাদের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার শুভারম্ভ হল যা পরে আরও সবার সহযোগিতায় বিস্তার লাভ করবে এই আশা করা যায়। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি সব নারীশিল্পী মিলে একটি পৃথক নারীশিল্পী সংগঠন স্থাপন করে তার কার্যক্রম শুরু করেন। যদিও নিম্নোক্ত তালিকাটি অসম্পূর্ণ ও বয়স অনুযায়ী সাজানো যায়নি এবং কারো নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে তাই আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব নিম্নলিখিত নবীণ ও প্রবীন নারীশিল্পীদের নাম বলা যায়, এরা হলেন– তাহেরা খানম, রওশন আরা আমিন, সৈয়দা মইনা আহসান, মোহসীনা আলী, জোবেদা ইসলাম, হাসিনা জামান, রুমী ইসলাম, এডলিন মালাকার, নভেরা আহমেদ, আসমা কিবরিয়া, শামীম শিকদার, ফরিদা জামান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, নাসরিন বেগম, নাইমা হক, সেলিনা চৌধুরী মিলি, রোকেয়া সুলতানা, আইভি জামান, কনকচাঁপা

চাকমা, সাইদা কামাল, লালারুখ সেলিম, নীলুফার জামান, দিলারা বেগম জলি, নাজলী লায়লা মনসুর, নাহিদা শারমিন, ফারেহা জেবা, এ্যানি ইসলাম, রেবেকা সুলতানা, কুহু, গুলশান হোসেন, রোখসানা সাইদা, লায়লা শারমীন, সিতারা এলিন, তৈয়বা বেগম লিপি, ইফফাত আরা, নাসিমা হক মিতু, সুলেখা চৌধুরী, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, জাকিয়া খান চন্দনা, মনিরা সুলতানা মুক্তা, তারানা হালিম প্রমুখসহ অনেকে। উল্লেখযোগ্য যে এর ভেতরে অনেকেই শিল্পচর্চায় ততোটা হয়তো নিবেদিত থাকতে পারেননি সংসার আর স্বামী-সন্তানদের কারণে তবুও বলা যায় এরাই দেশের অন্যান্য শিল্পীদের পাশাপাশি এদেশের মূল শিল্পচর্চায় নিজস্ব দেশীয় ধারাবাহিকতা সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন। যে কোনো শিল্পকর্মে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন পুরুষ কিংবা নারীভুক্তি সঠিক নয় যেহেতু ব্যক্তি নয় সৃষ্টিকর্মই একমাত্র বিবেচ্য হয়। তবু বিশেষ আলোচনা, ধারাবাহিকতা ও সরাসরি চিহ্নিত করার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র নারীশিল্পী বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে যেহেতু নারীশিল্পীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী তাদের সৃষ্টকর্ম রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্রশিল্পকে ঋদ্ধ করে চলেছেন। প্রথমেই ভাস্কর নভেরা আহমেদের কথা বলতে হয়। তিনি আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী উভয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম আধুনিক ভাস্কর হিসেবে পরিচিত। বিদেশের মাটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে সিমেন্ট আর লোহা দিয়ে যেসব ভাস্কর্য আধা-বাস্তব আধা-বিমূর্ত ধারায় মানুষ, প্রাণী ইত্যাদির অবয়ব হেনরি মুর, ব্রাঁকুসি প্রমুখ কালজয়ী ভাস্করদের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিক শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। নারীদের মধ্যে এর পরে শামীম শিকদার তাঁর শিল্পকর্ম দিয়ে ভাস্কর্যশিল্পের প্রসার ঘটিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে তাঁর বিভিন্ন বাস্তবধারার নিদর্শন দেখা যায়। তিনি ম্যুরাল বা দেয়ালচিত্রেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী তাঁর স্থাপনা ও কাটুম-কুটুম ভাস্কর্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। বিভিন্ন গাছ-গাছালির আপাত-অপ্রয়োজনীয় শুকনো ডাল-পালা আর শেকড় দিয়ে তিনি তাঁর শিল্পকর্ম সাজান ঘরের ভেতরে কিংবা দেয়ালে একটি নিজস্ব শৈলীর দেশজ পরিচয়ে। ভাস্কর্যে আইভি জামানের জ্যামিতিক গঠনপ্রণালীসমৃদ্ধ আধুনিক ধারার মাটি ও মেটাল দিয়ে বিভিন্ন আকার– বিশেষ করে ত্রিভুজ, বৃত্ত, বর্গ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ কাজগুলো খুব উল্লেখযোগ্য। বিদেশের কোরিয়াতে তাঁর ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে যা খুব গর্বের বিষয় এবং নভেরা আহমেদের পরে তিনিই এই বিষয়ে অগ্রগামী বলে বিবেচিত। ভাস্কর্যশিল্পের ধারাবাহিকতার অনেক নবীন ভাস্কর এগিয়ে আসছেন। এই ধারাবাহিকতায় নাসিমা হক মিতু ও তারানা হালিমসহ অনেকের নাম করা যায় যারা বর্তমানে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখছেন যা খুবই আশার কথা।

চিত্রশিল্প বা পেইন্টিং-এ সর্বপ্রথম নাম করা যায় তদানীন্তন আর্ট স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী শিল্পী তাহেরা খানমের। তাঁরা পাঁচজন চিত্রশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্নাতক হয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। এঁরা হলেন তাহেরা খানম, রওশন আরা আমীন, সৈয়দা মইনা আহসান, জোবেদা ইসলাম এবং হাসিনা জামান। এদের মধ্যে একমাত্র তাহেরা খানমই এখনও কিছুটা সক্রিয় আছেন। কিছুদিন আগেও তিনি চিত্রক গ্যালারিতে একটি একক চিত্র প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর ছবি সহজ-সরল আঙ্গিকে আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান প্রকৃতি ও মানুষদেরকে নিয়ে অনায়াসে কাছে টানে। তাঁর ব্যাচের অন্যরা চর্চার অভাবে হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন কিন্তু চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিশেষ করে নারীশিল্পীদের ক্ষেত্রে তাঁদের নাম বিশেষায়িত হয়ে আছে।

শিল্পী রুমী ইসলাম ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রী। তিনি বহুদিন ধরে রিয়াদে অবস্থান করছেন। তাঁর বিমূর্ত ও মূর্ত ধারার ছবি একসময়ে এদেশে সাড়া জাগিয়েছিল।

শিল্পী আসমা কিবরিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত রং-এর বিভিন্ন আয়োজন সবাইকে আকৃষ্ট করে তোলে। তাঁর শৈলী বিমূর্ত আবার কিছুটা আধা-বাস্তবতাসমৃদ্ধ।

এরপরে শিল্পী ফরিদা জামানের নাম করতে হয়। নারীশিল্পীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম চিত্রশিল্পে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। তাঁর আধা-বাস্তবতাসমৃদ্ধ মাছ, নদী, জাল, পাখি, বিড়াল ইত্যাদি বিষয়ে চিত্ররচনার মধ্য দিয়ে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপনার উৎকর্ষে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন।

শিল্পী সেলিনা চৌধুরীর গ্রাফিক্সধর্মী কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী রোকেয়া সুলতানার শিশুসুলভ বাল্যবেলার বিমূর্ত বা আধা-বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টি বিশেষ করে বিমূর্তধারার ছবিগুলো খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বোধহয় সবচেয়ে বহুপ্রজ শিল্পী এবং নিয়মিত ছবি এঁকে চলেছেন এবং এইভাবে অন্যতম অগ্রণী শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাঈমা হক বিমূর্তরীতি এবং রেখা ও প্রেক্ষাপটে বুনুনিসমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টিতে পারদর্শী। নাসরিন বেগম তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে প্রাচ্যরীতি অনুসরণ করেন। এই রীতি লোকজধর্মী যা নিয়ে ছবি রচনা এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে চলেছে। কনকচাঁপা উপজাতীয়দের বিশেষ আকর্ষণীয় জীবনযাপনরীতির দক্ষ ও সৃজনশীল শিল্পী। তাদের সহজ-সরল কিন্তু বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য তাঁর ছবির মধ্যে বিমূর্ত বর্ণবহুল প্রেক্ষাপটে মূর্তরীতির প্রকাশে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেয় যা তাঁকে বিশিষ্ট স্থান ও মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। সাইদা কামাল মূলত জলরং-এর শিল্পী। তাঁর বিষয় ও ছবি আমাদের চেনা-জানা আশেপাশের আটপৌরে প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নিসর্গ, ফুল, পাখি, বারান্দা, গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে স্নিগ্ধ-সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। নীলুফার চামানের ছবি বাস্তবতাসমৃদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ ও সামাজিক অবিচার-অসঙ্গতির প্রতিবাদে ব্যঙ্গাত্মকধর্মী যা সরাসরি দর্শকদের সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। নারী অধিকার সম্বন্ধেও তিনি সোচ্চার।

পুরুষশাসিত সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অধিকারবঞ্চিত, ধর্ষিত ও নিষ্ঠুর অ্যাসিড নিক্ষেপ দ্বারা যন্ত্রণাকারী বিকৃতির শিকার অসহায় নারীসমাজ আমাদের। এর প্রতিবাদে নারী অধিকার বিষয়ে অনেক শিল্পী কাজ করে যাচ্ছেন। এইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাজন, নিপীড়ন ও বঞ্চনা বা অসঙ্গতিও এঁরা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমাদের চিত্রশিল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যেমন পৃথকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-বিষয়ক চিত্রধারার জন্ম হয়েছে তেমনি শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে নারীশিল্পীদের মধ্যে পৃথকভাবে তাঁদের শিল্পসৃষ্টি দ্বারা নারী-অধিকার বিষয়ে একটি প্রতিবাদী স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে যা খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নীলুফার চামানসহ নাজলী নায়লা মনসুর, দিলারা বেগম জলি, ফারেহা জেবা, এ্যানি ইসলাম, সিতারা এলিন, তৈয়বা বেগম লিপি, সুলেখা চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নাজলীর বাস্তবতাসমৃদ্ধ ছবির মধ্য দিয়ে শহরের নাগরিক জীবন, মধ্যবিত্তের সামাজিক সঙ্কট, নারীদের প্রতি নির্যাতন, অবিচার– সব সরাসরি সাবলীলভাবে প্রস্ফুটিত যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা বিশেষ স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছে।

ফারেহা জেবা একজন সচেতন শিল্পী। নারী-মনীষীবৃন্দ যাঁরা তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সবাইকে সোচ্চার ও প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন সেই বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমামদের প্রতিকৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে নিজস্ব এক শৈলী সৃষ্টি করে তিনি ছবি সৃষ্টি করেন।

এ্যানি ইসলাম এ্যাসিড-পীড়িত ও অত্যাচারিত হতভাগা নারী বিষয়ে ছবি এঁকে চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখাতে বাধ্য করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এইসব নিষ্ঠুর ও হৃদয়-বিদারক ঘটনা না ঘটে সেই সম্বন্ধে সবাইকে জানাতে চেয়েছেন।

শিল্পী কুহু'র কালো বিশাল বাস্তবধর্মী মানুষের মুখ বা অবয়ব বিষয়ে চারকোল বা কালির ড্রইং রচনা তাঁর চিত্রসৃজনীশক্তির দৃঢ় ক্ষমতার পরিচয় দেয় যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুলশান হোসেনের অধিকাংশ বিমূর্ত ধাঁচের মাঝে-মধ্যে কিছু বিষয়ের অবতারণা, বর্ণাঢ্য এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছবি রচনা তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়।

তৈয়বা বেগম লিপিও উল্লেখযোগ্য শিল্পী। নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রবণতা, বাল্যস্মৃতি, নারীজীবনের নানান বিষয় মূর্ত-বিমূর্ততায় তাঁর ছবিতে সাবলীলভাবে জায়গা পায়। ইফফাত আরা স্বশিক্ষিত শিল্পী। সহজিয়া, নাঈভসুলভ ড্রইং, বেশিরভাগ ফুল, পাখি, ফুলদানিবিষয়ক প্যাস্টেল রং-এর সরাসরি লেপনে একটি সরলতার পরিচয়ে বিম্বিত তার ছবি। নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা একজন শক্তিশালী শিল্পী। সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত অভিব্যক্তিশৈলী দিয়ে তিনি তাঁর আকর্ষণীয় ছবি সৃষ্টি করতে পছন্দ করেন। গঠনের কাব্যিকধর্মী, রং-এর বহুধারায় বর্ণিল প্রস্ফুটিত, প্রেক্ষাপট এবং বুনুনিপ্রধান তাঁর ছবিগুলো চিন্তা ও অবচেতনার স্নিগ্ধ-স্ফটিক। সুলেখা চৌধুরীর ছবি নির্মাণ ও বিষয়ে নাটকীয়তা এবং গঠনশৈলী চমকপ্রদ। ছবিতে মানুষের ঝুলন্ত মাধ্যাকর্ষণহীন অবয়ব, উল্টো করে বা পাশে স্থাপন, মূলত নারীর পীড়িত, নির্যাতিত ও যন্ত্রণাময় জীবনের আলেখ্য প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় যা ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়ছে। আরও অনেক শিল্পী তাঁদের সার্বিক চিত্রশিল্পের নিয়ন্ত্রণ চর্চার মাধ্যমে আমাদের চিত্রশিল্পকে বেগবান করে তুলে চলেছেন। সবার নাম ও তাঁদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় তবে সব মিলে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। নারীশিল্পীদের নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা অবতারণার প্রেক্ষিতে আশাকরি সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী শিল্পী, শিল্প-সমালোচক, গবেষক বা শিক্ষক এই বিষয়ে আরো কাজ করতে এগিয়ে আসবেন।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব-অপ্রভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিল্পচেতনা, শৈলী, প্রকরণ ও উপস্থাপনার বিচিত্র এই শিল্পযাত্রার ধারাবাহিকতা। বিগত বছরগুলোর চাওয়া-পাওয়া, অর্জন-বর্জন সবই এই শিল্পমিছিলের সঙ্গী যা এগিয়েই চলেছে। নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের ক্রমাগত শিল্পকর্মের চর্চা বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন জলরং, তেলরং, পোড়ামাটি, কাঠ, পাথর, সিমেন্ট, ধাতব এবং ছাপচিত্রসহ স্থাপনাশিল্পের বিভিন্নতা যেমন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি বাস্তব, বিমূর্ত, আধা-বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ থেকে শুরু করে শিল্পচর্চার প্রায় সব শৈলী ও মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন দেখা যায়। একজন শিল্পীর পৃথক শিল্পচেতনা থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে সামাজিক ও দৈশিক শিল্পচেতনার প্রবণতা এবং তা কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে প্রাগুক্ত সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তা অনুধাবন ও লক্ষ করা যায়। সবকিছু মিলিয়ে দেশে তাঁদের অবদানে যে একটি পরিপূর্ণ শিল্প-অবস্থা পৃথক পরিচয়ে সার্বিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং সেটিই আমাদের জন্য ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী একটি বিরাট অর্জন।

[লেখক: কবি। আর্কিটেক্ট। প্রাবন্ধিক।]

প্র ব ন্ধ

জয়নুল মানসে পরিকল্পনাবোধ

বুলবন ওসমান

শিল্পাচার্য জয়নুলকে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে দেখার প্রয়াস হবে। তাঁর শিল্পবোধ, নন্দনতত্ত্ব, মানবতাবোধ ইত্যাদি গুণাগুণ। এর মধ্যে একটি তাঁর পরিকল্পনাবোধ। ইউরো-মার্কিন শিল্পীরা যেখানে পুরো সময় শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করে জয়নুল কেন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে লাগেন? হয়তো অনুন্নত দেশের শিল্পী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। আমাদের জাতি শুধু আর্থনীতিক দিক থেকেই দরিদ্র নয়, তথাকথিত শিক্ষিতদের মানসে ও রুচিবোধেও দারিদ্র্য। সমাজ পরিচালকরা যখন সমাজকে সুন্দর করতে না চায় শিল্পীকেই তখন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার জন্যে তুলি ফেলে ফাইল বগলে চেপে আমলাদের দরজায় দরজায় ধরনা দিতে হয়। শিল্পাচার্যের গড়া চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের জন্ম-ইতিহাস এর একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এটা করার যখন তোড়জোড় চলছিল এক মন্ত্রী তো বলে বসলেন, এ-দেশে ওসব আর্ট-ফার্ট চলবে না। এই তথ্যটি শিল্পাচার্য শিল্প প্রায়ই উল্লেখ করতেন।

রাজা ফিলিপ যখন ঢাকায় আসেন সরকারের পক্ষ থেকে উপহার দেবার জন্যে আবেদিন সাহেবের ছবি কেনা হয়। পরবর্তীকালে মূল্য পরিশোধ করার সময় শিল্পীকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ছবি কেনার ব্যাপারে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল কিনা? এবং টেন্ডারে তিনি কত দাম দিয়েছিলেন? এবং টেন্ডারে পাশ করা কাগজপত্র এনেছেন কিনা?

এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশেও। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কাছ থেকে ছবি কেনার জন্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং শিল্পাচার্য এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এই রকম শিল্পবিরোধী পরিবেশে জয়নুলের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে আসে তাঁর পরিকল্পনাবোধ। প্রতিষ্ঠান গড়ার ইচ্ছা। এই বাসনা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই।

কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন জয়নুল, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন প্রমুখ শিল্পীরা। সুতরাং এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিজেদের মান বিকাশের জন্যেই প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনা মানেই একটি স্বপ্নকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। আর এই বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যেই সময় পার হলে একটা কুঁড়ি ফুলে পরিণত হয় সেই সময় আজ অতিক্রান্ত। আজ ঢাকার চারুকলা প্রতিষ্ঠানটি প্রস্ফুটিত।

শেষজীবনে শিল্পাচার্য বলতেন, এক সময় চালের অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আর এখন চলছে রুচির দুর্ভিক্ষ। আর রুচির দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে, জাতির হীনমন্যতা কাটানোর জন্যে তিনি দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এক, লোকশিল্প জাদুঘর। দুই, নিজ শিল্পকর্মের সংগ্রহালয়।

লোকশিল্প জাদুঘরের জন্যে তিনি মনে মনে বাসনাটা যৌবন থেকেই পুষে রেখেছিলেন। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঊনিশশো ষাটের দশকে। এই সম্বন্ধে খবরের কাগজে লেখালেখি করান এবং সমাজকর্তা ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা করতে থাকেন।

এমনকি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছোটখাটো শিল্প সংগ্রহালয়ে লোকশিল্পীদের তৈরি সুচারুরূপে বোনা শিকা ঝোলান। তবে এর জন্যে তথাকথিত শিল্পী সুধীনজনদের বিদ্রূপের শিকার হন।

লোকশিল্প সংগ্রহালয় সৃষ্টির ইচ্ছার পেছনে তাঁর দুটি ব্যাখ্যা ছিল। এক, বাংলাদেশ যতই পিছিয়ে পড়া দেশ হোক তার জনসাধারণ এক বিশাল বৈভবের আধিকারী। সে বৈভব তার লোকশিল্প। এর ব্যাপকতা ও গুণগত উৎকর্ষ দুদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায়ই বাংলার জামবাটির কথা বলতেন। বলতেন এক মার্কিন শিল্পতাত্ত্বিকের মন্তব্যের কথা। উক্ত মার্কিন শিল্পতাত্ত্বিক বলেছেন, যে-জাতি এত সুন্দর গড়ন গড়তে পারে তার নন্দনতাত্ত্বিক বোধ খুবই উঁচু দরের।

যেহেতু তিনি শিল্পী, চেয়েছেন লোকশিল্পের ভালো ভালো সব নমুনা যা নষ্ট হয়ে যেতে চলেছে, তাকে সংগ্রহশালায় বাঁচিয়ে রাখতে এবং যেহেতু তিনি শিল্পমনস্ক তাই চেয়েছেন পুরো জাতিকে এর সামনে দাঁড় করিয়ে দেখাতে–দেখ, তোমার ঐতিহ্য, হীনমন্যতা কাটাও।

বিশ্বের বুকে বড় হবার প্রেরণা লাভ করে।

লোকশিল্প জাদুঘর গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নুলের প্রতীক্ষা শেষ হয়। তিনি হাজির হন বঙ্গবন্ধুর সামনে। দেশের বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু লোকশিল্প জাদুঘরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়নের জন্যে নির্দেশ দেন। এভাবেই জয়নুলের অন্যতম প্রধান কীর্তি ভিত্তি লাভ করে।

লোকশিল্প জাদুঘরের কাজ করতে করতেই শিল্পাচার্য অসুস্থ বোধ করেন। এবং অনুভব করেন অচিন পাখি যে খাঁচা ছেড়ে যাবে। তাই ব্যস্ত হন শৈশবের স্মৃতিজড়িত পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে একটি নিজের সংগ্রহালয় সৃষ্টির কাজে।

এটিও শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

তাঁরই উদ্যোগে এবং বঙ্গবন্ধুর উৎসাহে শিল্পকলা একাডেমি আইন পাশ হয় এবং পরবর্তীকালে শিল্পকলা একাডেমি স্থাপিত হয়।

পরিকল্পনাবোধ থেকেই তিনি শিশুসংগঠন কচি-কাঁচার মেলার সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছর জড়িত ছিলেন। চেয়েছিলেন দেশের ছেলেমেয়েরা শিল্পবোধসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠুক। যারা দূর করবে দেশের শিল্প-বিরোধী পরিবেশ। এভাবেই শিশুকল্যাণ পরিষদের ছোটদের চিত্রাঙ্কণ বিদ্যালয়টি চারুকলা চত্বরে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যা জয়নুল শিশু চিত্রাঙ্কণ বিদ্যালয় হিসেবে কাজ করছে।

শুধু শিক্ষা নয় তাঁর নজর যে দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে অন্বিত ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। ১৯৭০ সালে যখন স্বাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধছে, যখন ড. এনামুল হকের নেতৃত্বে তাবৎ বুদ্ধিজীবী সোনারগাঁ যান সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। তখনকার একটি ঘটনা। পানাম শহরের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা শুরু হয়েছে। অনেকে বলেন বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে। সোনারগাঁর ইতিহাস নিয়ে। আবেদিন সাহেবের আলোচনার একটি

ভিন্নধর্মী কথা শোনা গেল। তিনি অনেক কথার মধ্যে একটা কথা জোর দিয়ে বললেন যে বড় রাস্তা থেকে পানাম শহর আসার পথে দুপাশে যে ডোবা দেখলেন এগুলোতে মাছের চাষ করলে মাছের অভাব মিটে যাবে।

এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টি কতদিকে ছিল। লিওনার্দো যেমন নিজেকে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত রাখতেন জয়নুল তেমন পরিকল্পনা করতেন সমাজের নানা দিকের উন্নয়নের।

শুধু লোকশিল্প নয় লোকউৎসবের পুনরুজ্জীবনের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। কৃষিপ্রধান বাংলায় নতুন ধান ওঠার পর যে উৎসব হত 'নবান্ন' অগ্রহায়ণে এই উৎসবটি আবার করা যায় কিনা তার পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। তাই 'নবান্ন' চিত্র প্রদর্শনী করেন ১৯৭০ সালে।

শিল্পী জয়নুলের শিল্পচর্চা যেমন এসেছে সহজভাবে তেমনি তাঁর পরিকল্পনাবোধ। এ দুটি বোধের উৎস হয়তো এক : জীবন। আর কে না জানে শিল্পাচার্য জয়নুল ছিলেন জীবনের রূপকার।

জয়নুলের নন্দনতত্ত্ব

শিল্পাচার্য জয়নুলের নন্দনতত্ত্বের উৎস তাঁর জীবন ও পরিবেশের মধ্যে লুকিয়ে। তাঁর শিল্পের চরিত্র বা শিল্পতত্ত্ব জানতে গেলে তাই তাঁর জীবন ও পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া দরকার। খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গেলে দাঁড়ায় এ রকম : মফস্বল জীবনের প্রথম দিককার জীবনযাপন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে টানাটানির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা, পরিবেশের মধ্যে বিশেষ করে ময়মনসিংহে শান্ত শহর ও শান্ত নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে তার জেলে, মাঝি ও চাষিদের কর্মজীবন লক্ষ করা। তাদের সঙ্গে গল্প করে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এছাড়া বাংলার সজল প্রকৃতি, এর ঋতুবৈচিত্র্য এসবই জয়নুল মানসকে গড়ন দিয়েছে। যৌবনে কলকাতায় শিক্ষা ও কর্মজীবন তাঁকে মহানগরের সঙ্গে পরিচিত করলেও তাঁর মানসকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। তাঁর চিত্রে নগর অনুপস্থিত। এবং নগর যখন এল, এল তার বীভৎস রূপ নিয়ে। নগর হিসেবে কলকাতা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে পটভূমিতে বিরাজ করে, সম্মুখে মানুষ এবং মৃতপ্রায় মানুষ। এখানেই জয়নুল জীবনের আর একটি দিক দেখলেন, তাঁর শৈশব-কৈশোরের গীতিকাব্যময় জগৎ রৌদ্রজ্বালায় ঝলসে গেল। দেখলেন জীবনের বীভৎস সৌন্দর্যের দিক। রেঙ্গুনযাত্রী শরৎচন্দ্র যেমন বঙ্গোপসাগরের পাহাড়প্রমাণ ঢেউ দেখে লেখেন, ভয়ঙ্কর সুন্দর, জয়নুলও তেমনি বলেন, শুধু ময়ূর আঁকলেই হবে না, শকুনকেও আঁকতে হবে এবং শিল্পীর চোখে শকুনও সুন্দর।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য কী? জয়নুল তাঁর সত্তা দিয়েই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক রূপ চিনতে পেরেছিলেন। তাই দুর্ভিক্ষের স্কেচ করতে গিয়ে তিনি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে তাঁর চিত্রকে জেবড়ে ফেলেননি বরং স্রষ্টার মতো নিরপেক্ষ থেকে যা দেখেছেন তাকেই রূপ দিয়েছেন। মনের বেদনা মনে আছে, তুলির মধ্যে তা কাঁপন ধরায়নি।

শিল্পগুরু পিকাসোর সঙ্গে জয়নুলের অনেকাংশে মিল। পিকাসো প্রথমজীবন কাটিয়েছেন দারিদ্র্যে, জয়নুলও তাই। পিকাসো প্রথমজীবনে প্যারিসের সব দুঃখী জনসাধারণের জীবনের রূপ দিয়েছেন, জয়নুলও তাই। পিকাসো ১৯৩৬-এ 'গুয়ের্নিকা' চিত্রে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, জয়নুল ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের স্কেচের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ান। দুজনই জীবনবাদী শিল্পী, সমাজ-বাস্তববাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে বিশ্বাসী। বস্তুনির্ভরতা ছিল দুজনের চিত্রের মূল কথা। পিকাসো অবশ্য প্রতীকে চলে যান,

জয়নুলের পক্ষে যা সম্ভবই হয়নি। আর এই সম্ভব না হওয়ার পেছনে হয়তো সমাজ-পরিবেশ। ইউরোপের সমাজ পিকাসোর জীবনকালে কত বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু জয়নুলের সমাজ গুণগতভাবে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে? ১৯৪৩-এর স্কেচ কি আজও বাংলাদেশের চিত্র নয়?

জয়নুল যত বিপুলসংখ্যক স্কেচ ও রেখানির্ভর চিত্র করেছেন সে তুলনায় তাঁর তৈলচিত্র খুবই কম। এ সম্বন্ধে জয়নুলের অভিমত হল: এরা প্রকরণগতভাবে পৃথক হলেও গুণগতভাবে এক। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত: একজন লোক লগি ঠেলে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে এটাই যদি দেখানোর মূল বিষয় হয় নদীর পানির কী রং, নীল, স্বচ্ছ না ঘোলাটে সেটা মুখ্য নয়। তাই এখানে পানিতে রঙ না দিলে কোনো ক্ষতি নেই।

অনেকের ধারণা জয়নুল আধুনিক সব শিল্পধারাকে পছন্দ করতেন না। এটা ঠিক ধারণা নয়। আমাদের শিল্পীরা ইউরোপের ধারা ব্যবহার করবে না তা তিনি বলতেন না। তাঁর অভিমত: আমাদের শিল্পীরা নিজেদের প্রাকৃতিক, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন কাজ করে। বিদেশি আঙ্গিক গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু তা নিজেদের প্রাকৃতিক, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন কাজ করে। বিদেশি আঙ্গিক গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু তা নিজের প্রজ্ঞা ও অনুভূতিতে পৌঁছানো চাই। শুধু শুধু কোনো বড়শিল্পী বা একটি আঙ্গিকের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া উচিত নয়।

বাংলাদেশের যে সমাজ-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সেখানে ইউরোপীয় ধারা একেবারে অপরিচিত। আবেদিনের অঙ্কনের ধারা ছিল ব্রিটিশ একাডেমিক। তিনি আধুনিক বিমূর্ত ধারা গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন : রেনেসাঁর পর থেকে ইউরোপে যত শিল্পআন্দোলন হয়েছে তা ঘটেছে স্বজ্ঞানে এবং এইসব ধারা তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের জীবনের কিছু যদি তেমন করে প্রকাশ করা যায় তা দোষের নয়, কিন্তু তা যেন হুবহু নকল না হয়।

আবেদিনের শিল্প স্বজ্ঞানির্ভর। তাই তিনি তাঁর পরিবেশে যেভাবে দোলায়িত হয়েছেন তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবনের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। দেশের নিসর্গের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল তা থেকেই বেড়ে উঠেছে তাঁর চিন্তা। তিনি বলেন, আমাদের সবার গন্তব্য এক। কেউ গেল উড়োজাহাজে, কেউ হেঁটে— যে উড়োজাহাজে গেল সে হয়তো একটা প্যানোরমিক দৃশ্য দেখতে পেল, কিন্তু যে হেঁটে গেল সে পাতা মাড়ানোর ধ্বনি ও নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেল, যে প্লেনে গেল তার অভিজ্ঞতা থেকে এ অভিজ্ঞতা ভিন্ন। তা বলে শুকনো পাতা বৈঠকখানায় এনে মাড়ালে হবে না। পরিবেশের মধ্যে গিয়ে উপভোগ করতে হবে।

লোকশিল্পের প্রতি জয়নুলের ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। কীভাবে এই লোকশিল্প রূপ পরিগ্রহ করে এবং কীভাবে এতে নকশা জায়গা করে নেয় এ সম্বন্ধে তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন: ধরা যাক একটি জালা বা মটকার কথা, যাতে পানি রাখা হবে— এই পাত্রটি যে-কোনোভাবে গড়া যেত, কিন্তু যেহেতু রাখা হবে পানি এবং হয়তো খাবার পানি, তাই যাতে বেশি পানি ধরে তাই পেট মোটা এবং ঢাকনি দেবার জন্যে ক্রমশ সরু হয়ে মুখ ছোট হয়ে যাচ্ছে। মূলত প্রয়োজনবোধ থেকেই গড়নের রূপ লাভ করে। তারপর গোটা জালাটা একেবারে খালি মনে হওয়ায় একটা দুটো লতাপাতার চিত্র বা কোণ জ্যামিতিক নকশা জায়গা করে নেয়। এই নকশার বোধ আসছে স্বজ্ঞা বা ইনটিউশন থেকে এবং আসছে যে প্রকৃতির মধ্যে আছে তার মধ্যে কাজ করতে করতে। এই নকশা আসছে অচেতন বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কিন্তু আধুনিক শিল্প সম্পূর্ণভাবে

সচেতন ফল। সচেতনভাবে অচেতন হওয়া দুরূহ। তবে মূল প্রকৃতি থেকে সৃষ্টির প্রেরণা নেবার চেষ্টা সবসময় করা যেতে পারে।

আবেদিন শেষজীবনে দু'একটি বিমূর্ত চিত্র করার চেষ্টা করেছিলেন, তা-ও আধা-বিমূর্ত। তাঁর মনোভাবের মধ্যে এই শিল্পধারা জায়গা পেত না, তাই এই মাধ্যম তিনি সত্যিকারভাবে ব্যবহার করেননি। এই শিল্পধারা সম্বন্ধে তাঁর মত হল : জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ নিবিড়। নির্বস্তুক চিত্রের কিছু অংশ হল গীতিকাব্যের চরিত্র নিয়ে, তা টিকবে, কিন্তু শুধু গীতিকাব্য জীবনের মূল কাঠামো ও প্রয়োজন থেকে অনেক দূরে। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পলায়নবাদী। আমাদের এই মনোভাব পরিহার করে জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের স্বকীয়তা তার লোকশিল্পে। তাই তিনি লোকশিল্প সংগ্রহালয় সোনার গাঁ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন ও তাকে সবার চোখের সামনে তুলে ধরার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। আর এটি করতে গেলে এর লোকশিল্পের মাধ্যমে যত সহজে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান যাবে তা অন্য কোনো উপাদানে এত সহজে হবার নয়। তিনি বলতেন, এক শুধু যদি মাটির জিনিসের সংগ্রহই সাজিয়ে তুলে ধরা হয়, লোকের মাথা ঘুরে যাবে। কত রকম যে গড়ন আর নকশা আছে তা ভাবা যায় না।

জয়নুলের নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা ও আলোকপাত করার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করতে হবে। এখানে তাঁর আর একটি উক্তি দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। প্রত্যেক শিল্পীকেই হয়তো সহজেই এবং নির্দ্বিধায় একটা প্রশ্ন করা যায়, আপনি কেন ছবি আঁকেন? জয়নুলকে এ প্রশ্ন করলে তিনি একটি জবাবই প্রায় সবাইকে দিতেন, বলতেন, কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধা সখিদের বলে, চল সখি জলকে যাই—আর ভক্তরা বলে, প্রভু এলেন।

তাঁর এ উক্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

[লেখক: প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), চারুকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

মোহাম্মদ কিবরিয়ার ছবি

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ছবি আঁকায় হাতেখাড়ি হয়েছিল অনেক আগেই, স্কুলে পড়ার সময়। বীরভূম জেলা স্কুলে পড়তেন, যে-স্কুলে চিন্তামনি কর একসময় ড্রয়িং শিক্ষক ছিলেন। প্রতিবছর কৃষিমেলা হত বীরভূমে, যেখানে আঁকিয়েরা ছবি নিয়ে যেতেন, যাত্রাপালার শিল্পীরা আসতেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা এসে গেট বানাতেন, আল্পনা আঁকতেন। একবার রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের বন্ধু সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ এসেছিলেন প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। বীরভূম জেলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা মেলার ছবি প্রদর্শনীতে ছোট ছোট কাজ নিয়ে হাজির হত। মোহাম্মদ কিবরিয়াও কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছেন। ওই কৃষিমেলার গুরুত্ব ছিল, রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন একবার, মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে। কিবরিয়া তখন ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের সৌম্য শান্ত মূর্তি তাঁর মনে খুব রেখাপাত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখা অবশ্য অনেক পরের ব্যাপার। ওই ছবির প্রতি একটি বিশেষ টান অনুভব করেছেন তিনি সবসময়, যেমন করেছেন রবীন্দ্র-পরবর্তী অনেক শিল্পীই।

বীরভূম জেলা স্কুল থেকে হাতে লেখা ম্যাগাজিন বেরুত। সেই ম্যাগাজিনে আঁকতেন কিবরিয়া। ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা। বস্তুত, স্কুল শেষ করে যখন কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন, তার পেছনে অনুপ্রেরণা এসেছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কথা বলেছেন কিবরিয়ার পরিবারের সঙ্গে। পরিবার বলতে মা এবং বড় ভাই যারা গুরুজন। বাবা মোহাম্মদ রফিককে হারিয়েছেন অল্প বয়সে। একটি ছোট প্রেস ছিল বাবার, তাঁর মৃত্যুর পর বড় ভাই সেটি চালাতেন। অবশ্য ওয়াজেদ আলী চৌধুরীকে সেই অর্থে রাজি করাতে হয়নি বড় ভাই মো. আরিফ বা মা সায়েরা বেগমকে। তাঁরা কিবরিয়ার শিল্পী হওয়ার ইচ্ছায় কোনো বাধা দেননি। পরিবারের পরিবেশটি ছিল খোলামেলা, আন্তরিক। কাজেই ১৯৪৫ সালে ষোলো বছর বয়সে, কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জয়নুল আবেদিন ছিলেন সেই স্কুলের শিক্ষক, খুবই জনপ্রিয়। আরো ছিলেন আনোয়ারুল হক, মণিভূষণ দাশগুপ্ত, ঋষেণ চক্রবর্তী। আরো একজন শিক্ষক ছিলেন, বসন্ত গাঙ্গুলি। তিনি কিবরিয়াকে প্রভাবিত করেছেন শিল্পের প্রকরণ ব্যবহারে সৃজনশীল হওয়ার ক্ষেত্রে। বসন্ত গাঙ্গুলি নিজে এসব প্রকরণ– রং, প্যাস্টেল, কাঠকয়লা– খুবই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারতেন। আবার ছবির ভেতরে যে একটি কাঠামো থাকে, যার সঙ্গে উপরিতলের থাকে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সেটি তিনি চমৎকারভাবে চিহ্নিত কতে পারতেন। ছবির কম্পোজিশনে কোথায় কোন রেখা দৃষ্টিক্ষেত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বসন্ত গাঙ্গুলি তা-ও ভালো জানতেন। কিবরিয়ার মধ্যে তিনি এসব গুণের উন্মেষ ঘটাতে

পেরেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিবরিয়া জেনেছিলেন, প্রতিটি ছবির একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকে, এবং ছবির কাঠামোকে সেই বিন্দুর চারদিকে সাজাতে হয়। এই সাজানোটি যে সবসময় একটি পূর্ব পরিকল্পনা থেকে করতে হয়, তা নয়, বরং ছবি আঁকার সময় (অথবা ছাপাই ছবিতে রেখার সূক্ষ্ম ও জটিল প্রয়োগের সময়) একটি স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে, একটি অনিবার্যতা থেকে সেই ছবির ফর্মগুলো যেন একটি কেন্দ্রাভিমুখ বিন্যাসে গ্রন্থিত হয়ে যায়। এই কেন্দ্রটি নান্দনিক অনুভূতির, আবেগের সৃজন কল্পনার অথবা বিচারবুদ্ধির। কিবরিয়ার ছবিতে (আধা-বিমূর্ত, আধা-অবয়বধর্মী অথবা বিমূর্ত) এই কেন্দ্রিকতার বিষয়টি একটা গতিশীলতা সৃষ্টি করে। এমনকি, যে ছবিতে অবয়বটি শনাক্তযোগ্য, সেখানেও। ১৯৫৯ সালে আঁকা 'ফুল হাতে বালক' ছবিটির উদাহরণ দেয়া যাক। এ ছবিতে দর্শকের প্রধান অনুভূতিটি কি বালক সম্পর্কিত, নাকি ফুল সম্পর্কিত? একটুক্ষণ তাকালে দেখা যাবে, বালক ও ফুল– এ দুয়ের পেছনে আছে এক ধরনের বিষণ্নতা। বালকের চোখে যেমন নেই উচ্ছাস, তেমনি ফুলও ঠিক ফুল হয়ে ধরা দেয় না। এই ছবিতে ফুল সম্পর্কিত প্রথাগত রোমান্টিকতা নেই, আছে বিষণ্নতা, অথবা অনিস্পাপতা (বালকের ফিগারকে তুলে ধরে যে রং তা ওই অনিস্পাপতার ইঙ্গিতবহ)। এই ছবির কেন্দ্র কোথায়? কেন্দ্র আছে ওই বিষণ্নতা/অনিস্পাপতার অনুভূতিতে, যেখানে এই ছবির অভিজ্ঞতা আমাদের নিয়ে যায়। অথবা ছাপাই ছবিতে (যেমন, ১৯৬০-তে করা 'দুটি ফুল', লিথোগ্রাফ) ফর্মগুলো পরস্পর সম্পর্কিত হয়, নিষিক্ত হয়, বিকর্ষিত হয়, কিন্তু ছবিতে একটা ভারসাম্য সবসময় বজায় থাকে। 'দুটি ফুল'– এ ফুলের দুই প্রতিরূপ, বিমূর্ত দুটি ফর্ম, একটি পরিব্যাপ্ত পরিসরে স্থাপিত। তাদের ভিতরে মিল আছে, অমিল আছে। কিন্তু একসময় বোঝা যাবে, এই দুটি ফর্ম আসলে সম্পর্কের অনিবার্যতার একটা চিন্তাকেই জাগিয়ে দেয়। এ ছবির কেন্দ্র কোথায়? কেন্দ্রটি উপস্থিত একটি বোধে, একটি অনুভূতিতে, একটি বিচারে, যাতে পৌঁছানোর জন্য দুটি ফর্মের আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে হবে। কলকাতা আর্ট স্কুলে যখন পড়তেন কিবরিয়া, পশ্চিমা ধাঁচের অ্যাকাডেমিক চর্চাটাই তখন প্রবল ছিল। তাতে একটি পর্যায়ের দক্ষতা সবাই অর্জন করতে পারত। কিন্তু শুধু এই চর্চায় মননশীলতার বিকাশটি ছিল কঠিন। কিবরিয়া অবশ্য অ্যাকাডেমিক চর্চার মাধ্যমে ভিত্তিটি তৈরি করেছেন। কাজের যে একটি শৃঙ্খলা, একটি নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন, সেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর্ট স্কুলে আরো চর্চা হয়েছে নব্য-বঙ্গীয় চিত্রের। এই রীতির আদর্শায়িত দেহভঙ্গিমা, ওয়াশ টেকনিক, পৌরাণিক বিষয়বস্তু শুরুতে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করলেও এর রীতিবদ্ধতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভঙ্গিসর্বস্বতা এই রীতির ব্যাপক প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছিল।

অ্যাকাডেমিক চর্চায় জলরং ও তেলরঙের ব্যবহার ছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যে ঘন ও অনচ্ছ জলরং ব্যবহার করা হত, তার তুলনায় তেলরঙে চিত্রতলে অনেক বেশি গভীরতা আনা সম্ভব এবং টেক্সচারের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যানভাসকে গতিশীল করা যায়, এরকম একটি সিদ্ধান্ত থেকে অ্যাকাডেমিক চর্চা রং ও অন্যান্য প্রকরণ ব্যবহারে যেমন পশ্চিমকে অনুসরণ করেছে, তেমনি বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য আনতে তা সচেষ্ট ছিল, যেমন প্রতিকৃতি আঁকার প্রতি ঝোঁক। কিবরিয়া অ্যাকাডেমিক কাজ করেছেন, কিন্তু ইম্প্রেশনিজমের দ্বারস্থ হয়েছেন ক্যানভাসকে নির্ভার ও স্পন্দমান করতে। আলোর প্রতি এবং খোলা জায়গার প্রতি ইম্প্রেশনিস্টদের পক্ষপাতিত্ব আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিমুখী করতে প্রণোদনা যুগিয়েছে। ইম্প্রেশনিস্টদের মতো কিবরিয়া একদিকে ছবিতে নিজেকে প্রকাশের একটি সুযোগ এবং পৃথিবীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার উপায় হিসেবে দেখেছেন, অন্যদিকে প্রকৃতির ভিতরের জীবনকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন।

১৯৫০ সালে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরুলেন কিবরিয়া এবং ১৯৫১ সালে শেষের দিকে চলে এলেন ঢাকায়। ঢাকায় এসে তিনি নওয়াবপুর স্কুলে ড্রয়িং-শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ততদিনে জয়নুল আবেদিন তাঁর কয়েকজন সতীর্থের সহায়তায় ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট খুলেছেন, এবং এর অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েছেন। জয়নুল কিছু সময়ের জন্য লন্ডন গেলে কিবরিয়া আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার সুযোগ পান, জয়নুল ফিরে এলে তিনিও ফিরে যান নওয়াবপুর স্কুলে। তবে ১৯৫৪ সালে পাকাপাকিভাবে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। অবসরগ্রহণের আগ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেছেন।

শুরুতে ছোট ছোট কিছু কাজ করেন কিবরিয়া। নিজেই বলেছেন, তার কোনো কোনোটিতে ছিল নব্য-বঙ্গীয় স্কুলের প্রভাব, কোনো কোনোটিতে মিনিয়েচার পেইন্টিং-এর। সেসব কাজ ছিল অবয়বধর্মী, তবে আদর্শিক বা স্টাইলাইজড়। নিসর্গের ছবি এঁকেছেন, এবং তাতে রংকে একটি নিজস্ব জীবন দিতে চেয়েছেন; এমনভাবে বর্ণলেপন করেছেন, যেমন স্বাধীন একটি সত্তা নিয়ে তারা বাঙ্ময় হয়। এই বর্ণলেপনের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরুনোর পর কিবরিয়া যমিনী রায়ের ছবির, বিশেষ করে তাঁর রং ব্যবহারের, গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। কিবরিয়া নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন যামিনী রায়ের কাজ। পটুয়াদের বিষম বর্ণলেপনের পরিবর্তে সুষম বর্ণলেপনের প্রতি যামিনী রায়ের পক্ষপাতিত্ব, ছবিতে গড়নের পরিবর্তে দ্বিমাত্রিকতার উদ্ভাস, রেখা ও রঙের সাযুজ্য ও সংহতি– এ-সবই কিবরিয়াকে আকর্ষণ করল। তাছাড়া ইউরোপের পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ধারায় আঁকা যামিনী রায়ের কিছু নিসর্গচিত্রও তাঁকে এরকম ছবিতে আলোর খেলার বাইরে ছবির নিজস্ব বাস্তবতাকে আলাদা করে দেখতে অনুপ্রাণিত করেছে। নিসর্গ কিবরিয়ার ছবিতেও মূর্ত হয় নানান আবহে, নিসর্গের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা বোধ এবং অনুভূতি, আনন্দ এবং বেদনা, বাস্তবতার অভিঘাত ও নস্টালজিয়া। এসময় স্পেসের ব্যবহারে তিনি উদার হয়েছেন, যাতে ক্যানভাসের ভেতরে পরিসরের একটি পরত খুলে যায়; বস্তুর পেছনে গিয়ে ভিন্ন একটি মাত্রায় স্থিত হয় চিত্রতল।

নিসর্গের পাশাপাশি ব্যক্তির ওপর তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন ব্যাক্তির ভেতরের জগৎ ও তার নানা বিন্যাসকে। তিরিশের দশকের বাংলা কবিতা পশ্চিমা আধুনিকতা, এবং পশ্চিমা আধুনিকতার শৈলীগত লক্ষণগুলো আত্মস্থ করে যেরকম বক্তির বিষণ্নতা, বিকার, পারক্যবোধ এবং তার সংক্ষুদ্ধ বিত্তের নানা আখ্যান রচনা করেছিল, যার প্রভাবে বাংলা কবিতার ঘটে যায় এক কালান্তর, তেমনি পঞ্চাশ- ষাটের দশকে বাংলাদেশের চিত্রকলায় ব্যক্তির ওপর সন্ধানী আলো পড়ে। কিবরিয়ার ছবিতে এই ব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়েছে অবশ্য কিছুটা আত্ম-অবলোকনের আলোতে। বালকবেলা থেকেই পারিবারিক আবহ কিবরিয়ার জন্য সৃষ্টি করেছে নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্ববোধ। হয়তো অনিশ্চয়তার অস্বস্তিও। এই অনিশ্চয়তার উৎপত্তি তাঁর পরিপার্শ্বকে নিজস্ব করে নিতে না পারার, অথবা জীবনের রীতিবদ্ধ প্রবাহে নিশ্চিত পা রাখতে না পারার অসফলতা থেকে। কিবরিয়া কখনো উচ্চকিত হতে পারেননি তাঁর চিন্তা নিয়ে, দ্বন্দ্ব নিয়ে, ক্রোধ নিয়ে; আত্মমগ্নই থেকে গেছেন বরাবর। তাঁর চিত্রস্বভাবও তাই অন্তর্গামী। সেজন্য দ্বন্দ্বকে তিনি সাজান রং ও ফর্মের একটি অন্তর্কাঠামোয়। বস্তুর বহিরাঙ্গ তাঁকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু শীঘ্রই তিনি দৃষ্টি ফেলেন এর ভেতরের বিন্যাসে, এর অন্তর্কাঠামোয়।

পঞ্চাশের দশকে একদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সমাজবাস্তবতা, যার অভিঘাত পড়েছে শিল্প-সাহিত্যে, পশ্চিমা আধুনিকতার চর্চা, যার ফর্মগুলো বাস্তবকে ভেঙে, অথবা তাকে পাশ

কাটিয়ে বাস্তবের অতীত কোনো মাত্রায় অভিজ্ঞতাকে বিন্যস্ত করেছে-সাহিত্য ও চিত্রকলায় একই সঙ্গে বাস্তবধর্মী এবং নিরীক্ষাধর্মী সৃষ্টিকে উৎসাহিত করেছে। বাস্তবধর্মী শিল্পের ভাষাটি, বিশেষ করে যে-বাস্তবে সমাজ প্রধান, সাধারণত উঁচু মাত্রার, যেহেতু শুধু বাস্তবের নিরাবেগ চিত্রায়ণ নয়, এর নতুন এক বিন্যাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, সেই শিল্প কামনা করে। সেই ধরনের ছবি বাংলাদেশের অনেক শিল্পী এঁকেছেন। আবার জড়জীবন অথবা নগর-দৃশ্যের মতো প্রথাসিদ্ধ কাজও প্রচুর হয়েছে, যেখানে অনুপাত, সাযুজ্য, মাত্রা– এসব চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিবরিয়া এই ধারার বাস্তবতা থেকে দূরে থেকেছেন, যেহেতু তিনি সমাজজীবন, ব্যক্তির বস্তুগত অবস্থান, তার স্থিতি, নিশ্চয়তা অথবা তার শেকড় ছড়ানো জীবনকে কখনো উপজীব্য করেননি। বরং তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন ব্যক্তির অন্তর্গত নানা টানাপোড়েনকে; তার অনিশ্চয়তা, বিষণ্নতা এবং শঙ্কাকে; তার মনের জটিল গ্রন্থিগুলোকে; অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলোকে। এজন্য সমকালীন চিত্রশৈলীসমূহের মধ্যে তার কাছে প্রকাশবাদ বা এক্সপ্রেশনিজম, পরাবাস্তবতা অথবা স্যুররিয়ালিজম এমনকি ডাডাইজমেরও মূল্য পাবার কথা। কিন্তু পেয়েছে এর কোনো কোনোটি, সব পায়নি। এবং তার কারণও রয়েছে। কিবরিয়ার ছবিতে এক্সপ্রেশনিজম পঞ্চাশের শেষ থেকে ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্ণয় করে নিয়েছে, এবং স্যুররিয়ালিজমের নানা উদ্ভাস তাঁর কোনো কোনো ছবিতে দেখা যায়। তবে এর বাইরে অথবা সালভাদোর দালির মতো কোনো শিল্পীর দিকে, ডাডাইজম অথবা উত্তর-আধুনিক কোনো চিত্রশৈলীর দিকে তিনি হাত বাড়াননি, যে-শৈলী প্রচলিত নান্দনিকতাকে ভেঙে, বাস্তবের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে এক নতুন চিত্রভাষা রচনা করে। এই একটি বিষয়ে তাঁকে রক্ষণশীলই বলা যায়। তবে, এক্সপ্রেশনিজম, বিশেষ করে এর বিমূর্ত ধারাটি, তিনি খুব কর্তৃত্ব নিয়েই চর্চা করেছেন। বস্তুত, যে-তিন চার পর্বে তাঁর শিল্পীজীবনকে আমরা ভাগ করতে পারি, দেখা যাবে, সেই তৃতীয় পর্যায় থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম-বিমূর্ত প্রকাশবাদ– তাঁর প্রধান স্টইল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কিবরিয়ার প্রকাশবাদ পশ্চিমা– বিশেষ করে আমেরিকান– বিমূর্ত প্রকাশবাদ থেকে ভিন্ন। সে বিষয়টি এই আলোচনা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে।

কিবরিয়ার প্রথম পর্ব ছিল কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরুনো থেকে ঢাকায় এসে স্থিত হওয়া এবং আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার কাজ নেওয়া ও বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৯ সালে জাপান যাওয়া পর্যন্ত। এই পর্যায়ে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট রীতি ও মিনিয়েচার পেইন্টিং, যামিনী রায় ও বেঙ্গল স্কুল– এসবের প্রভাব অনুভব করেছেন, তবে তাঁর ছবির একটি নিজস্ব শৈলী তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন এ-সময়ের মধ্যেই। ওই শৈলীতে প্রকাশভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, রংকে একটি আলাদা সত্তায় নিষিক্ত হতে দিয়েছেন, রেখার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করেছেন, ব্যক্তির দ্বন্দ্বমান ও বহু বিচিত্র মনোজগৎকে একটি আতশ কাচের নিচে রেখে দেখতে চেয়েছেন। এই সময়ের ছবিতে ফিগারেশন আছে, প্রকৃতির চিত্রায়ণ আছে। একই সঙ্গে বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রকাশও রয়েছে। প্রথম পর্বের আঁকা ছবির অনেকগুলোই, নানা কারণে, দর্শকদের জন্য সংরক্ষিত নেই। অনেক ছবি বিক্রি হয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে গেছে। কিছু ছবি নষ্ট হয়েছে। ফটোগ্রাফিক রিপ্রোডাকশন বিষয়টি খুব জোরালোভাবে অনুভব করেননি পঞ্চাশ-ষাটের অনেক শিল্পীই। কিন্তু যেসব ছবির উদাহরণ আমাদের সামনে আছে, তা থেকে প্রথম পর্বের কিছু চারিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়। পশ্চিমা আধুনিকতার প্রকাশ, বিশেষ করে শৈলী, পদ্ধতি বা টেকনিকের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট; কিন্তু পশ্চিমা আধুনিকতায় বহিঃস্থ অভিজ্ঞতার যে গুরুত্ব, তার বিপরীতে তিনি ব্যক্তির (ও বস্তুর)

অন্তঃস্থিত রূপদর্শনে বেশি উদ্যোগী। এই রূপদর্শনের পেছনে কিবরিয়ার প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতারও একটি ভূমিকা আছে। তিনি অবয়বকে, মূর্তিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কিন্তু অবয়বকে শুধু ফর্ম হিসেবে না দেখে তার ভেতরের জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। এজন্য ক্রমশ তিনি অবয়ব ছেড়ে নিরাবয়ব প্রকাশের দিকে ঝুঁকেছেন, রংকে কচ্ছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। পঞ্চাশের দশকে একটি সময়ে কালো রং ছিল তাঁর খুব প্রিয়। ১৯৫৫ সালে আঁকা 'ওষুধের শিশি' (কাঠকয়লা) কালো-সাদার অত্যাশ্চর্য দ্বন্দ্বে একটি বিষণ্নতার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করে। কালো রঙের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছে ধূসর, খয়েরি, হলদে-নীল।

প্রথম পর্বে কিবরিয়া এগুচ্ছিলেন একটি সংহতির দিকে। সেটি শুধু প্রকাশের নয়, চিন্তারও। এজন্য চিন্তার সঙ্গে সমান্তরাল প্রকাশে বিমূর্তায়ন ধীরে ধীরে একটি জায়গা করে নিয়েছে। 'জলকেলি', 'পূর্ণিমা'-এবং এ-ধরনের অনেক ছবিতে বিমূর্তায়ন অবয়বকে মিটিয়ে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারি, কিবরিয়া ঝুঁকছেন ফর্মের বিশুদ্ধতার দিকে, তার জ্যামিতির নানা গূঢ়-কাঠামোর দিকে।

দ্বিতীয় পর্বের শুরু জাপানে তিন বছরের অবস্থানের সময়। জাপানে কিবরিয়ার শিল্পীসত্তা বিকাশের একটি অনুকূল পরিবেশ পায়। প্রথম পর্যায় থেকেই তিনি বস্তুর বাহ্য রূপের আড়ালে এর অন্তর্গত রূপ এবং নিমগ্ন-কাঠামোর সন্ধান করেছেন। জাপানে তিনি লিথোগ্রাফি করেছেন। কাঠ খোদাই করেছেন, জলরঙে কাজ করেছেন। এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি ছবির উপরিতলের পেছনে বিস্তৃত পরিসরকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝেছেন, টেক্সচার, রেখা ও স্পেসকে নতুন উপলব্ধিতে দেখেছেন। স্পেসকে তিনি রঙের সঙ্গে একটি বৈবাহিক সম্পর্কেই ফেলে দেন। জাপানি উদ্যানশিল্প তাঁকে মুগ্ধ করে– প্রতিটি জাপানি উদ্যান তাঁর কাছে মনে হয়েছে এক একটি কম্পোজিশন, যার ভেতরে প্রতিটি জীবন্ত অথবা সৃজিত ফর্ম (গাছ, পুকুর, পুল, ঢিবি) একটি ঘনবদ্ধ আন্তঃসম্পর্কে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। ঘনবদ্ধ, পরস্পর নিবিষ্ট অথচ একটি স্তরে আলাদা ফর্মসকলের বিন্যাস, সারা কম্পোজিশনে এক সাঙ্কেতিক সুমিতি– কিবরিয়ার ছবির এই পরিচিত রূপের আছে জাপানে তাঁর প্রকৃতি ও জাপানি চিত্র-ঐতিহ্যকে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা।

জাপান যাবার আগেই কিবরিয়া অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, বিশেষ করে কিউবিজম তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই সময়ের কোনো কোনো ছবিতে কিউবিজমের কিছু ব্যবহার তিনি করেছেন। তবে, তাঁর নিজের বর্ণনায়, এটি এসেছে 'খুব হাল্কাভাবে', যেন তার আভাসটুকু ধরা যায়। আবার 'তালগাছ ও বাবুই পাখি'র মতো ছবিতে অ্যাবস্ট্রাকশন এসেছে ছবির কাঠামোবিন্যাসে। অন্য আকেটি ছবি, 'পুতুল ও বালক'-এ ফিগারের উপস্থাপনা, রেখার ব্যবহার, সুষম বর্ণলেপন– এসবের মধ্যেই অ্যাবস্ট্রাকশনের ইঙ্গিত আছে। অ্যাবস্ট্রাকশন মানেই যে জ্যামিতি নয়, এ-কথাটি কিবরিয়া জোর দিয়ে বলেন। ফিগারের মধ্যে, রেখার মধ্যে অ্যাবস্ট্রাকশনের চমৎকার খেলা দেখা যায়। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষ-চিত্রের উদাহরণ দিয়ে কিবরিয়া বলেন, তিনি যে-রেখা ব্যবহার করেছেন, যে-কন্টুর ব্যবহার করেছেন, তাতে অ্যাবস্ট্রাকশনের নিকষিত রূপ-তার এসেন্স -ধরা পড়ে।

জাপানে কিবরিয়া প্রথম দুবছর যে-কাজ করেছেন তাতে কিছু ফিগারেশন, কিছু অ্যাবস্ট্রাকশনের একটি সমন্বয় সাধন করেছেন। মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের ঘনবদ্ধতা ও আদর্শায়ন, ডিটেলের কাজে সূক্ষ্ম রূপসৃষ্টি তাঁকে আকর্ষণ করত। আবার কাঠখোদাই করতে গিয়ে টেক্সচার বিষয়টি এক বিচিত্র আবেদন নিয়ে ধরা দিল তাঁর কাছে। জাপানে তিনি শিল্পী হিদেয়ো

হাগিওয়ারার কাছ থেকে কাঠখোদাই শিখেছেন। হাগিওয়ারার কতগুলো বিখ্যাত কাজ ছিল, 'স্টোন ফ্লাওয়ার' (বা পাথরের ফুল) নামে। সেসব ছবিতে হাগিওয়ারার টেকনিক যেমন ছিল পরিণত, তেমনি টেক্সচারের বিন্যাস ধরে রাখার পাশাপাশি কাগজে ছাপ নেওয়ার সময় সাদা-কালোর মৌলিক দ্বন্দ্বটি যাতে বলিষ্ঠ একটি মাত্রায় প্রতিভাত হয়, সেদিকে নজর রাখতেন। ছাপাই ছবি টেকনিকের ব্যাপারে বেশ কঠোর কিছু দাবি চাপিয়ে দেয় শিল্পীর ওপর। জাপান যাবার আগে কিবরিয়া আর্ট ইনস্টিটিউটে লিথোগ্রাফি করেছিলেন। জাপানেও আরো বেশি সময় ও প্রস্তুতি নিয়ে তিনি লিথোগ্রাফির কাজ করেন। কিছু এচিংও করেছেন। তবে তাতে বেশি মনোযোগী হয়েছেন দেশে ফেরার পর। ছাপাই ছবির মাধ্যমে কিবরিয়া তিনটি দিক থেকে বিশিষ্ট– ১. তিনি ছাপাই ছবির প্রতিটি মাধ্যমে তাঁর প্রকরণ বা ম্যাটেরিয়ালের ওপর একটি আধিপত্য বিস্তার করেন; প্রকরণ যেন অনেকটা তাঁর অনুগত সহযোগীতে পরিণত হয়, তিনি প্রতিটি প্রকরণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেন; ২. তাঁর টেকনিকে যাতে কোনো খুঁত না থাকে, তিনি তার প্রতি খুবই যত্নশীল। কাঠের বা পাথরের টেক্সচার, খসখসে জমিন বা (কাঠের ক্ষেত্রে যেমন) জমিনের ফাটল বা খুঁত দক্ষতার সঙ্গে বস্তু/ফর্মসংস্থাপনার কাজে লাগান; এবং ৩. তাঁর ছাপাই ছবিতে স্পেস ও লাইনের ব্যবহার অনেক বেশি অন্তরঙ্গ, ফর্মের বিন্যাস অনিবার্যভাবে ছবির কাঠামোকে গতিশীলতা দেয়। ছাপাই ছবিতে যে-বলিষ্ঠ রেখামাত্রিকতা দেখা যায়, তার উৎসও ওই কাঠামো চিন্তায়। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কিবরিয়ার উদ্দিষ্টকে যে 'সমন্বয়মূলক নির্মাণ, গাণিতিক যথাযথতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,[১] তা তাঁর ছাপচিত্রগুলো দেখলে যথার্থ মনে হবে। তবে, একই সঙ্গে ছবিতে তিনি সাঙগীতিক শুদ্ধতা সঞ্চারেরও প্রয়াসী বলে প্রতীয়মান হবে।

জাপান থেকে দেশে ফিরে কিবরিয়া অ্যাবস্ট্রাকশনের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁর ছবিতে ফিগারেশনের ক্ষেত্রে জ্যামিতির প্রভাব বাড়তে থাকে, ভাঙতে থাকে অবয়বের পরিচিত মাত্রাগুলো। কিবরিয়ার ছবিতে প্রায়শই ফিগারের যে-আনুভূমিক বিস্তার লক্ষ করা যায়, যাতে দৃষ্টি অনেকক্ষণ চিত্রতলে প্রক্ষেপিত থাকে, তার ফলে বর্ণলেপন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর ছবিতে রঙের রয়েছে অনেক ব্যঞ্জনা, অনেক অর্থ। কিন্তু একটি ভঙ্গুর ফিগারকে আনুভূমিক বিস্তারে যখন তা ক্যানভাস জুড়ে বাঙ্ময় করে তোলে, তখন বুঝতে হবে জ্যামিতির সূত্রগুলোর সঙ্গে রঙের একটি সখ্য আছে, দ্বন্দ্বও আছে, তবে শত্রুতা নেই। পুরোপুরি অ্যাবস্ট্রাকশনে যাবার আগে এই কিছুটা কিউবিজম প্রভাবিত, কিছুটা স্যুররিয়ালিজম প্রভাবিত (যার প্রকাশ ছবির আবহসৃষ্টিতে) আধা-বিমূর্ত ফিগারেশন তাঁকে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে। অন্যদিকে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং অবলোকনকে তা বস্তুর বাহ্যিক রূপ থেকে অন্তররূপে নিবিষ্ট করাতে সাহায্য করেছে। অ্যাবস্ট্রাকশন বিষয়টিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন কিবরিয়া। অ্যাবস্ট্রাকশন শুধু কি একটি যুগের চিত্রভাসা, একটি সময়ের দাবি? কিবরিয়া বলেন বটে, তিনি যখন তাঁর ছবিকে নিয়ে যাচ্ছেন নৈর্বস্তুকতায়, তখন বিশ্বজুড়ে শিল্পীরা তা-ই করছেন। কিন্তু এর বাইরেও কিছু কারণ আছে তাঁর ছবিতে বিমূর্ত রীতির বর্তমান প্রাধান্যের। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই পশ্চিমে নগরায়ন, শিল্পায়ন, যান্ত্রিকায়ন– এসবের প্রভাবে মানুষের মনোজগতে এসেছে অনেক পরিবর্তন; যোগাযোগের ভাষায় সুস্থিরতার পরিবর্তে এসেছে অস্থিরতা; ভাষাচিন্তার ক্ষেত্রে উপস্থিতির পরিবর্তে অনুপস্থিতি, ভাষিক নিশ্চয়তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে ভাষার অন্তর্গত অনিশ্চয়তা। মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে, তার সম্পর্কগুলো ভেঙে গেছে, অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কাজেই অনিশ্চিত, একাকী মানুষের পক্ষে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে নিশ্চিত এবং সহজেই শনাক্তযোগ্য কিছু চিহ্ন ও

কোড/ট্রোপ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। ভাষাই যদি অনিশ্চয়তায় পতিত হয়, তাহলে তা নিশ্চিত– চূড়ান্ত তো দূরের কথা– অর্থ কীভাবে উৎপাদন করবে? অ্যাবস্ট্রাকশন মানুষের চিন্তা এবং বোধ অনুভূতির জটিল প্রকাশগুলোকে মূর্ত করতে সচেষ্ট হয় মাত্র। ওই ‘মূর্ত’ করার বিষয়টি বেশ স্ববিরোধী, কিন্তু এক্ষেত্রে মূর্তের পেছনে মূর্তি হচ্ছে একটি শূন্যতা, কিছু আভাস বা চিহ্নের সমষ্টি। অর্থাৎ ‘মূর্ত করা’র নামে মূর্তির এইসব অনুপস্থিতিই হয়ে দাঁড়ায়।

কিবরিয়া ছবিতে যে-অ্রাবস্ট্রাকশন, তাকে এই অনুপস্থিতির আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। যা নেই, তার একটি অভাব যেন থেকে যায়, এবং কেন নেই, সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য কিবরিয়ার বিমূর্ত ছবিতে বেদনা, হতাশা অথবা নস্টালজিয়ার ছায়া দেখা যায়। যদি বাস্তববাদী ছবি উপস্থিতির জানান দেয়, অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি দেবে অনুপস্তিতির। কিবরিয়া নিজেই বলেন, একজন মানুষ ভিড়ের মধ্যেও একা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ একটি গভীর অনুভবের মুহূর্তে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির (বস্তুরও) সংযোগ ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তেমনি শনাক্তযোগ্য, মাত্রাসিদ্ধ, প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তু/ ফর্মের ভিড়েও হঠাৎ যদি একটি একাকিত্বের অনুভূতি আসে তাহলে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যৌক্তিক সম্পর্কগুলো উলটে যেতে পারে। এই অনুপস্থিতির দিকটি বিষণ্নতার, অথবা নির্বেদের। কিবরিয়া এই অনুভূতিকে আঁকেন নীল অথবা ধূসর দিয়ে অথবা বাদামি, অথবা মরিচা-রঙে। তবে অ্যাবস্ট্রাকশন আনন্দ অথবা আবেগের নিকষিত একটি রূপও দিতে পারে। যেখানে অনুপস্থিতিটি হচ্ছে অনুভূতির সঙ্গে প্রথাগতভাবে সংশ্লিষ্ট ইমেজ অথবা প্রতিরূপের। যেভাবেই দেখা হোক, কিবরিয়া অ্যাবস্ট্রাকশনকে এপিফ্যানি প্রকাশের একটি উপায় হিসেবে নিয়েছেন। বাগানের গাছের নিচে বসে ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনতে যদি মনে হয়, এর রূপায়ণ কীভাবে সম্ভব, তাহলে বিমূর্তায়ন ছাড়া উপায় কী? কিবরিয়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, ঝিঁঝির ডাককে যখন তিনি অ্যাবস্ট্রাকশনের মাধ্যমে একটি প্রতিরূপ দেবেন– হয়তো কিছু রং, কিছু টেক্সচার, কিছু ঘনবদ্ধ অথবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ফর্মের মাধ্যমে– তাতে শব্দের একটি ভূমিকা থেকে যাবে। কম্পোজিশনটিতে কান পাতলে যেন ঝিঁঝির ডাক শোনা যাবে।

অ্যাবস্ট্রাকশনে স্থিত হতে গিয়ে বস্তুর বিশুদ্ধ রূপ, এবং ক্লাইভ বেল কথিত ‘সিগনিফিক্যান্ট ফর্ম’কে অন্বেষণ করেছেন কিবরিয়া। বেল বলেছেন, ‘সৃজিত ফর্ম আমাদের এত আপ্লুত করে যেহেতু তা তার স্রষ্টার আবেগকে প্রকাশ করে’।[২] আধুনিক শিল্পী অবশ্য তার নিজেকে নয়, তার ব্যক্তিত্বকে নয়, বরং ব্যক্তিত্বের বিমোচনকেই প্রকাশ করেন– টি এস এলিয়টের এ-উক্তিটি মনে রাখলে ফর্ম-স্রষ্টার নিজস্ব আবেগের প্রকাশ অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে; অথবা, সন্দেহজনক হয়েও তা দেখা দিতে পারে। কিন্তু কিবরিয়ার আধুনিকতার পেছনে তাঁর রোমান্টিক একটি চেতনাও সক্রিয়, যে-রোমান্টিক চেতনাতে বিবৃত নিসর্গ, সৃষ্টির আনন্দ এবং ছবির যারা দর্শক, তারা কিভাবে তা গ্রহণ করবেন, সে-সংক্রান্ত আবেগ। বেলের ভাষ্য অনুযায়ী ফর্ম তখনই ‘গুরুত্বপূর্ণ’ হয়ে ওঠে, যখন প্রকাশ করার মতো কিছু তার থাকে। কিবরিয়া তাঁর ফর্মকে যে-চিন্তা থেকে সাজান, সেই একই চিন্তা থেকে বেছে নেন তাঁর রং এবং রেখার সম্ভার। কাজেই বস্তুর প্রতিরূপ এবং অন্তর-রূপ হিসেবে ফর্ম, ফর্মের জামিতিক বিন্যাস এবং রং ও স্পেসের সঙ্গে তার ক্রিয়াশীল আন্তঃসম্পর্ককে তিনি গুরুত্ব দিতে থাকলেন। কিবরিয়ার ছবিতে জ্যামিতির বিষয়টি এইখানে একটু ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর কাজে এর উপস্থিতি তাঁর ভাবনা ও মননের, তাঁর নান্দনিকতার একটি গভীর ভুবন থেকে। একটি গূঢ় অর্থে কিবরিয়ার জ্যামিতি, তাঁর রংয়ের মতো, একটি নিজস্ব নির্মাণ। তাঁর রং জীবন্ত, কারণ তা জৈবিক; তার একটি প্রাণ থাকে, এমনকি যখন তা নমিত, অনুচ্চকিত, তখনো।

তাঁর জ্যামিতিও সপ্রাণ, ‘নদীর গান’-এ ভেসে যাওয়া অবিন্যস্ত আনুভূমিক ফিগারগুলোকেও যা গতিশীল করে তোলে। কিবরিয়ার জ্যামিতি বস্তুর আয়তনের অন্তঃসূত্রগুলোর প্রতি আগ্রহী নয়, যতটা তার গভীরের, তার ভেতরের দোলাচলের প্রতি। এজন্য তাঁর বিমূর্তায়নের বর্ণনায় এই অন্তর্দৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিমূর্তায়ন বা অ্যাবস্ট্রাকশন যখন কিবরিয়ার মনোযোগ অধিকার করে নিল, তা তাঁর ছবিতে যেন একটি অনিবার্য চিত্রভাষা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করল। অনেকের এরকম ধারণা আছে যে, অ্যাবস্ট্রাকশন, বিশেষ করে প্রকাশবাদী, একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার, একটি তাড়িত, angst-পীড়িত বোধের প্রকাশ, কাজেই তার পেছনে দীর্ঘ চিন্তাভাবনার অবকাশ কম। কিবরিয়ার ছবির দিকে তাকালে তারা একটি ভিন্ন সত্য আবিষ্কার করবেন। কিবরিয়ার ছবিতে ভয়, আতঙ্ক ইত্যাদি আছে বলে দু-এক ভাষ্যকার জানিয়েছেন। কিবরিয়া নিজে বরং বলেন, অনিশ্চয়তা এবং একাকিত্ব, কিন্তু তাঁর কোনো কোনো ছবিতে angst-এর বোধ অনুভব করা যায়। কিন্তু এগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি তাৎক্ষণিকতার পরিবর্তে ক্রমিক চিন্তার প্রকাশ ঘটান। যেমন, নীল রঙের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব শুধু যে বিষণ্ণতার সঙ্গে এই রঙের সম্পর্কে জন্য, তা নয়, অথবা আকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত উৎপ্রেক্ষাগুলোর প্রতিফলন হিসেবেও নয়। এই চিন্তাটি বরং এক ধরনের অনিবার্যতাকেই মূর্ত করে। নীল যেহেতু সবগুলো রঙের মধ্যে সর্বব্যাপী, নীলের ব্যবহারে কিবরিয়া যে-সামঞ্জস্য, যে-অনুপাত আশা করেন, অন্য অনেক ছবিতে কালো অথবা ধূসর রং-ব্যবহারেও তিনি তা করেন, কিন্তু প্রতিটি রঙের পেছনে তিনি একটি বা একাধিক চিন্তাকে সক্রিয় করেন।

একইভাবে, কিবরিয়ার ছবিতে বাস্তবের কোনো ছায়াপাত নেই, এরকম একটি সিদ্ধান্তও অনেকে নিয়ে থাকেন। তাঁর বিমূর্ত ছবিগুলোর সামনে দাঁড়ালে এরকম সিদ্ধান্তগ্রহণ অযৌক্তিক কিছু নয়। কিন্তু কিবরিয়া জানান অন্য কথা এবং কিছুটা নিবিষ্টতা দিয়ে তাঁর ছবি দেখলে একসময় তা বুঝতে আমাদের খুব সমস্যা হওয়ারও কথা নয়। কিবরিয়া বলেন, তাঁর ছবিতে বাস্তব যে নেই, তা নয়, তবে সেটি আছে একটি ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন উপলব্ধিতে। তাকে খুঁজে নিতে হবে। তাঁর মতে, তাঁর ছবিতে তিনি growth বৃদ্ধি এবং decay ক্ষয়ের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যে-কোনো বস্তুর growth ও decay-র সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আছে, সংগ্রাম আছে, শেষ পরিণতি আছে। প্রাণের মতো বস্তুও যে হয়ে-ওঠা এবং বিনাশের চক্রে বন্দি, সে তো বিশ্বজগতের দিকে তাকালেই আমরা অনুভব করি। কিন্তু তাঁর ছবিতে, বিশেষ করে বিমূর্ত ছবিতে, এই চক্রের প্রতিফলন কীভাবে পড়ে? তাঁর একটি ছবির সামনে দাঁড়ালে কীভাবে এই বিষয়টি প্রতিভাত হয়? এর উত্তরে তাঁর ছবির রং ও স্পেস, রেখা ও ফর্ম– এসবের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। কিবরিয়া রং-ব্যবহারে বরাবরই সংবেদী। তাঁর প্রিয় নীল ও ছাই রং প্রায়শই বিষণ্ণতার পাশাপাশি এই ক্ষয়ের বিষয়টিকে প্রকট করে। তবে মরিচা রং অথবা লাল, তাদের মাধ্যমেও ক্ষয়ের অভিবক্তিটি ফুটিয়ে তোলেন কিবরিয়া। তাছাড়া, তাঁর সেই বিখ্যাত টেক্সচারের কাজেও ক্ষয়ের অনুষঙ্গটি তিনি অনেক ছবিতে প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের মতে ‘সত্তর দশকের শেষের দিকে কিবরিয়ার ছবি থেকে... হাসিখুশির অভিব্যক্তি মুছে যেতে থাকে। ভাঙন-জর্জর দেয়ালের মতো হয়ে ওঠে ছবির নানা তল। একটি ক্ষয়ে যাওয়া বেষ্টনকে ঘিরে থাকে আরেকটি ক্ষয়াটে বেষ্টন।’ ‘সবুজ ও সাদা’ শীর্ষক ছবির উদাহরণ দিয়ে খালেদ বলেন, এই ছবিতে যেন ‘ক্ষয়ের অন্তর্বয়ন চলেছে।’[৩] কিবরিয়ার মনোলোকে সমকালীন ইতিহাস, সমাজবিবর্তন অথবা ব্যক্তির ‘বিকার-বিক্ষোভ-ক্লান্তি’র অভিঘাতটি কিভাবে প্রতীয়মান হয়, সে-বিষয়ে তিনি নিজেও

স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি; এ-বিষয়ে তাঁর লিখিত কোনো মন্তব্য বা ব্যাখ্যাও নেই। তবে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে বেশ বোঝা যায়, তিনি এসবের অভিঘাত অবশ্যই অনুভব করেন; এবং তা যে আনন্দের চাইতে নিরানন্দের জন্ম দেয় বেশি, তা-ও প্রতীয়মান হয়। কিবরিয়া সৃষ্টির আনন্দের কথা বলেন, মানুষ তাঁর ছবি কিভাবে গ্রহণ করবে, সে-বিষয়ে উদ্বেগের কথা বলেন, কিন্তু সময়ের এবং ইতিহাসের প্রবাহে যে-দ্বন্দ্ব ও জটিলতা মানুষের আনন্দ হরণ করে সে-বিষয়েও দ্ব্যর্থহীন মনোভাব পোষণ করেন। এই হারানো আনন্দের আবিষ্কার সম্ভব স্মৃতিতে, যে-স্মৃতিতে প্রকৃতির সবুজ-বিন্যাসে সময়ের বিবর্ণতা ঢাকা পড়ে। সবুজ, বিশেষ করে হাল্কা ও শ্যাওলা সবুজ, কিবরিয়ার প্রিয় রং, এবং সেগুলো যখন তিনি কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহার করেন, অথবা ছবির কেন্দ্রবিন্দু/ভরকেন্দ্রে সেই সবুজের স্পর্শ লাগে, তখন বোঝা যায় তিনি হয় প্রকৃতিতে, নয় নস্টালজিয়ার অঞ্চলে, আনন্দের সন্ধান করছেন। তাঁর ছবিতে প্রেম বেশ একটি দূরবর্তী বিষয়: যদি সেটিকে গুরুত্ব দিতেন, তাহলে প্রেমও পারত জাগাতে ওই আনন্দানুভূতি, খালেদ-কথিত হাসিখুশি ভাবটি। তবে শুধু সবুজ নয়, লাল অথবা লালের নানা বর্ণান্তরে তিনি আনন্দের অনুভূতিকে সাজান। এই আনন্দের সঙ্গে তার growth-এর প্রকাশও জড়িত।

বাস্তবতার বহিরাঙ্গ নয়, তার ভেতরের জীবন, তার সারাৎসার– এসব হচ্ছে কিবরিয়ার অনুসন্ধানের বিষয়। কাজেই বাস্তবকে তাঁর ছবিতে খুঁজতে গেলে বস্তুর হয়ে-ওঠার সূত্রকে, যা কিউবিস্ট শিল্পীরা জ্যামিতির নানা বিন্যাসে সংস্থাপন করতেন– এবং এর essence-কে জানতে হবে। একজন শিল্পী যদি এভাবে বাস্তবকে দেখাতে চান, যাতে হয়তো বাস্তবের কোনো প্রতিরূপই দৃষ্টিগোচর হল না, এর কিছু আদর্শায়িত রূপায়ণ, এর সূত্রগুলোকে কিছু চিহ্ন কিছু আভাসের মাধ্যমে মূর্ত করা হল মাত্র, তাহলেও একে অস্বীকার করার উপায় নেই। এককে শিল্পী এককেকভাবে নিজেদের তৈরি করেন। কিবরিয়া বলেন, 'একজন বাদ্যযন্ত্র বাদককে যদি বলা হয়, তুমি গান করো, তাহলে ভারি অন্যায় হবে।' তবে বাদ্যযন্ত্রে যে 'গান' তুলতে পারেন বাদক, তারও তো একটি বৈধতা আছে, রূপ আছে, প্রকাশ আছে। বাদ্যযন্ত্রে বাদ্য বাজানো আর গলা সেধে গান গাওয়া অনেকটা বাস্তববাদী কাজের মতো। তাতে উপস্থিতিটাই প্রধান। কিন্তু গানের ভেতর দিয়ে যদি বাদ্যের বাদনকে ধরা যায় অথবা বাজনা দিয়ে গানের সুরবাণীর যুগলবন্দিকে, তাহলে তা হবে এক ধরনের বিমূর্তায়ন। তার অনেক সম্ভাবনা তখন তৈরি হয়, একটি ভিন্ন দিগন্তে এবং মাত্রায়, যা হয়ে দাঁড়ায় অমিত।

১৯৯৮ সালে, চারুকলা ইনস্টিটিউটে যখন পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব চলছে, মোহাম্মদ কিবরিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এমনি অসুস্থতা ছিল যে, অনেকে তাঁর ফেরার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিন যমে-ডাক্তারে টানাটানি চলল। তিনি ফিরে এলেন। পুরো সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার কাজ শুরু করলেন। বেশ কিছু ছবি আঁকলেন, এবং ২০০০ সালে ঢাকার বেঙ্গল গ্যালারিতে এবং ২০০২ সালে টোকিওর আর্ট ফ্রন্ট গ্যালারিতে একক প্রদর্শনী করলেন। এই প্রদর্শনী দুটি তাঁর নতুন একটি পর্যায়ের উন্মোচন করল। এই পর্যায়টি আসলে তৃতীয় পর্যায়টিরই একটি সম্প্রসারণ, কিন্তু মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা তাঁর দর্শনকে যে একটি সংহতি দিয়েছে, মাটি ও জীবনের অনেক কাছাকাছি করেছে, এই বিষয়টি কাজ করেছে ছবিগুলোর পেছনে। যাঁরা এই প্রদর্শনীদুটির অন্তত একটিও দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, এসব ছবিতে ক্ষয়ের চাইতে বৃদ্ধি যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিষণ্ণতার চাইতে জীবনানন্দ যেন বেশি উঁকিঝুঁকি মারে তাঁর ছবিতে। যে-হাসিখুশি ভাবটি চলে গিয়েছিল সত্তরের দশকের

শেষদিকে, সেটি যেন আবার ফিরে এসেছে, এবং কী আশ্চর্য– অথবা হয়তো আশ্চর্যের কিছু নয়, এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক এই সংবেদী শিল্পীর ক্ষেত্রে– মৃত্যুর একেবারে সামনে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজ করেছে অনুঘটকের।

এই পর্যায়ে কিবরিয়ার জীবনদৃষ্টি অনেক প্রসারিত হয়েছে। তিনি যে আনন্দকে– কাজের এবং কাজ যে বোধ-অনুভূতি-ভাবনাকে প্রতিফলিত করে তার আনন্দকে– নতুন একটি অনুভবে সাজাতে চাইছেন, সেটি বেশ বোঝা যায়। কিন্তু, তাঁর ভাষায়, ক্ষয়কেও, তিনি এড়িয়ে যেতে চান না, যেহেতু বৃদ্ধি ও ক্ষয় একটি চক্রের মধ্যে স্থিত। তবে এই ক্ষয়ের সঙ্গে নেতির সম্পর্কের মাঝখানে কিবরিয়া কিছুটা ইতির বার্তা ঢুকিয়ে দেন। ক্ষয় আছে বলেই বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়, কাজেই ক্ষয়ের পুরোটাই নেতি নয়– এরকম একটি চিন্তা আছে এই বার্তার অভ্যন্তরে। আগে, ষাট-সত্তরের দশকে, মৃত্যুচিন্তা এবং নিঃসঙ্গতাকে যেভাবে ধূসর ও নীল রং, দ্বন্দ্বমান ফর্ম, বিন্দুর ও আঁকিবুঁকির বুনোট, অথবা স্পেসের উদাসী উদ্ভাসে তুলে ধরতেন, এখন সেই প্রয়োগটি অনেকটাই যেন অনুপস্থিত। রংয়ের চিন্তায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, টেক্সচারও এখন অনেকটা অতীব্র: কিন্তু বড় যা ঘটেছে, তা হচ্ছে, আগের তাড়াটি যেন আর নেই। নিজের পরিপার্শ্বের কাছে এখন তিনি অনেক বেশি সংহত।

এই পর্যায়ে কিবরিয়া মিনিমাইজেশনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছেন। ফর্মের ব্যাপ্তি কমিয়ে, স্পেসের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে, টেক্সচারের ক্ষেত্রটি আরো বেশি ক্রিয়াশীল করে তিনি তাঁর ভাবনা বা অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। একটি ছবিতে আগে যতটা সক্রিয়তা থাকত, এখন ততোটা নেই– এর ফলে তাঁর ছবির দর্শকের ওপর বাড়তি একটি দাবিও পড়ছে, এবং তাদের আরো বেশি সংযুক্তি যেন ছবিগুলো আশা করে। এই পর্যায়ে প্রকরণের সৌন্দর্য সম্পর্কেও নতুন কিছু চিন্তা করছেন কিবরিয়া। যে-প্রকরণে, যে-ম্যাটেরিয়ালে, কাজ করেন, তার সম্পূর্ণ ব্যবহারটি তিনি নিশ্চিত করতে চান, তাকে আরো ভালোভাবে জানতে চান তিনি। ২০০০ ও ২০০২ সালের দুটি প্রদর্শনীতে কিবরিয়া কিছু কোলাজ উপহার দিয়েছিলেন। আগেও তিনি কোলাজ করেছেন, এবং ওই মাধ্যমের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে কোলাজ শুধু প্রকরণের সৌন্দর্যকে তুলে আনার প্রয়াসকে নয়, অথবা এর টেকনিকের সম্ভাবনাগুলোকে আদায় করে আনার চেষ্টাকে শুধু নয়, বরং কোলাজ প্রক্রিয়ায় ফর্মকে নতুনভাবে আবিষ্কারের জন্যও যে এই মাধ্যমকে তিনি বেছে নিয়েছেন, সেই তথ্যটি জানিয়ে দেয়। কোলাজে যে পেইন্টিংয়ের প্রভাব পড়বেই, তা নয়, কিন্তু পেইন্ট বা রঙের একটি নতুন ব্যাখ্যা তিনি অবশ্যই আদায় করে নেবেন, প্রকরণ থেকে (এক্ষেত্রে কাগজ) টেক্সচারটি পুরোপুরি বের করে নেবেন। একসময় যে-নিষ্ঠা নিয়ে তিনি ছাপাই ছবি করেছেন, যার উদ্দেশ্যও ছিল একই রকম, এখন কোলাজ চিত্রেও তিনি প্রায় তা-ই করছেন। যেমন– ম্যাগাজিনের চকচকে মলাটে, যার রং কালো, তিনি রং চড়ালেন। ওই রং ভিন্ন একটি রং বের করে আনবে, তাতে ম্যাট ফিনিশিং দিলে তার অভিঘাতটিই পাল্টে যায়। অর্থাৎ প্রকরণ নিয়ে খেলা করার একটি বড় সুযোগ কোলাজ চিত্র, যেখানে ফর্মে অন্তঃস্থিত রূপান্বেষণ এবং মিনিমাইজেশনের চর্চা– সব একই সঙ্গে করা যায়।

এই পর্যায়ে কিবরিয়া যেন ধরিত্রীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ধরিত্রীর রংগুলো তাঁকে যেন নতুনভাবে আকর্ষণ করছে। কালো ও ধূসর কিছু ছবি তিনি দিয়েছিলেন এ-প্রদর্শনীতে, এবং তাঁর রংসম্ভারে এগুলোর যে-গুরুত্ব, তা আরেকবার প্রমাণিতও হয়েছে। কিন্তু কমলা, সবুজ ও লাল এবং লাল মাটির রং– এসব একটি প্রায় বর্ণিল ভুবনই তৈরি করে ফেলে, অথচ আমরা জানি, কিবরিয়ার

ভুবন কখনো আহ্লাদিত বর্ণিল নয়। তবে এই উজ্জ্বল রঙের উপস্থিতি, আবারও, কিছুটা উদ্বেগেরও সৃষ্টি করে, যেন, মৃত্যুর নিকট থেকে ফেরা একজন শিল্পী বলছেন, খুব ক্ষণস্থায়ী এই রং। যতদিন থাকবে– প্রকৃতিতে, জীবনে– সেগুলোকে অনুভব করা যায়। প্রকৃতিচ্যুত হলে তাদের আর তেমন বড় কোনো প্রভাব থাকে না। অবশ্য, কিবরিয়া তাঁর কোনো ছবিতে মূল্যবিচারে নামেননি। দর্শককে বলার চেষ্টা করেননি, জীবন ওইখানে নেই, অথবা এইখানে আছে। তাঁর ছবির সুর নমিত, কোনো কোনো ছবিতে তা ধ্যানী।

কিবরিয়ার এই শেষতম পর্যায়ে জ্যামিতির মধ্যে একটি ছন্দিত সুষমা এসেছে, জ্যামিতিও যেন বিমূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন বস্তুর ভেতরের সারটাকে ছেঁকে আনতে গিয়ে তিনি কোনো অদেখা তারে হাত দিয়েছেন, আর বাজনা বেজে উঠেছে। এই ছন্দ অবশ্য তাঁর আগের পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক সময় এরকম একটি প্রশ্ন যদি তিনি করতেও পারতেন, 'কতটা জ্যামিতি আর কতটা ছন্দ'?– এখন এর উত্তর নিজ থেকেই যেন তৈরি হয়ে যায়। জ্যামিতি আর ছন্দে মৌলিক কোনো গোল নেই, তাদের ভেতর অনুপাতসূচক কোনো বিচারবিরোধ নেই। বরং জ্যামিতিকে যখন একটি ফর্মগত শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সাংগীতিকতা তখন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এ-কাজটি শ্রেষ্ঠ কিউবিস্ট শিল্পীরা করেছেন, এবং এর নাম দিয়েছেন 'সার সান্নিপাত'। বস্তুর সার মাত্রাবদ্ধ বহিরাঙ্গের অনেক গভীরে আবিষ্কার করতে হয়, কিন্তু সংগীত সেই গভীরতাকে বহিরাঙ্গেই বাঙ্ময় করতে পারে। কিবরিয়ার ছবিতে, বিশেষ করে নব্য-প্রকাশবাদী বিমূর্ত ছবিতে, প্রকাশ-ভাষাকে বিশুদ্ধ রূপে ছেঁকে আনতে গিয়ে তিনি আসলে বস্তুর একেবারে ভেতরের জীবনে ঢুকে পড়েন। রসায়নশাস্ত্র যেমন বস্তুর মৌলিক কাঠামোকে কার্বনের একটি কাঠামোয় সাজায়, তেমনি কিবরিয়া একে সাজান একটি বিশুদ্ধতার নির্মাণ-কাঠামোয়। এই বিশুদ্ধতা শেষবিচারে সাংগীতিক, যেহেতু অমিল থেকে মিলে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে প্রবেশের জন্য এক বিরাট হার্মনি বা একতার-তানকে তিনি বাজান, যা এই ক্রস-ওভার অভিজ্ঞতাকে মূল্যবান করে তোলে।

চতুর্থ বা শেষতম পর্যায়ের কিবরিয়া বাংলাদেশের চিত্রভাষার বৈচিত্র্যের কাছে আরেকবার ফিরে যেতে চাইছেন। তিনি জানেন এই চিত্রভাষায় নন্দনচিন্তা একটি প্রতীকী ফর্ম-পরিকল্পনাও বটে। কিন্তু নন্দনচিন্তায় মূল এবং নকল এই বিভাজনটিও অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের সন্ধানে মূলের ভূমিতে পা রাখলেই সম্পূর্ণকে জানা হয়ে যায় না, সেজন্য বিপরীতের খোঁজ করতে হয়; মূল-অমূল, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ এরকম নানা দ্বিত্বে চিন্তা-ভাবনাগুলো বাজিয়ে একটি দ্বান্দ্বিক সমাধানে দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিবরিয়ার ছবিতে এই দ্বিত্বতা– এই দ্বান্দ্বিকতা– এখন অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। এজন্য তাঁর ছবি মানে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল ভাবনা/অনুভব/ কল্পনার অঞ্চলও বটে।

দুই

কিবরিয়ার ছবিতে রঙের পরে স্পেস এবং কাঠামো, অতঃপর টেক্সচার নিয়ে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে। এমন নয় যে কিবরিয়া ছাড়া অন্য কারো ছবিতে টেক্সচারের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথবা টেক্সচারের সম্ভাবনাকে তাঁর আগে অন্য কেউ এতটা কাজে লাগাতে পারেননি। বাংলাদেশের অনেক শিল্পীর কাজে টেক্সচার চিত্রভাষার একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। বর্ণলেপনে সবটা বলা/দেখানো না গেলেও টেক্সচার সেই অভাবটি অনেক ক্ষেত্রে পূরণ করে। কিবরিয়া বলেন, টেক্সচারের দুটি রূপ আছে– প্রথমত টেক্সচার হচ্ছে প্রকরণের। রঙের টেক্সচার মসৃণ অথবা অমসৃণ হতে পারে, তবে খসখসে নয়। সেই মসৃণ বা ফ্ল্যাট চিত্রতলে টেক্সচারের সাহায্যে

রিলিফের একটি অভিজ্ঞতা তৈরি করা যায়। চিত্রতলে তখন টেক্সচার উঠে/জেগে থাকে, তাতে ক্যানভাসে গভীরতা বাড়ে, পরিসর বাড়ে, এবং কম্পোজিশন অর্থপূর্ণ হয়। তবে দ্বিতীয় একটি অর্থে টেক্সচারকে দেখা যায় আলো ও ছায়ার একটি বিভ্রম হিসেবে। টোনের বৈচিত্র্যেও টেক্সচার তৈরি হয়। এভাবে ছাপাই ছবিতে কাঠ বা পাথরের নিজস্ব বস্তুগত টেক্সচারের বাইরেও গভীর ও অগভীর রেখা, আলোর বণ্টন ইত্যাদির মাধ্যমে টেক্সচারের অনুভব তৈরি হয়। অর্থাৎ টেক্সচার বিষয়টি একই সঙ্গে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত– বাস্তব এবং বিভ্রম। কিবরিয়ার ছবিতে টেক্সচারের কাজ অনেক: চিত্রতলকে গভীরতা বা ব্যাপ্তি দেওয়া; ছবির চিন্তাকে পরিব্যাপ্ত অথবা সংহত করা; দৃষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং নির্ভুলতার দাবিকে খণ্ডন করে অসম্পূর্ণতা এবং অনির্দিষ্টতার দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা; একটি নির্দিষ্ট, সুনির্ণীত চিত্রতলে বিভ্রমের অনুভূতির যোগান দেওয়া। অ্যাবস্ট্রাকশনের পেছনে যে উপস্থিতি-অনুপস্থিতির যুগ্ম প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, টেক্সচার সেরকম একটি কাজ করে থাকে। এর উপস্থিতির বিষয়গুলো শনাক্ত করা সহজ– আবেগ/চিন্তা/ভাবনাকে টেক্সচার সংহত করে, এর ওপর জোর দেয়। কিন্তু টেক্সচার একই সঙ্গে অনুপস্থিতির একটি অনুভতিরও জাগায়। এই অনুপস্থিতি– যা নেই তার– আলোর বণ্টন নির্ভর হলে, অন্ধকারের; প্রকরণের বিশেষত্ব-নির্ভর হলে, যে-সম্ভাবনাগুলো মূর্ত হয়নি, তার। যখনই বিভ্রমের প্রশ্ন আসে, প্রকৃত-অপ্রকৃতের তফাৎ নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। কিবরিয়া তাঁর ছবিতে টেক্সচারের সাহায্যে কম্পোজিশনের বুনোট ঠেসে দেন, একটি বিশেষ ভাবনা/চিন্তাকে একট অনুপরিসরে দেখতে সচেষ্ট হন। একই সঙ্গে, যে সমান বা ফ্ল্যাট চিত্রতলের বিপরীতে এর অবস্থান এবং বৃদ্ধি, সেই সমান চিত্রতলে যেসব বিষয় উপস্থিত নেই– যেমন গতিশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা– সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করেন। কিবরিয়ার ছবিতে টেক্সচার একটি বিশেষ মনোযোগের অঞ্চল শুধু নয়, বরং পুরো কম্পোজিশনের ভেতরের দ্বান্দ্বিকতারই ইঙ্গিতবহ।

তিন

একটি ছবি শুরু করতে গিয়ে কিবরিয়া অনুভব করেন, তাঁর ছবি শুধ একটি চিন্তা অথবা অনুভূতিকেই প্রকাশ করবে না, বরং তা ব্যক্তির নিগূঢ় মানসিক অবস্থারও প্রতিফলন ঘটাবে। ছবির পেছনে চেতন-অবচেতনের একটি যুগ্ম ক্রিয়া থাকে, অচেতনের নানা ইঙ্গিত থাকে। সেগুলোর একটি ব্যাখ্যা না হলেও অন্তত প্রকাশটা থাকা দরকার। এই অচেতন/অবচেতন বিষয়টি কিবরিয়ার ছবির জন্য জরুরি। এক্সপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদী ছবি– ফিগারধর্মী অথবা বিমূর্ত, যে-কোনো শ্রেণিরই হোক– ব্যক্তির মনোজগতের যেসব টানাপোড়েন, তার সংক্ষুব্ধতা, হতাশা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়, তার নৈর্বস্তুক উপস্থাপনা একটি দুরূহ ব্যাপার। কিবরিয়া সে-কাজটি সফলভাবে করেছেন। তবে একটি বিশেষ রীতিতে চিত্রচর্চার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবার পেছনে কিছু কৃত্রিমতা থাকে, রিপ্রেজেন্টেশনটি তখন অপ্রকৃত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ছবিতে এই সমস্যাটি নেই।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কিবরিয়ার রঙের মধ্যে যে-'সমন্বয় ও প্রশান্তি'র লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন, সেটি তাঁর শেষ পর্যায়ের কাজে সহজভাবেই প্রযোজ্য। সমন্বয়টি, আগের মতোই, ব্যক্তির সঙ্গে সময়ের, অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যাশার। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজের সঙ্গে জগতের সমন্বয়ও। আর একটি শৈল্পিক তলে কিবরিয়ার সমন্বয় তাঁর কম্পোজিশনের সকল উপাদানের ভেতরে, প্রকরণের সঙ্গে প্রয়োগ-কুশলতার। প্রশান্তির বিষয়টি অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। কিবরিয়ার ছবিতে প্রশান্তির মানসিক দিকটির বাইরেও একটি দার্শনিক, এমনকি অস্তিত্বসূচক

ইঙ্গিতও আছে। আগে 'চন্দ্রাহত ঘোড়া' বা 'গোরস্তানে নৃত্য'-পর্যায়ে একটি পরিব্যাপ্ত বিষণ্নতাবোধ ছিল তাঁর কাজে একটি পরাবাস্তব বিষাদের দ্যোতনা ছিল। এখন সেটি পেছনেই ফেলে এসেছেন তিনি। তবে বিষণ্নতা যে নেই তা নয়, আছে। তার নীল রং আছে, স্পেসের পরিচর্যায় একটি সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তিবোধের প্রকাশও আছে, অনুপস্থিতির একটি অনুভূতিও আছে। কিন্তু ছবিগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, কোথাও যেন একটি প্রশান্তির ছোঁয়া লেগে আছে। সে-শুধু রং নয়, শুধু ফর্মের নান্দনিক সংস্থাপন নয়, বরং এসবের সম্মিলিত একটি ব্যঞ্জনা।

চার

মোহাম্মদ কিবরিয়ার মতো করে কেউ কেউ ছবি এঁকেছেন, এখনো আঁকছেন বাংলাদেশে; তার প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের চিত্রকলার চর্চায় একটি গভীরতা এনেছে। তাঁর রং-ব্যবহার, তাঁর ফর্মসংস্থাপন, তাঁর স্পেসের ব্যাপ্তি, তাঁর টেক্সচারের কাজ– এ-সবই বাংলাদেশের চিত্রকলার আধুনিকতার উত্থানপর্বের দিকচিহ্ন। এগুলো তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য বটে, তবে, সেই সঙ্গে, বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যও হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো। তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে-প্রাণ খোঁজেন, অথবা নিমগ্নতা, অথবা বিষাদ, তাতে আধুনিকতার ধারণাটি সপ্রাণ হয়ে দাঁড়ায়– যান্ত্রিকতা-পিষ্ট, জরা-পীড়িত, রুক্ষ ও পতিত জমির সঙ্গে সমার্থক নয়। পশ্চিমা আধুনিকতার ভেতরে রোমান্টিকতার একটি অনুভব বেশ সমান্তরালভাবে, বেশ প্রবলভাবে অনুভব করতে পারি। কিবরিয়ার পরোক্ষ যে-প্রভাব, তা রংকে নতুন করে বোঝার, প্রকৃতিকে নতুন চোখে দেখার এবং ফর্ম, টেক্সচার ও কাঠামোবিন্যাসে সৃজনশীলতা ও কল্পনাকে একই জায়গায় যুক্ত করার উদ্যোগ তৈরিতে সুস্পষ্ট। কিবরিয়া আমাদের চিত্রজগতের শামসুর রাহমান, অথবা শামসুর রাহমান আমাদের কাব্যভুবনের কিবরিয়া। দুজনেরই আধুনিকতার রূপান্বেষণে নেমে রোমান্টিকতার অনুভূতিগুলোকে নতুন করে বাজিয়ে দেখেন। তাতে যে-ভাষা তৈরি হয়, যে-শৈলী দাঁড়িয়ে যায়, তা আধুনিক হলেও আন্তরিক, নৈর্বস্তুক হলেও বস্তুকে তা অস্বীকার করে না। ব্যক্তির ভেতরের জগৎটিকে নানান দিক থেকে দেখতে তা আগ্রহী, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তার রচনা। এই চিত্রভাষাটি আকীর্ণ-উৎপ্রেক্ষায়, চিত্রময়তায়, ভাবার্থে, অনুভবে, কিন্তু তা কখনো অস্পষ্ট নয়। কিবরিয়া কী বলতে চান, বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। শিল্পকলা ক্রমশ দুরূহ ও দুর্বোধ্য হচ্ছে, এরকম একটি অভিযোগ শুনতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কিবরিয়ার দুরূহ ছবিও দুরূহ নয়, বস্তুত তাকে দুর্বোধ্য বলে যে ভাববে প্রথমে, সে-ও তার অর্থটি একসময় আবিষ্কার করতে পারবে। যেহেতু কিবরিয়ার চিন্তা দূরস্থিত নয়, এবং তাঁর শিল্পভাবনার প্রকাশগুলো তাঁর ছবির বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়েও তাঁর প্রকরণ, টেকনিক সর্বত্রই দৃশ্যমান।

কিবরিয়ার কাজে আধুনিক নগরজীবনের নির্বেদ আর ক্লান্তিকে যতটা পাওয়া যায়, তারও বেশি পাওয়া যায় প্রকৃতির ভিতরের সুর আর স্পন্দন, এবং মানুষের ওপর এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে, তার নানা বোধ-অনুভূতিকে। এই বহু বোধ সঞ্চারী ছবি আঁকা খুব বেশি শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

সূত্র

১. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'মোহাম্মদ কিবরিয়া,'
চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ : ৬৮ ।
২. ক্লাইভ বেল, আর্ট, লন্ডন, ১৯১৪ : ৪৯ ।
৩. মইনুদ্দীন খালেদ, "কিবরিয়ার বীক্ষণ : নৈঃসঙ্গের
ব্যবচ্ছেদ", বাংলাদেশের চিত্রশিল্প, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০০ : ৭৪ ।

[লেখক: প্রাবন্ধিক । অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।]

প্র ব ন্ধ

এস. এম. সুলতান: বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা

শ ও ক ত হো সে ন

শেষ পর্যন্ত শক্তিমানের বিজয় ঘটে এবং জনমত বিজয়ীর পক্ষে এসে একাত্ম হয়; ইতিহাস ধাবিত হয় শক্তিমানের দিকেই। বাঙালির অনন্য শক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এদের ভাষা-শক্তির স্বরূপ অন্যতম; এ-ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মত রয়েছে, তবে যতদূর প্রমাণ মেলে তাতে মীননাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক। মীননাথ-এর কারণে সহজেই বোঝা যায়, বাংলাভাষা কতটা পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী। এ-ছাড়া হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে লেখা *চর্যাগীতি* কিংবা *ময়মনসিংহ গীতিকা* এ-ভাষাকে করেছে আরও শক্তিশালী। ঐতিহ্যিক এই শক্তিকেই এস.এম. সুলতান নিজের মননে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবয়বিক আধার হিসেবে পুষ্ট করে তুলেছিলেন আরেকটি ভিন্ন মাধ্যমের মধ্যদিয়ে।

এস. এম. সুলতান বাঙালিকে বলশালী বা শক্তিমান রূপে দেখার মধ্যদিয়ে মূলত বিশ্ববাসীকেই শক্তির পয়গাম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন তাঁর চিত্রশিল্পে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি; আদিম বাঙালি মীননাথ কি রুগ্‌ণ ছিলেন? নাকি সুলতানের কল্পনার মানসজাত স্বাস্থ্যশালী বলিষ্ঠ কোনো মানুষ ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় খানিকটা নৃতাত্ত্বিক পথে খোঁজখবর করবার চেষ্টা করে দেখা যাক–

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে হিন্দ-ইউরোপিয়ান (Indo-European), শামী (Semitic), হামী (Hamitic), দ্রাবিড় (Dravidian) প্রভৃতি নানাজাতীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পৃথিবীর প্রায় সকল শব্দ একই মূল হিন্দ-ইউরোপিয়ান শব্দ হতে উৎপন্ন'। পশ্চিম বাংলার প্রথাবিরোধী ভাষা-গবেষক কলিম খান তো বলেছেনই, পৃথিবীর সকল শব্দের মূল উৎস ভারতবর্ষ এবং সেটা সংস্কৃত (তথা পরবর্তীকালের বাংলা ইত্যাদি) থেকে। আর মীননাথ তো বাঙালি ছিলেন; দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন এবং যোগী সম্প্রদায় নাথ পন্থী ছিলেন; উল্লেখ্য আদিনাথ শিব, তার পরপরই কিন্তু মীননাথ-এর আবির্ভাব। নৃতাত্ত্বিক খোঁজ-খবর করে জানা যায় এরা বলশালী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিন দিক থেকে; শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং ভাষাগত দিক থেকে। শারীরিকভাবে শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন সেটা আদিকালীন পটচিত্র কিংবা গাজীর পটের মধ্যে বাঘের পিঠে মানুষ চড়ার দৃশ্য দেখে বোঝা যায়; তাছাড়া মাটিতে ফসল ফলানো, নদী বা সাগরে মাছশিকার ইত্যাদি কাজ তো রুগ্‌ণ মানুষ দিয়ে সম্ভব নয়; অন্যদিকে যোগীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক উপায়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের মনের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা; সে-কারণে প্রাচীন-বাঙালি প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এবং প্রকৃতির সাহচর্যে যেমন বেঁচে ছিল একইভাবে নিজের মনস্তত্ত্বকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত; এমনকি ছোট-খাট অসুখ-বিসুখ তো বটেই বড় বড় অসুখ-বিসুখও সারিয়ে ফেলত তারা নিজের মনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে এবং অ্যাকুয়া প্রেসার-পদ্ধতির মাধ্যমে তারা এমনসব অসুখের চিকিৎসা প্রাচীনকালে অনায়াসে করত যা করার জন্য এখন বড় বড় হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারগুলোকে কাঁটাছেড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতসব কথা বলার অর্থ হল, শিল্পী এস. এম সুলতানের চিত্রের সঙ্গে আদি বাঙালির ঘনিষ্ঠতম মিল খুঁজে পাওয়া যায়; সুলতান তাঁর চিত্রে পেশির ভেতর দিয়ে, গোটা গোটা মাংসপিণ্ডের ভেতর দিয়ে, প্রশস্ত কপোল, বাহু, সুঠাম গ্রীবা, পীনস্তনী আদল, হাঁটু, তীক্ষ্ণ কনুই টানটান ঘাড়ের ভেতর দিয়ে প্রাচীন বাঙালির শারীরিক ও মানসিক সেই শক্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বদরবারের সামনে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা শুরু করে থাকেন গৌতম বুদ্ধের সমকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। এর কারণ সম্ভবত এই, তার আগের সময়ের মধ্যে আলোর তুলনায় অন্ধকারের পরিমাণটাই বেশি থাকায় সচরাচর আলোচনার মধ্যে সেই সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে বাঙালির কেবল হাজার বছরের ইতিহাসের কথাই বলা হয়ে থাকে; ইতিহাসবিদগণ হাজার বছর আগের বাঙালি কী ছিল, তার রাজনীতি কী ছিল সেটা আলোচনায় উৎসাহী হয় না। সে-কারণে শিল্প-সাহিত্যেও সেই সময় নিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উহ্য থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল হাজার বছর পূর্বে কি বাঙালির রাজনীতি, সমাজনীতি ছিল না? অবশ্যই ছিল। এস. এম. সুলতান তারও একটি সমাধানের পথ টানতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ বাঙালির স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে; তাঁরই প্রচ্ছন্ন প্রতিকৃতিরা অপেক্ষমাণ আবার ক্ষমতায়নের ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে!

দুই.

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের ১০ তারিখ নড়াইলের মাছিমদিয়ায় এস. এম. (শেখ মুহম্মদ) সুলতানের জন্ম। দরিদ্র রাজমিস্ত্রি বাবার একমাত্র পুত্র সুলতানের ডাক নাম ছিল লাল মিয়া। বাবাকে রাজমিস্ত্রির কাজে সহযোগিতা করার ফাঁকে খেলার ছলে ছবি আঁকতে শুরু করেন তিনি।

১৯৩৮ সালে নড়াইল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন।

১৯৪১ সালে একাডেমিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও আর্ট কলেজে সুলতানের ভর্তির ব্যবস্থা হল;

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, তিন বছর কলকাতা আর্ট কলেজে সুলতান পড়াশুনা করলেন; প্রথম বছরে দ্বিতীয় ও পরবর্তী দু'বছর ক্লাসে প্রথম হলেন।

১৯৪৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা আর্ট কলেজ ত্যাগ করেন। কিছুকাল যত্রতত্র ভ্রমণের পর তিনি কাশ্মীরের পাহাড়ে একদল আদিবাসীর মাঝে বসবাস শুরু করলেন এবং চারপাশের মানুষ ও তাদের জীবন নিয়ে অনেকগুলো ছবি আঁকলেন।

১৯৪৬ তে কাশ্মীর থেকে সিম্‌লা গেলেন; সেখানে সুলতানের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে যান এবং পরে করাচিতে অবস্থান করেন। এ-সময় নাগী, চুগ্‌তাই, শাকের আলি, শেখ আহমদ প্রভৃতি শিল্পী ও পণ্ডিত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। একজন শিল্পী হিসেবে করাচিতেই প্রথম খ্যাতি লাভ করেন সুলতান।

১৯৪৮ এ লাহোরে প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়;

১৯৫০: চিত্রশিল্পীদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য তিনি আমেরিকা গমন করেন। তখন নিউইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন, শিকাগো প্রভৃতি জায়গা ঘুরে বেড়ান এবং চিত্রপ্রদর্শনী করেন। এরপর ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। লন্ডনে বেশ কয়েকটি একক প্রদর্শনী করেন এবং কয়েকটি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। সে সময় তিনি ভিক্টোরিয়া এমব্যাকমেন্ট-এ অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট সমকালীন শিল্পীদের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, পাবলো পিকাসো, সালভেদর দালি, পল ক্লি, ব্রাক প্রমুখের মতো খ্যাতিমান শিল্পীদের পেইন্টিং-এর পাশে এশিয়ান শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র সুলতান-এর ছবিই উক্ত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের গৌরবের অধিকারী।

১৯৫৩ সালে জন্মভূমি তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের নড়াইলে ফিরে এলেন। গ্রামের শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলার শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন– নন্দনকানন প্রাইমারি স্কুল, নন্দনকানন হাই স্কুল ও নন্দনকানন ফাইন আর্ট স্কুল।

এরপর ১৯৬৭ সালে নড়াইল সদরে স্থাপন করলেন কুড়িগ্রাম ফাইন আর্ট স্কুল।

১৯৭৩ সালে যশোর শহরে গড়ে তুলেন 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে যার নাম 'চারুপীঠ'।

১৯৭৬ সালে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সুদীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর সুলতানের এক চিত্রপ্রদর্শনী হয়।

১৯৮২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সুলতানকে 'ম্যান অব এশিয়া' ঘোষণা করে।

১৯৮৭ সালে সুলতানকে বাংলাদেশ সরকার 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স'-এর সম্মানে ভূষিত করে। ওই বছর ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজন করে সুলতানের একক চিত্রপ্রদর্শনী।

তিন.

আহমদ ছফা তাঁর 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্যঃ সুলতানের সাধনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শেখ মুহম্মদ (এস. এম.) সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্টা পীনস্তনী এ-সকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সৃজনলীলায় মত্ত, অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ-জাগানিয়া এ-সকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এ-সকল সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরোম তুলতুলে এ-সকল শুভ্র শান্ত ভোর, হিঙুল বরণ মেঘ-মেঘালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাঁকের নদীতীরের এ-সকল দৃষ্টি-শোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউ খেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাঁকা মেঠো পথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এ-সকল সরল আটচালা, এ-সকল আহ্লাদী বাছুর এবং পরিণতবয়স্ক গবাদিপশু, সর্বোপরি গোটা জনপদের জনজীবনে প্রসারিত উৎপাদন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকলারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-ঘামের ঝঙ্কার, চেষ্টার সংগীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশগঙ্গার কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়ছে।" ছফা উপরিউক্ত কথাগুলো সুলতানের ছবি সম্পর্কে এমনিতে বলেননি, ছফাও একজন সিরিয়াস জীবনদর্শী মানুষ হিসেবে আরেকজন বহুসিঁড়ি-ভাঙা সুলতানকে দেখেছেন এভাবে, "সুলতানকে বাঙলার প্রকৃতিতে, বাঙলার ইতিহাসে এবং বাঙলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং শিল্পী জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তা-ও কম বিস্ময়কর নয়।" শিল্পবোদ্ধা, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিক আহমদ ছফার মতে, 'গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লেগেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার একটা দুর্বার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাহিদা : জাতীয় সাহিত্য চাই, জাতীয় বিজ্ঞান চাই, জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাণিজ্য চাই।'

ছফার এই উক্তির দাবি অনুসারে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে জাতীয় শিল্পের প্রয়োজন অনেকটাই পূরণ করেছিলেন দু'জন বাঙালি মুসলিম শিল্পী; এঁদের একজন হলেন জয়নুল আবেদিন আর দ্বিতীয় জন এস.এম. সুলতান। এখানে 'মুসলিম' শব্দটি উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি না-শেখা, পশ্চাৎপদ, ধর্মান্ধ একটি জাতি হিসেবে মুসলমানের পক্ষে অন্যান্য শিল্পের মতো চিত্রশিল্পেও মানুষের অস্তিত্বের জানানকে সার্থক করে ফুটিয়ে তোলা– সেই সময়ের জন্য নিঃসন্দেহে ছিল বিস্ময়কর; যা অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করে দেখিয়েছেন জয়নুল ও সুলতান। তবে সার্বিক বিচারে উল্লেখ্য যে, 'নন্দলাল বসুই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে প্রকৃত অর্থে সার্থক বাঙালি চিত্র-শিল্পীর শিরোপা দেয়া যেতে পারে।' 'যামিনী রায় দেশীয় রীতিতে ঐতিহ্যনির্ভর মনোমুগ্ধকর অঙ্কনশৈলীর উদ্ভাবক এবং বাঙলার একান্ত ঘরোয়া চিত্রশিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' 'শেখ সুলতানের মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, প্রমুখ শিল্পীর প্রকাশ কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এত গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ, কোনো রকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে

বাংলাদেশের কৃষকসমাজে এসে নতুনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে।' 'অন্যূন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘরবিরাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারব না, তেমনি তাঁর এ সুদীর্ঘ কালের আঁকা ছবির ওপর কোনো বক্তব্য রাখতেও পারব না।' 'সুলতানের ছবির মানব-শরীরগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে মনে হতে পারে অসঙ্গত, অনানুপাতিক, 'সুলতান তাঁর ছবির প্রতিটি দেহকেই সেই মহামানবের মতোই এঁকেছেন, যে মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল ৫২'র একুশ তারিখে কিংবা ২৬ মার্চ গভীর রাতে, কারণ এ দেশের অসহায় জনতার কাছে প্রতিটি দিনই তো বস্তুত এক-একটি ব্যথাকাতর শুক্রবার। তাদের অস্তিত্ব অনিঃশেষ এক যন্ত্রণার রূপকথা, তবে তারা অকুতোভয়, টিকে থাকার জন্য প্রতিমুহূর্তে তারা অদম্য সংগ্রামে লিপ্ত।'

কবি আল মাহমুদ-এর ভাষায়, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রায় সমসাময়িক এই মৌলিক চারুশিল্পী বহুকাল যাবৎ উপমহাদেশের উত্থান-পতন, দেশ বিভাগ ও অন্যান্য মানবিক আলোড়নের মধ্যেও তাঁর নিজস্ব এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছেন।' আল মাহমুদ আরও লিখেছেন, 'তাঁর সাথে তুলনা হতে পারে এমন শিল্পীরাও পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন তবে তাঁর শিল্পকর্মের মতো মৌলিকধর্মী নিরপেক্ষতা প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে।'

কবি শামসুর রাহমানের জবানি থেকে জানা যায়; তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, 'সত্যিকথা বলতে কি প্রথমদিকে আমি এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্মের অনুরাগী ছিলাম না।...

'আমি ক্রমশ স্বতশ্চল এই চিত্রশিল্পী ও তাঁর চিত্রকর্মে অনুরক্ত হই। ক্লান্তিহীন পরিভ্রমণকারী সুলতান বর্তমানে...

'সকল শিল্পীর ওপর প্রভাব যার অপ্রতিরোধ্য। সুলতান কখনো এই প্রভাবে সংকুচিত হননি; লজ্জিত নন, বরং এটি তাঁকে অমর চিত্রকর হিসেবে বেড়ে উঠতে পুষ্টি যুগিয়েছে।'

সুলতান প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান ইয়ুং-এর উদ্ধৃতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, `any genuine artist transmuters our personal destiny into the destiny of mankind, and evokes in us all those beneficent forces that even have enabled humanity to find a refuge from every peril and to outlive to the longer night'.

শিল্পী এস. এম. সুলতানের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছিলেন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'আদম সুরত'। ১৬ মি. মি. (রঙিন) ফর্মেটে নির্মিত এ চলচ্চিত্রের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮২ সালে। অর্থাভাবসহ নানারকম সংকট কাটিয়ে তারেক মাসুদ একসময় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। তারেক মাসুদ 'ইউনিট' নিয়ে চলে গেছেন সুলতানের আবাস নড়াইলে; ছুটে গেছেন ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে– যেখানে তিনি ফেলে এসেছেন রঙে রঞ্জিত বর্ণিল অনুভূতিমালাকে; সেইসব জায়গা সুলতানের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল একদিন। ৬০ মিনিট সময়-দৈর্ঘ্যের এ প্রামাণ্যচিত্রে ফ্রেমবন্দি হয়েছে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের জীবনের নানা দিক।

চার.

সুলতানের নারীদের প্রতিও মাহমুদের পর্যবেক্ষণ বেশ প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ, 'তাঁর আঁকা সব নরনারীই বাস্তবের নরনারীর চেয়ে একটু সুন্দর, পেশিবহুল, নিখুঁত এবং কর্মপরায়ণ। ফিগারগুলো বাস্তবের চেয়ে একটু বিস্তৃততর। এই বাহুল্যই সুলতানের প্রতিটি রচনাকে মহিমা দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।'

কিন্তু শিল্পীর আঁকা মহিলাদের দেহগুলো পুরুষদেহগুলোর একদম বিপরীত। তারা একান্তই রমণীয় যা মাইকেলএঞ্জেলোর ছবিতে একেবারেই দেখা যায় না। সুলতানের নারীগণ একেকটি মূর্তিমান শক্তিমান কিন্তু লাবণ্য। প্রাচ্য ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের দেহ আবৃত, শিল্পী কাজ করেছেন কেবল তাদের উন্মুক্ত হাত, পা আর মুখের ওপর। তাদের সোনালি গায়ের রং আর মাতৃময়ী মুখাবয়ব। শিল্পীর আঁকা জীবজন্তুও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিকৃতি; বিশেষ করে ষাঁড়গুলো অসাধারণ সুন্দর, যে কারণে সুলতানের ষাঁড়ের পাশাপাশি উল্লেখ করা চলে ভিঞ্চির আঁকা সেইসব ঘোড়ার অনুশীলনগুলো। সুলতান যে-ধারায় ছবি আঁকেন; তাঁর ব্রাশ ব্যবহারে কখনো প্রকাশ্য কখনো গোপন একটি ক্যারিশম্যাটিক ব্যাপার লক্ষ করা যায়। টুকরো টুকরো রঙ ব্যবহারে সূক্ষ্ম বৃত্তের ছোট ছোট তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ছবিতে টেক্সচারের আমেজ তৈরি করেন। তাঁর ছবিতে রূপক ব্যবহারের সাথে ঐতিহ্যিক, ধ্রুপদী ব্যাকরণগত তেমন কোনো ধারার সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর বিষয় যতই সাদা-মাটাই হোক-না কেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ গভীর মননশীলতায় ভাস্বর।

সুলতান কে? তিনি একজন অনন্য পিকাসো? ভিনসেন্ট ভ্যান গগ? হয়তো দুই-ই সুলতান, হয়তো তার চেয়েও বেশি বলা হলে মোটেও ভুল বলা হবে না।

নাটকীয় দেহভঙ্গিমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি পিকাসোর সদৃশ, আর ব্রাশের ঋজু-দৃঢ় আঁচড়ে তিনি ভ্যান গগের কাছাকাছি। বিষয়বস্তুর প্রগাঢ় ভাবগাম্ভীর্যতায় তিনি আরো বেশি কিছু। ফলে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে– যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পৌরাণিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামের কৃষকদের আকাঙ্ক্ষার এক জীবন চিত্রিত করেছেন। এটা তাঁকে অনলংকৃত পল্লিগাঁথা কিংবা ভাবাবেগাক্রান্ত গ্রাম্যদৃশ্যাবলি রচনা থেকে বিরত রেখেছে। এভাবে তাঁর কৃষকেরা পৌরাণিক বাস্তবতায় আদিম শক্তি ও শক্তির প্রত্যয় লাভ করেছে; সেইসব কৃষক, সম্ভাব্য সমাজের কাছ থেকে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে নিতে অপেক্ষমাণ; সুলতান এই আদিম প্রত্যয়, এই শ্রেণিচেতনার উত্তেজনাকেই গ্রহণ করেছেন।

ধ্রুপদী বা চিরায়ত শিল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শত শত বছর মানুষের মনে যে বিশ্বাস দানা বেঁধে থাকে, সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা; *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধুসূদন মেঘনাদ ও রামের চরিত্র উল্টো করে চিত্রণের মধ্য দিয়ে সেইরকম একটি বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে পেরেছেন বলেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের সকল সীমানা পেরিয়ে চির চিরায়ত'র আসনে আসীন হয়েছে। একইভাবে এস. এম. সুলতান নির্বীর্য, রুগ্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য

বাঙালিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই হল তোর অতীত, ঐতিহ্য, ইতিহাস; এই হল তোর বলিষ্ঠ মা– যার বাহু সংসার আগলে রাখত, শত্রুর মোকাবেলা করত কিংবা সন্তানকে পুষ্ট রাখতে সুঠাম গড়নের সুস্থ শরীরবতী তিনি। এই তোর বাবা– যিনি জমি, জলায় কাজ করার জন্য সদাসুস্থ ও প্রস্তুত। এই তোর উঠোন– যেখানে সূর্যের বলিষ্ঠ রোদ এসে পড়ে আর তোর খোলা মাঠ যেখানে খেলা করত তোর অতীত আর এই তোর গরু, গাছ, মুরগি, ছাগল– যা-যা আছে সবই তোর, তুইও এদের আর তোরা সবাই ভুলে যা যে তোর স্বপ্ন রুগ্‌ণ, অপারগ!

ইংরেজ, ওলন্দাজ, পাকিস্তানি তোদের হাতেই বিতাড়িত হয়েছে; তোরা বাঘা যতীনের সন্তান, তোরা এম. এন. রায়ের সন্তান, তোরা সূর্যসেনের সন্তান! কাজেই এস. এম. সুলতানের এই স্বপ্ন, শুধু নিছক স্বপ্ন নয়; এটা দ্রোহের পুনর্জন্ম, এটা ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি, এটা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে আমাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি।

সহযোগী গ্রন্থ ও পত্রিকা

১. বাংলা সাহিত্যের কথা/ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
২. পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং/ কলিম খান
৩. নূরুল আলম আতিক সম্পাদিত, সাহিত্য ও শিল্প সংকলন/ বিষয়: এস.এম.সুলতান
৪. বাংলা পিডিয়া
৫. বাঙালি মুসলমানের মন/ আহমদ ছফা
৬. শওকত হোসেন সম্পাদিত 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার' (কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক)
৭. অন্যান্য

[লেখক: কবি। প্রাবন্ধিক। সম্পাদক, ত্রৈমাসিক 'হালখাতা' ও ত্রৈমাসিক 'গোলাঘর'।]